সেরা পাঁচিশ

কিশোর গল্প

অপূর্ব দত্ত

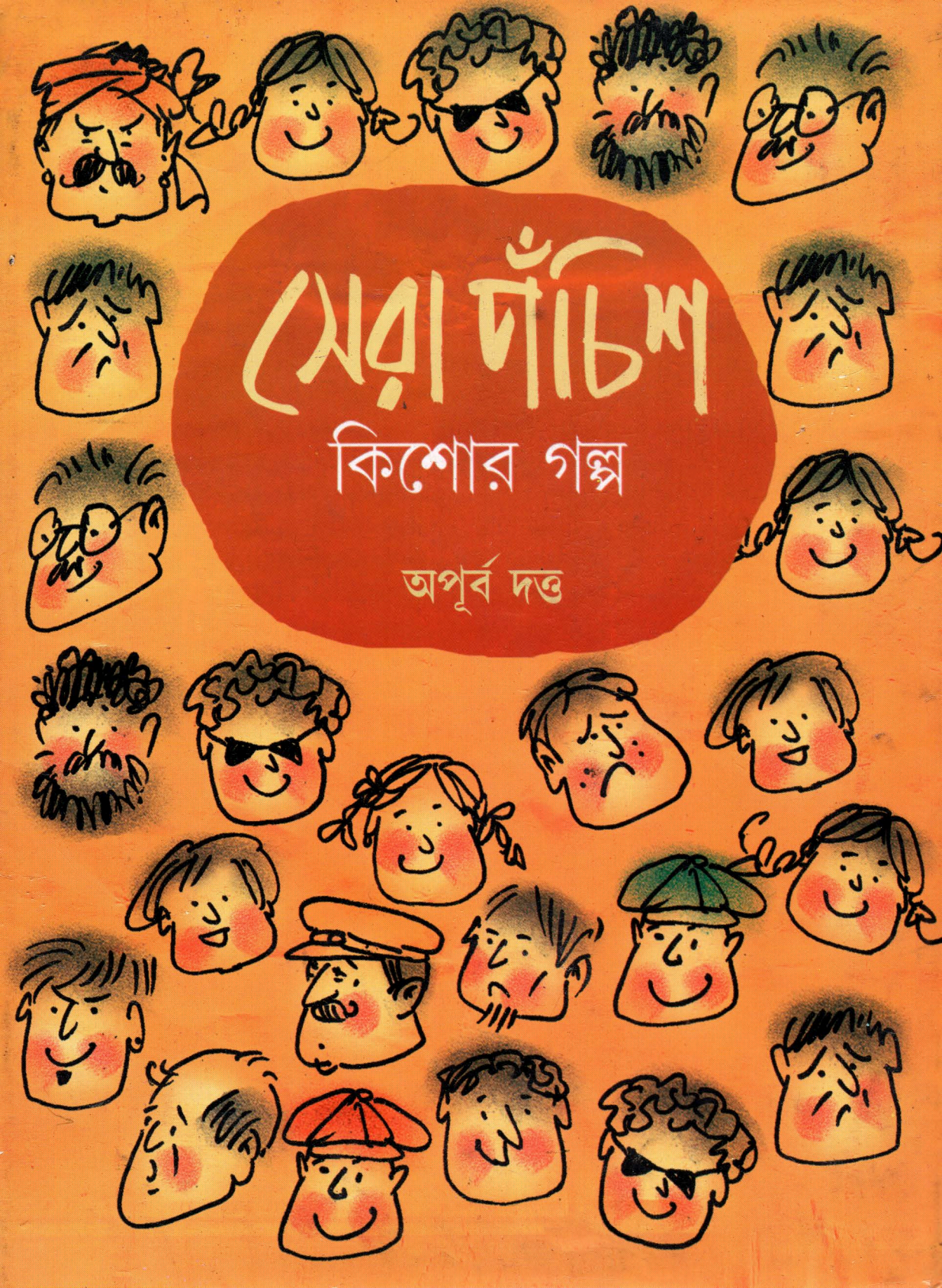

সেরা পঁচিশ

অপূর্ব দত্ত

সেরা পঁচিশ

কিশোর গল্প

অপূর্ব দত্ত

পরিবেশক
মিত্রম্
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

গ্রন্থমিত্র
১বি, রাজা লেন
কলকাতা-৯

SERA PANCHISH

by Apurba Dutta

© গ্রন্থমিত্র

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ২০১২

প্রকাশক
কে. মিত্র
গ্রন্থমিত্র
১বি, রাজা লেন
কলকাতা-৯

লেজার কম্পোজ
গ্রন্থমিত্র
১বি, রাজা লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক
নারায়ণ প্রিন্টিং
৩, মুক্তারামবাবু লেন
কলকাতা-৭

প্রচ্ছদ ঃ সুব্রত মাঝি

দাম ঃ ১২০ টাকা

ISBN : 978-81-88171-49-1

বিশাখা-কে

সূচিপত্র

কম্পিউটারের পাখি	৭
ক্রাইসিস	১২
ধার থাকা ভালো নয়	২১
আক্কেল সেলামি	২৮
অদ্ভুত ডাকাতির গল্প	৩৭
কালীনারায়ণপুর ব্রিজে একদিন	৪৩
ধর্মের কল বাতাসে নড়ে	৪৯
জার্মান স্টিলের ছুরি	৫৮
সেজোমামার অদ্ভুত চিঠি	৬৮
সাধুবেশে মধুখুড়ো	৭২
মধুখুড়ো নট আউট	৭৯
ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার	৮৪
অবিনাশবাবুর বাড়ি	৯০
ঘোড়ার চাল	৯৯
বিধু সামন্তের ভূত	১০৫
উইল রহস্য	১১২
নিখোঁজ হিরের রহস্য	১২২
ছেঁড়া পাতার রহস্য	১৩৪
একটি জরুরি তদন্ত	১৪৬
বিশ্বদর্পণবাবুর দৃশ্যতর্পণ	১৬৫
সিনেসেরিটি ডট কম	১৭৭
টুবুল আজ টিফিন নেয়নি	১৮৪
হেরে গেলেন হরিপদবাবু	১৯৩
আপনারা ওকে নিয়ে যান	২০২
পবনবাবুর ভাগ্য	২০৯

কম্পিউটারের পাখি

কম্পিউটারটা চালু করতেই রিম্পির চোখের সামনে ফুটে উঠল সুন্দর একটা ছবি। ছোটোমামা প্রায়ই কম্পিউটারের ওয়ালপেপারটা বদলে দেয়। এটা ওর একটা নেশা। ছোটোমামা বলে, একটা জিনিস বেশিদিন দেখতে ওর ভালো লাগে না। কাল রাত্তিরেও রিম্পি যখন কম্পিউটার খোলে তখনও এই ছবিটা ছিল না। আজ বুটিং শেষ হওয়া মাত্রই রিম্পির চোখে পড়ল এই ছবিটা। দারুণ ছবি—দেখলে মন ভরে যায়। কত রকম রং। আর কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত গাছপালা। রিম্পি অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকল। এরকম ছবি সে আগে একবার দেখেছে। ছোটোমামার ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফি বইয়ের মধ্যে। কিন্তু সেটা খুব ছোটো। আজ চোখের সামনে এত বড়ো একটা সুন্দর ছবি দেখে ওর মনটা খুশিতে ভরে গেল।

রিম্পিকে এখন নিয়মিত কম্পিউটার অভ্যেস করতে হয়। সেভেনে ওঠার পর কম্পিউটার শেখা বাধ্যতামূলক। অন্যান্য দিন রাত্রিবেলা করে। আটটার সময় ছোটোমামা ইনটারনেট করে।

ছোটোমামার শেষ হলে তারপর ও করে। আজ থেকে স্কুলে গরমের ছুটি পড়ে গেছে। সেজন্য মা বলেছে আজ থেকে সকালবেলা কম্পিউটার করতে। আটটা থেকে নটা। মানে মা অফিসে বেরোবার আগে পর্যন্ত। মা ন'টার সময় অফিসে বেরোয়। বাবা তারও আগে। ছোটোমামা তারও আগে।

রিম্পি একদৃষ্টে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা গ্রামের ছবি। ছোটোমামা বোধ হয় ইনটারনেট থেকে ডাউনলোড করেছে। দোতলা একটা বাড়ি। রাজবাড়ির মতো। ভেতরে হালকা হলুদ রঙের আলো জ্বলছে। বাড়িটার সামনে একটা রাস্তা। পিচরাস্তা নয়। পাথর বিছানো। রাস্তার দুপাশে লম্বা লম্বা গাছ। পাহাড়ি অঞ্চলে যে রকম গাছ দেখা যায় সেরকম। রিম্পি অনেকগুলোর নামও জানে। পাইন, সেডার, বার্চ উইলো ইত্যাদি। গাছগুলোর নীচে অনেক শুকনো পাতা পড়ে আছে। বোধ হয় বসন্তকাল। বাড়িটার দোতলার একটা ঘরের জানলা খোলা। খড়খড়ি দেওয়া জানলা। লম্বা লেজওলা গাঢ় নীল রঙের একটা পাখি বারবার খোলা জানলাটা দিয়ে বেরোচ্ছে আর সবথেকে

লম্বা গাছটায় গিয়ে বসছে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখে আবার জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। রিম্পির খুব কৌতূহল হল পাখিটা ঘরে ঢুকে কী করছে জানার জন্যে। মনোযোগ দিয়ে পাখিটার যাওয়া দেখতে দেখতে রিম্পির মনে হল যদি কম্পিউটার স্ক্রিনের মধ্যে ঢুকে পড়া যেত তাহলে হয়তো ভালো দেখা যেত। পরক্ষণেই নিজের ওপরে বিরক্ত হল রিম্পি। কী সব অবাস্তব ভাবনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এসব তো ছোটোবেলায় হত। ও যখন ক্লাস ওয়ানে পড়ত তখন ছোটোমামার কম্পিউটার করার সময় পাশে এসে বসত আর এটা কী ওটা কী, এটা কেন হয় ওটা কেন হয় জিজ্ঞেস করত। ছোটোমামা একটুও বিরক্ত হত না, মজা করে বলত, জানিস তো ওর মধ্যে লোক থাকে। সেই সব কিছু লিখে দেয়, ছবি এঁকে দেয়। রিম্পির এখন সেভেন। কম্পিউটার সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখে গেছে। স্ক্রিনের মধ্যে ঢুকে পড়ার কথা ভেবে নিজে নিজেই খানিক হেসে নিল।

রিম্পি তাকিয়ে আছে পাখিটার দিকে। মন দিয়ে ওর গাছে বসা এবং ঘরে ঢোকা দেখছে। ঘরে কোনো শব্দ নেই শুধু সিলিং ফ্যানের শব্দ ছাড়া। রিম্পিকে অবাক করে দিয়ে পাখিটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—এই মেয়েটা, তোমার নাম কী?

রিম্পি চমকে গেল। কম্পিউটারের ছবি আবার কথা বলে নাকি। তবে কি ক্লাস ওয়ানে ছোটোমামা যেটা বলত সেটাই ঠিক। সত্যিই কি ভেতরে লোক থাকে। ভয়ে ভয়ে বলল, আমার নাম রিম্পি।

পাখিটা ফিচ করে হেসে ফেলল। কোন্ স্কুলে পড়? ব্রজবালা বালিকা বিদ্যালয়ে?

—সেটা আবার কী? কোনো স্কুলের নাম এরকম হয় নাকি? আমি গোখেল মেমোরিয়ালে পড়ি। ক্লাস সেভেনে।

পাখিটা আবার হেসে ফেলল। রিম্পি বুঝতে পারছে না পাখিটা কেন হাসছে। ওর মনখারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে কেউ নেই যে ডেকে দেখাবে বা পাখিটার কথা শোনাবে।

পাখিটা বলল, তুমি পুকুরে সাঁতার কাটো?

—না। পুকুরে সাঁতার কাটা খারাপ। মা পছন্দ করে না। আমি সপ্তাহে একদিন সুইমিং ক্লাবে যাই সুইমিং শিখতে।

পাখিটা এবার আর হাসল না। গম্ভীর গম্ভীর মুখে বলল, সুইমিং মানে কী? ছুঁচ? সুই মানে তো ছুঁচ।

রিম্পি বলল, ধুস বোকা, কিচ্ছু জানে না। সাঁতারের ইংরেজিই তো সুইমিং।

—ও। তাই বল। আমি তো বাবা ইংরেজি স্কুলে পড়িনি। কী করে বুঝব।

এতক্ষণে রিম্পি একটু ধাতস্থ হয়ে সাহস করে বলল, তোমার নাম কী? তুমি কোথায় থাকো?

—আমার নাম পাখি। আমি আকাশে থাকি, কখনও গাছে থাকি, আবার কখনো-সখনো অ্যান্টেনাতেও থাকি। তুমি বিহঙ্গ বা বিহঙ্গম বলে কাউকে চেনো?

রিম্পি ঘাড় নাড়ল। চিনি না।

—খেচর খগ পতত্রী এদের কাউকে?

—না বাবা। তুমি বিদঘুটে বিদঘুটে কী সব নাম বলছ শুনে চমকে যাচ্ছি।

খেচর মানে জান না? তুমি আবার নাকি সেভেনে পড়। তুমি সেভেনে পড়তেই পার না।

রিম্পি থতমত খেয়ে বলল, না না খেচর মানে জানি। পাখি। তুমি তো পাখি।

—তাইতো বললাম। আমি তো আকাশে থাকি। তুমি আকাশে দেখতে পাওনা আমাকে?

রিম্পি অবাক হয়ে বলল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে পাখি? আকাশ দেখার সুযোগ কোথায়? শহরে কি আকাশ দেখা যায়? দেখছ না চারদিকে উঁচু-উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ি সবটুকু আকাশকে আমাদের সামনে থেকে মুছে দিয়েছে।

—বিকেলবেলা পার্কে বা মাঠে খেলতে যাও না? নদীর ধারে বেড়াতে যাও না?

রিম্পি ঘাড়ের ওপর হামলে-পড়া চুলগুলোকে রাবারব্যান্ড দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বলল, কখন খেলতে যাই বলো। সোমবার আর বুধবার তো স্কুল থেকেই সোজা অঙ্ক-কোচিং স্যারের বাড়ি চলে যাই। ফিরতে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে যায়। অন্ধকারে কি আকাশ দেখা যায় বলো। মঙ্গলবার যাই সুইমিং শিখতে। বৃহস্পতিবার স্কুল থেকে ফিরেই চলে যাই নাচের ক্লাসে। নাচের ক্লাস থেকে ফিরে আবৃত্তি শিখতে যাই। শুক্রবার আঁকার ক্লাস, আর শনিবারে আবার তিনটে স্যারের কাছে পড়া। আকাশ কখন দেখব বলো।

পাখি হতাশ হয়ে বলল, তোমাদের জানলা দিয়ে তো আবার আকাশ দেখা যায় না। ঠিক বলেছি না?

রিম্পি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর জিজ্ঞেস করল, তুমি পড়াশোনা করো না?

—কেন করব না। আমি স্কুলে পড়ি না বটে, তবে অনেক বই পড়ি। তুমি সীতার বনবাস, টুনটুনির বই, শিশু ভোলানাথ, আবার যকের ধন পড়েছ? আমি পড়েছি। আমার মা-বাবা বইমেলা থেকে এসব বই কিনে দিয়েছিল। আমার কাছে ক্ষীরের পুতুল, নালক, বুড়ো আংলা, ঘনাদা-টেনিদা, ফেলুদা-কাকাবাবু সব আছে।

—এগুলো কীসের বই গো পাখিদা? সায়েন্সের? আমাকে তো কেউ কখনও কিনে দেয়নি।

—এগুলো বাংলা সাহিত্যের অমর কীর্তি। নামকরা লেখকদের লেখা। একবার পড়া শুরু করলে থামতে পারবে না। আর ছড়ার বইয়ের কথা তো বলার নয়। রবিবাবুর খাপছাড়া, সুকুমারবাবুর আবোল-তাবোল, নীরেন্দ্রনাথ চক্কোত্তির সাদা বাঘ, অন্নদাবাবু, সরলবাবু, কার্তিকবাবুর কত কত ছড়ার বই। তুমি ছড়া ভালোবাসো নিশ্চয়।

—ছড়া কী গো, রাইম্‌স? আমি রাইম্‌স পড়তে ভালোবাসি। তবে বেঙ্গলিতে নয়। বেঙ্গলিটা আমি ভালো পারি না।

পাখি এবার জোরে হেসে উঠল। তুমি না বাঙালি! বাঙালি হয়ে বলতে আছে যে বাংলা ভালো পার না? ইচ্ছে করলেই পারবে। আজ থেকেই চেষ্টা করো। শপথ নাও, প্রয়োজন না পড়লে সহজে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবে না। স্কুলের পড়াশোনা তো ইংরেজিতে করতে হবেই, সেটা কিছু নয়। কিন্তু একজন বাঙালির সঙ্গে যখন কথা বলবে তখন চেষ্টা করবে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করতে। পারবে না?

রিম্পির মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। বলল, তুমিই ঠিকই বলেছ পাখিদা। আমাকে তো আগে কেউ এভাবে বলেনি। আমি আজ থেকে চেষ্টা করব বাংলা বই বেশি বেশি করে পড়তে।

—খুব ভালো। খুব ভালো। আমি তোমাকে অনেক বাংলা বই এনে দেব। ক্লাসের পড়ার মাঝখানে সময় বার করে নিয়ে পড়বে। আইনস্টাইনকেও জানবে, আবার জগদীশ বোসকেও জানবে। হ্যারি পটারের বই নিশ্চয় পড়বে, তবে সেইসঙ্গে সহজপাঠ, হলদে পাখির পালক, আর্মানি চাঁপার গাছ এগুলোও অবশ্যই পড়তে হবে। একটা কথা, যখনই সুযোগ পাবে কিছুক্ষণ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে। মাঝে-মাঝে ছুটি-ছাটার দিনে বাবা-মার সঙ্গে গ্রামের দিকে চলে যাবে। বিশাল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গোটা পৃথিবীটাকে চেনার চেষ্টা করবে।

রিম্পির মুখ থেকে কথা হারিয়ে গেছে। কথা বলতে গিয়ে গলা কাঁপছে। স্বর

বেরোচ্ছে না। অস্ফুটে বলল, পাখিদা, আমি তো এখন কম্পিউটার বন্ধ করব। তুমি পরে আসবে তো? আমার এখনও অনেক কথা জানার আছে। আচ্ছা পাখিদা, তুমি একবার ঘরের ভিতরে যাচ্ছিলে, আবার গাছে বসছিলে কেন গো?

—একবার বাইরের পৃথিবীকে দেখছিলাম, আর একবার মনের পৃথিবীটাকে দেখছিলাম। বাইরের জগৎটাকে দেখা খুবই দরকার, বুঝলে রিম্পি।

রিম্পিও আস্তে ঘাড় নাড়ল। বলল, তুমি বেশ ভালো পাখিদা। কেমন সুন্দর করে বোঝালে আমাকে। পৃথিবীর সব লোক কেন তোমার মতো সুন্দর হয় না। আমি নিশ্চয় আকাশ দেখব, ছড়ার বই পড়ব। আর সবাইকে তোমার মতো ভালোবাসব। সবাইকে তোমার কথা বলব। আর আমার সব বন্ধুদের বলব তাদের কম্পিউটারে তোমার ওয়ালপেপারটা লাগাতে।

—আর একটা কাজ করতে হবে রিম্পি। তোমার বন্ধুদেরও বলতে হবে। তোমরা সবাই পড়াশোনায় ভীষণ ভীষণ ভালো। অনেক নম্বর পাও। কিন্তু তোমরা কল্পনা করতে ভুলে গেছ। তোমরা নিজের মতো নানারকম কল্পনা করতে শেখো, যা তোমাদের নিজস্ব। একান্ত নিজস্ব। বড়োদের কোনো হাত থাকবে না সেখানে। পারবে না রিম্পি? বলো, পারবে না?

—পারব। নিশ্চয় পারব। আমার বন্ধুরাও পারবে। আমি ওদেরেকে তোমার কথা বলব। আবার দেখা হবে পাখিদা। ভালো থেকো।

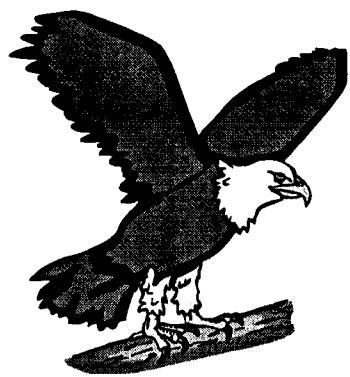

ক্রাইসিস

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোটা বাড়িটা নিশ্চুপ হয়ে গেল। যেন একটু আগেই কারও প্রাণবিয়োগ হয়েছে। অথচ সেরকম কিছুই ঘটেনি। ঘটবার কথাও নয়। খানিক আগেও কত হইচই। বাড়ি গমগম করছিল। এর কথা ওর কথাকে চাঁটি মেরে বসিয়ে দিতে চাইছিল। সানাইয়ের শব্দ, শাঁখ, উলুধ্বনি, নেদোমামার বাজখাঁই গলার পুলিশি চিৎকার সব মিলিয়ে বিয়েবাড়ি জমজমাট। অথচ এই মুহূর্তে এই সাতের দশ বাই সি, হরিদাস সিদ্ধান্ত লেনের একশো পাঁচ বছরের পুরোনো বাসিন্দা ব্রজশেখর দত্ত-র অধস্তন চার পুরুষ কীর্তিশেখর দত্ত-র বিশাল বাড়িটায় যেন পিন পড়লেও শোনা যায়। বাড়ির পোষা গোরু ছাগল কুকুরগুলোও যেন আফিমের গুলি খেয়ে ঝিম মেরে পড়ে আছে। দুপুলবেলায় শ দেড়েক পাত পড়ার কথা। রাতে সাড়ে চারশো। পিছনের উঠোনে তিনটে ঠাকুর আর পাঁচটা হেল্পার মিলে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে বসেছিল। তারাও চুপ। এমনকি বাড়ির বারো চোদ্দোটা কুঁচোকাঁচা অব্দি। কীর্তিশেখর বসার ঘরের শতরঞ্চিতে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। বড়ো ছেলে সৌম্যশেখর তার বউয়ের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে কিছু আলোচনা করছে। ছোটো ছেলে দিব্যশেখর ভাঁড়ার ঘরের সামনের টুলটায় যেমন বসেছিল তেমনই বসে আছে। নির্বাক, নিস্পন্দ, কীর্তিশেখরের একমাত্র শ্যালক, মানে সৌম্য আর দিব্যর একমাত্র মামা, যিনি রান্নার তদারকি করছিলেন, গম্ভীরমুখে বাইরের রাস্তায় পায়চারি করছেন। বাড়ির মেয়ে বউরা কনেকে, মানে সৌম্যশেখরের একমাত্র মেয়ে দোয়েলকে নিয়ে ব্যস্ত।

গিন্নিমা এসে কীর্তিশেখরের সামনে দাঁড়ালেন।

—কিছু বলবে?

—বলব মানে! তোমাদের আক্কেলটা কী? এতখানি বেলা হয়ে গেল। বাচ্চা মেয়েটা উপোস করে বসে আছে। পাড়ার লোকজন আসতে শুরু করেছে। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো, না কী?

গিন্নিমা দাপাতে দাপাতে চলে গেলেন। কীর্তিশেখর উঠে দাঁড়ালেন। সদর দরজায়

নেদোমামার পুলিশি গলা শোনা গেল। অ্যাবসার্ড, রিডিক্যুলাস, অবনক্সাস। হবে না, হবে না। এসব অপদার্থ অকালকুষ্মাণ্ডদের দিয়ে কিস্যু হবে না।

—কী হয়েছে নেদো? অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন? এনি প্রবলেম?

—চ্যাঁচাব না তো কী করব? ওদের কোলে বসিয়ে আদর করব? মুখেই জগৎ মারে। বড়ো বড়ো বাক্যি। আপনিই বলুন জামাইবাবু.....

—আরে কী হয়েছে বলবে তো।

—কী আর বলব বলুন। এদের তো দেখছি আবার নতুন করে ব্যাট ধরা শেখাতে হবে। সব নাকি কোটি টাকার পেলেয়ার। আবার ভিয়েন করে গাবিয়ে বেড়ায় 'টিম ইন্ডিয়া'। দশ ওভারের মধ্যে চারখানা উইকেট খুইয়ে বসে আছে। দেড়শোও করতে পারবে না, দেখে নেবেন। আমরা যখন খেলতাম তখন একটা নিষ্ঠা ছিল। পারসিভিয়ারেন্স, সিন্সেরিটি, ডিলিজেন্স—শব্দগুলো ভ্যানিশ হয়ে গেল ওদের ডিকশনারি থেকে? মুস্তাক-মার্চেন্ট-নাইডুদের পা ধোয়া জল খাওয়া উচিত। যত্তোসব আনগ্রেটফু.....।

নেদোমামাকে চুপ করিয়ে দিয়ে কীর্তিশেখর বললেন—ঠিক আছে নেদো, ওসব কথা শোনার বা বলার সময় এখন নয়। একটা বিরাট ক্রাইসিস সৃষ্টি হয়েছে। মুখে চুনকালি লাগার ব্যবস্থা প্রায়। কিছু একটা করো।

নেদোমামা তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন—ক্রাইসিস! দেখুন জামাইবাবু, ক্রাইসিস বলে কোনো ওয়ার্ড এই নেদোর ডিকশনারিতে নেই। কোনোদিন ছিল না। পঁয়ত্রিশ বছর পুলিশে চাকরি করেছি, কত বড়ো বড়ো দায়িত্ব পালন করেছি, কত চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে ওঠা বসা করেছি, ক্রাইসিস কোনোদিন ফেস করেছি বলে মনে হয় না। ক্রাইসিস কাকে বলে জানেন? দশ ওভারের মধ্যে চার উইকেট ধসিয়ে দিয়ে রান করেছে চোদ্দো। এটাই হল ক্রাইসিস। পারবে এখান থেকে খেলাটা ধরতে? ইম্পসিবল! বেট ধরতে রাজি আছি। এখান থেকে ম্যাচ বের করতে পারাটাই হল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট, বুঝলেন জামাইবাবু।

কীর্তিশেখর তাঁর এই পুলিশ-শ্যালকটিকে ভালো করেই জানেন। যেটা নিয়ে পড়বে তার দফারফা করে ছাড়বে। খুব শান্তভাবে গলাটা মোলায়েম করে বললেন—আঃ নেদো, তোমার সবতাতে এই ক্রিকেটকে টেনে আনাটা আমার মাঝে মাঝে ভালো লাগলেও এখন ভালো লাগছে না। কত বড়ো একটা সমস্যার সামনে পড়েছি জান?

আধঘণ্টার মধ্যে খেতে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর এখন এই অবস্থা। এখুনি একটা.....।

কী সমস্যা সেটা বলবেন তো। নেদো সেনের কাছে কোনো সমস্যা সমস্যাই নয়। খাঁটি বদ্যির বাচ্চা। কাকে অ্যারেস্ট করতে হবে বলুন। এক্ষুনি ডি. জি.-কে লাইনে ধরছি।

নেদোমামা বুকপকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে টেপাটেপি করতে যাবেন, কীর্তিশেখর বললেন, নেদো যেভাবেই পার, যাকে দিয়ে পার আধঘণ্টার মধ্যে মিষ্টির ব্যবস্থা করো। হাজার পিস পান্তুয়া এখুনি চাই। দুপুরে খাওয়ার জন্য না হয় পাড়ার চারটে দোকান থেকে যা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে ব্যবস্থা করে চালিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু রাত্তিরের খাওয়া? তার জন্য তো মিষ্টির ব্যবস্থা করতেই হবে। না হলে তো মান থাকবে না। হাজার পিস পান্তুয়া কি মুখের কথা? তুমিই পারবে নেদো। এই মুহূর্তে এটাই এ বাড়ির ক্রাইসিস। ম্যানেজ করো।

—মিষ্টি? পান্তুয়া? মানে সুইটস? কেন? ভোরবেলায় তো 'কমলা সুইটস' থেকে ডালডার টিনে করে মিষ্টি ডেলিভারি দিয়ে গেল। কী হল সেগুলোর? ভ্যানিশ?

—আর বোলো না। পান্তুয়ার গায়ে ইঁদুরে না কিসে যেন দাঁত বসিয়েছে। ওই পান্তুয়া লোককে দেওয়া যাবে না। বেশিরভাগ পান্তুয়ার গায়ে অনেকগুলো করে ফুটো।

—তার মানে, আপনি, জামাইবাবু, বলতে চাইছেন যে পান্তুয়াস আর ড্যামেজড? ডিলাপিডেটেড? বাট হাউ? দায়িত্বে কে ছিল? ইন হুজ কাস্টডি?

কীর্তিশেখর ঠিক কীভাবে শুরু করবেন বুঝতে পারছিলেন না। হাজার হোক নিজের ছেলে বলে কথা। দিব্যর ওপরেই তো ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্ব ছিল। চাবিও ওর কাছে ছিল। আমতা আমতা করে বললেন, দিব্যর কাছেই ভাঁড়ারের চাবি ছিল। ভোরবেলা যখন মিষ্টি ডেলিভারি দিয়ে গেল তখনই দিব্যকে বলেছিলাম মিষ্টির টিনদুটো ছাগলের ঘরে রেখে তালা বন্ধ করে রাখতে।

আচমকা সামনে গাড়ি এসে সজোরে ব্রেক মারলে যেমন অবস্থা হয়, সেরকম চমকে গিয়ে নেদোমামা বললেন, সারপ্রাইজিং, অ্যামেজিং! ছাগলের ঘরে? মানে গোট্‌স রুম? কী বলছেন জামাইবাবু! ছাগলের ঘর কি পান্তুয়া রাখার জায়গা হল? আর দেখতে হবে না। সব কীর্তি ছাগলের। চলুন তো গিয়ে দেখি। ছাগলের কান দেখলেই আমি বলে দেব কটা পান্তুয়া খেয়েছে। কটা ছাগল আছে বলুন তো।

—বলছি, বলছি। তার আগে নেদো তোমার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টটা দেখাও তো একবার। এক্ষুনি পান্তুয়ার ব্যবস্থা করো। দুপুরে খাওয়ার মিষ্টি আনতে আমি ভানুকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি দিব্যকে নিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরোও। যেখান থেকে পারো হাজার পিস পান্তুয়া এনে হাজির করো। এ নাও টাকা।

—জাস্ট অ্যা মিনিট।

নেদোমামা মোবাইল ফোন থেকে দু-মিনিট কথা বলে ফোনটা বুকপকেটে রাখলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—ডান। জামাইবাবু, ডা-আ-ন। নেদো সেনকে লোকে এখনও ভোলেনি। বাগবাজারের 'সুইটস ইন্ডিয়া'কে বলে দিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে থাউজেন্ড অ্যান্ড ফিফটি পিসেস পান্তুয়া চলে আসছে। পঞ্চাশ পিস ফর টেস্টিং, হাজার পিস ইনট্যাক্ট ফর অতিথিস অ্যান্ড অভ্যাগতস। দিস ইজ নেদোজ ক্যারিশমা। নো পেমেন্ট রাইট নাউ, জামাইবাবু। আগে খেয়ে পরে দাম।

কীর্তিশেখর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নেদোমামাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুমি আমার মান বাঁচালে, নেদো। একেই বলে শালা। এইজন্যেই লোকে বউয়ের চেয়ে তার ভাইকেই বেশি তোয়াজ করে। বাই দা বাই, ভানুটা এখনও আসছে না কেন? সবতাতেই যা ভাবায় না যে কী বলব।

নেদোমামা যেন এই সুযোগটাই খুঁজছিলেন। বলের লাইনে গিয়ে সপাটে কপিবুক কভার ড্রাইভ মারলেন। আপনি আর লোক পেলেন না জামাইবাবু, শেষ অবধি ভেনোটাকে চুজ করলেন। আরে বাবা, অল শালাজ আর নট অ্যাট পার। আপনার শালা আর আমার শালা কি এক হল? চিজ অ্যান্ড চক? আপনার শালা নেদো সেন, রিটায়ার্ড এস. পি.। আর শ্রীমান ভানু হল আমার শালা, অ্যা ডিগনিফায়েড ভ্যাগাবন্ড। ফোর টাইমস বি. এ. পার্ট ওয়ান রানার্স-আপ।

কথার মাঝখানে গুড্ডু এসে বলল, দাদু, দাদু, ইন্ডিয়া চার উইকেটে দুশো বত্রিশ।

—হাউ মেনি ওভারস?

—বিয়াল্লিশ। দ্রাবিড় একশো বাইশ, যুবরাজ সাতাশি।

গু-উ-ড। ব্রাভো। দেখুন জামাইবাবু, একেই বলে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট। রাহুল দ্রাবিড়। রকলাইক ডিফেন্স। সললিড। আর আপনি এই ক্রাইসিসের সময়ে ব্যাট করতে পাঠালেন অই নড়বড়ে ভেনোটাকে। এখনো জিভের আড় ভাঙেনি, লোক দেখলে তোতলায়, ভালো করে কথা বলতে পারে না, ডাল আনতে বললে

ডালডা আনে, সে কিনা ক্রাইসিস ম্যানেজ করবে। পুয়োর চ্যাপ। অ্যা ল্যাম্ব অন দা স্লটার।

কীর্তিশেখর খুব জোর দিয়ে কিছু বলতে পারলেন না। তবু সাহস করে বললেন—আহা নেদো, ওভাবে বলছ কেন? ও তো তোমার শালা। ওর দিদি শুনলে কী ভাববে বলো তো।

নেদোমামা আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—অন্ধ স্নেহ ভালো নয় জামাইবাবু। ব্লাইন্ড ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের বারোটা এই করেই বাজিয়েছিলেন। অপোনেন্ট টিমে যেখানে কৃষ্ণের মতো ডাকসাইটে অলরাউন্ডার সেখানে শকুনির মতো আধখানা বোলার নিয়ে টক্কর দেওয়া যায়? দেখলেন তো কী রকম টেইল ইন কাউডাং হয়ে গেল। নিট রেজাল্ট কী.? আ বিগ জিরো। এখন দেখুন, দেয়ার ইজ নো ওয়ান টু গিভ ক্যান্ডেল ইন দি বাম্বু অফ দা কৌরবস। কৌরবদের বংশে বাতি দেওয়ার কেউ থাকল কি?

—না, না নেদো, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। ভানু ঠিক নিয়ে আসবে। এই এল বলে।

—আসবে, বাট ইউদাউট দি পান্তুয়াজ অর আদার মিষ্টিজ। আপনার মনে নেই জামাইবাবু, সেবারে পিকনিকের দিন কৃষ্ণনগর থেকে সরপুরিয়া আর দই আনতে গিয়ে কেমন প্যান্ডিমোনিয়াম বাধিয়ে দিয়েছিল? ওকে আমার জানা আছে। ওর ক্যালি ওর দিদির থেকে, মানে আমার সহধর্মিণীর থেকে সামান্য বেশি। বাট বোথ আর সেম—নাইনটিন আর টোয়েন্টি।

নেদোমামিমা হন্তদন্ত হয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। থমকে দাঁড়ালেন। চশমাটা খুলে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন—থামো। বাজে বকবক কোরো না তো। সব সময় মানুষের দোষ ধরা একটা স্বভাব। অই ছেলেটার জন্যেই সেদিন সরপুরিয়া খেতে পেরেছিলে। আর তোমার টাকার ব্যাগটা? সেটার কথা ভুলে যাচ্ছ? অকৃতজ্ঞ।

নেদোমামা আনপারটার্বড। কোনো বিকার নেই। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন—হিস্ট্রি। গিন্নি, সেসব আজ হিস্ট্রি। ফ্লুক। একদিন ঘটেছে বলে রোজ রোজ ঘটবে নাকি? তুমি প্লিজ, আমার ব্যাপারে ইনটারফিয়ার কোরো না। ভানুকে আমি তোমার চেয়ে ভালো চিনি।

নেদোমামিমা অগ্নিশর্মা। দু পর্দা গলা উঁচিয়ে বললেন—উঁ! আমার মায়ের পেটের ভাই, আর উনি নাকি আমার চেয়ে বেশি চেনেন। মরে যাই আর কী!

জামাইবাবুকে মাটির মানুষ পেয়ে উলটো-পালটা বোঝাচ্ছে। আমার ভাইয়ের মতো ভাই হয় না।

নেদোমামা পালটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ভানু এসে পড়ায় ছেদ পড়ল। কীর্তিশেখর বললেন—নেদো, খাওয়ার ব্যবস্থাটা হাতে হাতে করে ফেল। তোমার লেফটেনান্টদের গাইড করো। তারপর পান্তুয়া রহস্যটা উদ্ধার কোরো।

খাওয়া দাওয়া পর লোকজন চলে যেতে বাড়ি একটু হালকা হল। রান্নার জায়গা থেকে অনবরত ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ আসছে। পাড়ার মাতব্বর ফুঁকে মুখুজ্জেকে নেদোমামা চেয়ার দিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন রান্নার জায়গায়। ঠাকুর হেল্পারদের বিশ্বাস নেই। হাত সাফাইয়ের ওস্তাদ। মাছের পিস, মশলাপাতি, আনাজ ইত্যাদি ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে পাচার হয়ে যায়।

নেদোমামা বললেন, আচ্ছা জামাইবাবু, এত বড়ো বাড়ি, অগুনতি ঘর, আর পান্তুয়া রাখলেন ছাগলের ঘরে। গন্ধেই তো বারোটা বাজবে।

কীর্তিশেখর এই প্রথম হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, কোনো এক সময় এই ঘরটায় ছাগল থাকত। এখন অনেক বছর থেকে আর ছাগল রাখা হয় না। এখন এটা ভাঁড়ার।

চাবি খুলুন তো দেখি। একটা প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন করা দরকার। দরকার পড়লে ফরেনসিক টিম ডেকে পাঠাব। ভুলে যাবেন না আমি একজন ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার, হলামই বা রিটায়ার্ড। সকলের চোখের সামনে দিনদুপুরে ইঁদুরে পান্তুয়া খেয়ে গেল, আর আমি এ বাড়িতে থেকেও ধরতে পারলাম না, এটা কী করে হয়।

দিব্য তালা খুলে আলোটা জ্বালাতেই নেদোমামা ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। এটাকে ঘর বললে অতিশয়োক্তি হয়। পুরোনো বাড়ির তিনভাঁজওলা সিঁড়ির নীচটা ঘিরে একটা পাঁচফুট বাই তিনফুট কুঠরি। জানলা নেই। ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি আছে, দেড়ফুট বাই দশ ইঞ্চি। ঘুলঘুলিটার নীচে মেঝেতে দুটো পাশাপাশি টিনে পান্তুয়া রাখা। টিনের অর্ধেকটা মাথা কেটে ভাঁজ করা। ওটাই টিনের মুখ বা প্রবেশপথ।

—স্যাম্পেল দেখান। এই দিব্য, হাঁ করে দেখছিস কী। কটা পান্তুয়া তোল তো দেখি।

নেদোমামা খুব ভালো করে পুলিশের চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। পকেট থেকে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বের করে এখানে সেখানে ঠেকিয়ে দেখলেন। রিটায়ার্ড হলে কী হবে, নেদোমামা এই গ্লাসটা আর একটা ছুরি সব সময় পকেটে রাখেন। খানিকক্ষণ

দেখে বললেন—মনে হচ্ছে ছুঁচ জাতীয় কিছু একটা দিয়ে পান্তুয়াগুলোকে ফুটো করা হয়েছে। জামাইবাবু, এ বাড়িতে বা এ পাড়াতে আপনাদের শত্রু কেউ আছে যে আপনার নাতনির বিয়েতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এরকম ঘৃণ্য কাজ করতে পারে?

কীর্তিশেখর দুদিকে ঘাড় নাড়লেন—কী যে বল! আমাদের কোনো শত্রু নেই। এ পাড়ায় সকলেই আমাদের খুব শ্রদ্ধাভক্তির চোখে দেখে।

নেদোমামা গম্ভীর হয়ে বললেন—মনে হচ্ছে স্যাবোটেজ। সাবধানে থাকুন। তা হ্যাঁরে দিব্য, বাড়ির কুঁচোকাঁচাগুলোকে দেখছি না কেন বলতো। গুড্ডুকে দেখলাম একটু আগে। কিন্তু জয়, রাজা, সোম, তুতুল, মিতুল, রনি, টিপ ওরা কোথায় গেল? ডাক তো ওদের।

কীর্তিশেখর বললেন ওদের আবার এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন? ওরা এসবের কী জানে?

—আচ্ছা জামাইবাবু, ঘুলঘুলির ওদিকটায় কী আছে? খিড়কিতে যাওয়ার গলিপথটা বোধ হয়? একবার পেছনে গিয়ে জায়গাটা দেখা দরকার।

তুমি আবার তোমার পুলিশি কায়দায় তদন্ত শুরু করছ। দেখছ ঘুলঘুলিটার মধ্যে দিয়ে বেড়াল গলার জায়গা নেই। তা ছাড়া গলির দিকে ওটা মাটির থেকে কম করে সাত-আট ফুট উঁচুতে। কারোর পক্ষেই ওখান দিয়ে ঢোকা দূরের কথা, মাথা গলানোও সম্ভব নয়।

—নাথিং ক্যান বি রুলড আউট জামাইবাবু। তদন্তের খুঁত রাখতে নেই।

—ঠিক আছে। চাইছ যখন, গলিটা দেখে এসো।

মিনিট পাঁচেক ধরে গলিটা ভালো করে দেখলেন নেদোমামা। একটা টুল চেয়ে নিয়ে ঘুলঘুলিটার মধ্যে মাথা গলাবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। উলটে গুঁতো খেলেন।

কীর্তিশেখর বললেন—যা হয়েছে হয়েছে, ছেড়ে দাও। ইঁদুরেই খেয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। ও গুলোকে বাইরে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো বরং।

নেদোমামা চিন্তিতমুখে বসার ঘরের সোফায় বসে আছেন। এক এক করে বাড়ির কুচোবাচ্চারা নেদোমামার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন টি. আই. প্যারেড হবে।

—লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়ো। উঁহু উঁহু, ওভাবে নয়। বড়ো থেকে ছোটো। ফল-ইন করো। দাঁড়িয়েছ? গু-উড। সবাই এসেছে? কই, রনি আর রাজা কোথায় গেল? ওদের দেখছি না কেন?

টিপ স্মার্টলি জবাব দিল—কী জানি দাদু। অনেকক্ষণ থেকে ওদের দুজনকে দেখছি না। কোথায় গেছে কে জানে।

নেদোমামিমা বাচ্চাগুলোকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—বলি তোমার কি বুড়ো বয়সে ভিমরতি ধরল? ওদেরকে খুনের আসামি পেয়েছ নাকি? রিটায়ার করেও পুলিশি দাদাগিরি গেল না।

নেদোমামা মুখ না তুলেই বললেন—স্টপ প্লিজ, ম্যাডাম। দ্যাটস মাই বিজনেস, নান অফ ইয়োরস। দিজ ইজ নট দা রাইট টাইম ফর এনি ন্যাকামি অর আদিখ্যেতা।

নেদোমামিমা গজগজ করতে করতে ওপরে উঠে গেলেন। রনি আর রাজা হঠাৎ কোত্থেকে এসে বলল—দাদু, ভারত না জিতছে। আর দুটো উইকেট ফেলতে পারলেই হল। চল্লিশ বলে নব্বই রান করতে হবে পাকিস্তানকে। পারবে না বলো।

—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

নেদোমামার পিলে চমকানো কণ্ঠস্বরে রাজা-রনির আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। ভয়ে ভয়ে বলল, আমরা খেলা দেখছিলাম।

—লাইনে দাঁড়াও। কুইক। দাঁড়িয়েছ? বেশ এবারে বলো তো আজ সকালে বাড়িতে কী জলখাবার হয়েছিল?

একসঙ্গে অনেকগুলো গলার আওয়াজ—লুচি আলুরদম আর বোঁদে।

—সবাই খেয়েছ?

—হ্যাঁ-অ্যাঁ।

—কে কে খাওনি? সত্যি বলবে। লুকোবে না। মিথ্যে বললে পুলিশে দেওয়া হবে। কারোর মুখে কথা নেই। এ ওর মুখে চাওয়াচাওয়ি করছে।

নেদোমামাকে ঘিরে বেশ ভিড় জমে গেছে। যেন জজসাহেবের এজলাস।

—কে কে সকালে জলখাবার খাওনি? রেইজ ইয়োর হ্যান্ড। রাইট হ্যান্ড। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?

আস্তে আস্তে দুটো হাত উঠে এল—রনি আর রাজার।

নেদোমামা উঠে দাঁড়ালেন। রাজা-রনির সামনে এসে বললেন—ডোন্ট গেট নার্ভাস। আমি তোমাদের কেন জলখাবার খাওনি জিজ্ঞেস করব না। নিশ্চয় তোমাদের খিদে ছিল না। কিন্তু তোমাদের কয়েকটা ধাঁধা, না ঠিক ধাঁধা নয়, জি. কে. ধরব। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে।

কীর্তিশেখর এতক্ষণ সব দেখছিলেন আর মজা উপভোগ করছিলেন। নেদোমামার কাছে গিয়ে বললেন—ওদের ছেড়ে দাও। বিয়ে বাড়ি বলে কথা। সাজগোজ করবে, আনন্দ করবে। পান্তুয়া ইঁদুরে খেয়েছে তাতে ওরা কী করবে?

—জাস্ট আ মিনিট, জামাইবাবু। রাজা, হোয়াট ইজ দা রিলেশন বিটুইন আ পাটকাঠি অ্যান্ড আ ঝাঁটার কাঠি? আর রনি, তুমি বলো বল্লমের ফাংশান কী। সেভেনে পড়। নিশ্চয় পারবে।

দুজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল—আর করব না দাদু, অন্যায় হয়ে গেছে। বুঝতে পারিনি। আমরা চারটের বেশি খাইনি।

নেদোমামা উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে বললেন—জামাইবাবু, ইনভেস্টিগেশন ইজ ওভার। এই নিন আপনার আসামি।

তবে কেস দেবেন না। জুভেনাইল কোর্টে পাঠাবার দরকার নেই। অপরাধ কবুল করেছে বলে এবারের মতো মাফ করে দিন।

—কিন্তু তুমি বার করলে কীভাবে?

নেদোমামার মুখে চওড়া হাসি। গোঁফের ডগাটা পাকিয়ে নিয়ে বললেন—অবজারভেশান। এই দেখুন, এটা একটা পাটকাঠি। চারফুট লম্বা। অ্যান্ড দিস ইজ আ ঝাঁটার কাঠি কালেকটেড ফ্রম আ মুড়োঝাঁটা। এক ফুট লেংথ। এইবার ঝাঁটার কাঠিটা পাটকাঠির মুখে ঢুকিয়ে দিলে কী পাচ্ছি? চার ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা একটা বল্লম। ঘুলঘুলির নীচে একজনের কাঁধে দাঁড়িয়ে আর একজন যদি বল্লমটা আন্দাজে পান্তুয়ার টিনের মধ্যে গিঁথিয়ে দেয় তাহলে দুটো একটা পান্তুয়া উঠে আসতে পারে। তবে যেহেতু ঝাঁটার কাঠি, অর্থাৎ বল্লমের মাথাটা বাঁকানো নয় সেহেতু বেশিরভাগ পান্তুয়াই বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আটকে থাকেনি। পিছলে পড়ে গেছে। এই হল আপনার ইঁদুরে খাওয়ার রহস্য। যা হোক, শুভ দিনে ওদের আর বকাবকি করবেন না। না বুঝে না জেনে করে ফেলেছে। যা যা, তোরা সাজুগুজু করে নে। আর একটা কথা জামাইবাবু, 'সুইটস ইন্ডিয়া'র হাজার পিস ফ্রেশ পান্তুয়ার বিলটা কিন্তু আমিই পেমেন্ট করব। প্লিজ, না করবেন না। আরে! ওই তো। আপনার ফ্রেশ পান্তুয়ার কনসাইনমেন্ট এসে গেছে। দেখি দেখি। পঞ্চাশ পিস ফর টেস্টিংটা কোথায়? জামাইবাবু, রাজা রনি আর ভানুকে দুটো করে এক্সট্রা দেবেন। ওরাই তো আসল ক্রাইসিসটা ম্যানেজ করল, কী বলেন?

ধার থাকা ভালো নয়

মাসখানেক ধরে শ্রীমন্ত দারোগার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। কাজেকর্মে আর আগের মতো মন বসছে না। সবসময়েই একটা অনীহা, এক ধরনের নিরুৎসাহতা গ্রাস করেছে তাঁকে। যে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা কাজের মধ্যে থাকতে ভালোবাসতেন, অলসতা দেখলে যাঁর ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠত, তাঁর এ হেন উদ্যমহীনতা দেখে শুধু পরিবারের লোকজন কেন, অফিসে পাড়ায় দোকান-বাজারে সবাই বেশ ভাবিত। অথচ একমাস আগেও কেমন চনমনে টাট্টুঘোড়ার মতো টগবগ করে দাপিয়ে বেড়াতেন। তাঁর দাপটে চোর-গুন্ডা-বদমাশদের রুজি-রোজগার বন্ধ হবার জোগাড়। রাত দুটোতে খবর এল বিষ্টু কর্মকারের জুয়েলারির দোকানের সাটার ভেঙে সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে, ছুটলেন সেখানে। পাজামার ওপর ইউনিফর্ম চাপিয়ে পকেটে রিভলবার নিয়ে সটান বাগদিপাড়ায় পদামস্তানের ডেরায়। চুলের মুঠি ধরে পদাকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে এসে আছড়ে ফেললেন বিষ্টুর পায়ের কাছে। সঙ্গে লুঙ্গিতে বাঁধা গুচ্ছের বন্ধকি গয়নার তাল। বিষ্টু গদগদ হয়ে শ্রীমন্ত দারোগার পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকাল তিনবার। টাকাপয়সা নেওয়া তো দূরে থাক পরদিন সকালে বিষ্টু যখন সস্ত্রীক এসে জলু ময়রার দোকানের ক্ষীর মেশানো পঞ্চাশটা নিখুঁতি, এক বস্তা বাসমতী চাল, কেজি পাঁচেক নলেন পাটালি, আর নতুন একটা ফরাসডাঙার নরুনপাড় ধুতি বেতের টুকরিতে করে এনে শ্রীমন্ত দারোগার ইজি চেয়ারের পাশে রাখল, তখন তাঁর অগ্নিশর্মা চেহারা দেখে বিষ্টুর কাছা-কোঁচা এককাট্টা হবার জোগাড়। এমনকি বিষ্টুর বউ মিনতিও একগলা ঘোমটার আড়াল থেকে ডালডামাখানো পেছল গলায় বলল—"কাকাবাবু, কাল হবিবপুরে গিয়েছিলাম বাপের বাড়ি। মা কিছু সজনের ডাঁটা আর চালকুমড়ো দেওয়া বিউলি ডালের বড়ি দিয়েছিল। তা আপনি ভালোবাসেন বলে ক'খান নিয়ে এলাম আপনার জন্যে।"

শ্রীমন্ত দারোগা কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন—"নিয়ে যাও। ওসবে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এগুলোই আসল বুঝলে বিষ্টু। শুধু সোনা চিনলে হবে? পদার মতো লোকদেরও তো চিনতে হবে।"

শুধু কী বিষ্টু কর্মকার। কাসুন্দির হাটে সার্কাস হচ্ছিল—নিউ ভগবতী সার্কাস—শ্রীমন্ত দারোগার কানে এল সার্কাস থেকে একটা মাঝারি সাইজের বাঘ ট্রেনারের হাত ছিটকে পালিয়েছে। ব্যস! শ্রীমন্ত দারোগা টেকো হালদারের বড়ো খ্যাপলা জাল আর দু'খানা কোঁচ নিয়ে বসে রইলেন দেবেন পাড়ুইদের বাগানটা যেখানে নদীর সঙ্গে মিশেছে সেখানে। রাত্তির আড়াইটের সময় থানার জিপে চেপে একলা বগলদাবা করে সেই বাঘকে পৌঁছে দিয়ে এলেন সার্কাসের তাঁবুতে। সার্কাসের মালিক দামোদর নায়েক একটা হাজার টাকার নোট খামে ভরে অনেকক্ষণ ধরে পকেটে গুঁজে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু শ্রীমন্তর তাগড়া গোঁফের দিকে তাকাতেই নিজেকে সামলে নেয়।

এই হল শ্রীমন্ত দারোগা। অপরিসীম সাহস, সুঠাম মজবুত চেহারা। সততা ও নিষ্ঠার কোনো তুলনাই হয় না। সর্বদা যেন উনুনে চাপানো জলের গামলা। টগবগ টগবগ করে ফুটছে। দশবছর হল দারোগাগিরি করছেন। গত পাঁচবছর ধরে আড়াইসিকি গ্রামের থানার চার্জে থাকার পর দু'মাস হল এই ডুমুচ্ছে গ্রামে বদলি হয়ে এসেছেন। আড়াইসিকি থানা ছেড়ে আসার একটুও ইচ্ছে ছিল না ওঁর। কানা-ঘুষোয় শোনা যাচ্ছে ওপরওয়ালারা নাকি ওঁর কাজে-কর্মে সন্তুষ্ট নয়। শ্রীমন্ত দারোগা অবশ্য মুখে কিছু প্রকাশ করেননি। এমনকি ওঁর স্ত্রীর কাছেও নয়। শুধু ওঁর খাস আর্দালি শিবসদাগর একদিন প্রাণকেষ্টর দোকানে চা খেতে খেতে গল্প করছিল যে শ্রীমন্ত দারোগার নামে ওপর থেকে চিঠি এসেছে যে ওঁর সততায় কর্তৃপক্ষ ভীষণ বিরক্ত। এছাড়া গত চার বছর ছ'মাসে আড়াইসিকি গ্রামে একটাও ক্রাইম হয়নি, এমনকি ছাগল-হারানো বা সাইকেলে মুরগি চাপা দেওয়ার ঘটনাও নয়। উনি আসার প্রথম ছ'মাসেই যা বিষ্টু কামারের দোকানে চুরি কিংবা সার্কাসের বাঘ পালানোর ঘটনা, বা দুর্ঘটনা যাই বলুন, ঘটেছিল। তার পর থেকে তো কাক আর প্যাঁচা একসঙ্গে এক মালসা থেকে জল খায়। বিষ্টু কর্মকার তো রাতে দোকানের সাটারও নামায় না। শুধু কোলাপসিব্‌ল গেটটা টেনে রাখে। তালা-ফালাও দেয় না। গদাধর মোহান্তির বউ তো আবার সমস্ত গয়না-ফয়না, আংটি-ঘড়ি সব বাসরাস্তায়, যেখানে ধান শুকোতে দেওয়া হয়, সেখানে শুকোতে দেয়। মোট কথা গ্রামে আর চোর-ডাকাত-গুন্ডা-বদমাশ বলতে কেউ নেই। পদামস্তান এখন দিনরাত ছিন্নমস্তার মন্দিরে পুজো-আচ্চার জোগান দেয়।

এতে অবশ্য লাভ হয়েছে পাশের থানার দারোগা হরিনিবাস কাঁড়ারের। একবছরের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে গেছেন। গাঁয়ে রোজ একটা করে চুরি-ডাকাতি

খুনখারাপির ঘটনা লেগেই আছে। হরিনিবাসের কত সুনাম বেড়ে গেছে। চারতলা বাড়ি হাঁকিয়েছেন। হরিনিবাস বাজারে গেলে মাছের দাম বেড়ে যায়। শ্রীমন্ত দারোগার অবশ্য এদিকে কোনো আকর্ষণ নেই। শুধু আপত্তি ছিল এই ডুমুচ্ছে গ্রামে পোস্টিং পাওয়া নিয়ে। গ্রামের নামটা শুনেই পিত্তি চটকে গিয়েছিল। কবে কোন্‌কালে একটা ডুমুরগাছ আর একটা ছাতিমগাছ পাশাপাশি ছিল জমিদার ভক্তিভূষণ পালচৌধুরীর বাগানে। তার থেকে গ্রামটার নাম হয়েছিল ডুমুরছাতিম। লোকের মুখেমুখে কালেকালে সেটা ডুমুচ্ছে হয়ে গেছে।

তবু যাই হোক মানিয়ে নিয়েছিলেন শ্রীমন্ত দারোগা। রাতবিরেতে একা একা ঘুরে বেড়াতেন। কখনো জিপে চেপে, কখনো ঘোড়ার পিঠে, কখনো আবার হেঁটে হেঁটে। কাউকে ভয় পেতেন না। এক মাসের মধ্যে কেমন পালটে গেলেন। সব সময় তাঁর মনে হচ্ছে কেউ যেন তাঁকে ফলো করছে। ঘটনার সূত্রপাত এক সকালে। ভোর পাঁচটায় তাঁর হাঁটতে বেরোনোর অভ্যেস। ফুটিফুটি আলো। দূরের জিনিস ভালো দেখা যায় না। আবছা আবছা। ছায়া ছায়া। সে দিনটা ছিল মঙ্গলবার। আগের দিন ফিরেছেন বেশি রাতে। টেকো হালদারের বাগানে নাকি রোজ মাঝরাতে গানবাজনার শব্দ শোনা যায় বলে টেকো থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল। ওই রাতেই নাকি শ্রীমন্তর ঘাড়ে ভূতেরা সুড়সুড়ি দিয়েছিল। সবই অবশ্য সবজান্তা নিষ্কর্মা বাউন্ডুলে শিবেন বোসের রটনা। আসল কারণটা শ্রীমন্ত দারোগা কাউকে বলেননি। নিজের বউকেও নয়।

ভোর পাঁচটার সময় শ্রীমন্ত দারোগা বেরোলেন। হাফপ্যান্ট, টি-শার্ট, পায়ে কেড্‌স, মাথায় টুপি। রাস্তার কুকুর তাড়ানোর জন্য একটা লাঠি। গেটে তালা লাগিয়ে চাবিটা বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গটগট করে সামনের মোড় অবধি এলেন। অন্যদিন না দাঁড়িয়ে সটান বাঁদিকে ঘুরে মিশনমাঠের দিকের পথটা ধরেন। আজ থমকে দাঁড়ালেন। দ্বাদশ মন্দিরের রকে কেউ একজন বসেছিল। দূর থেকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না। তবু শ্রীমন্ত দারোগার অভিজ্ঞ চোখ খুব ভালো নজরে দেখল না তাকে। বয়স তিরিশের নীচে। গালে চাপ দাড়ি। পরনে ফুলপ্যান্ট আর ফুলছাপ দেওয়া হাওয়াই শার্ট। দারোগাবাবু বুঝতে পারলেন লোকটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। খানিক ভেবে নিয়ে মন্দিরের দিকে এগোলেন। লোকটা চকিতে উঠে হাঁটতে শুরু করল ডান দিকের রাস্তা ধরে। শ্রীমন্ত হাঁটার গতি বাড়ালেন যদি মোড়টায় পৌঁছে লোকটাকে দেখা যায়। মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই লোকটা চোখের নিমেষে দীপক বিষ্ণুদের পাশের গলিটার মধ্যে ঢুকে

গেল। শ্রীমন্ত দারোগা হাতের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে মিশনমাঠের দিকে হাঁটা লাগালেন। মাঠের সীমানার দেয়ালে একটা বড়ো লোহার গেট। সবসময় বন্ধ থাকলেও মানুষ ঢোকার জন্য একটা ছোটো গেটও আছে। মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়। মাঠে ঢুকতেই তাঁর চোখ ছানাবড়া। অনেকটা দূরে শিরীষগাছটার নীচে লোকটাকে দেখতে পেলেন। দারোগাবাবু ভাবলেন একটা পাক দিয়ে ওদিকে যাওয়ার সময় লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। মুখটা ঘোরাতেই লোকটা হাপিস।

এরপরে লোকটাকে প্রায়ই দেখতে পাচ্ছিলেন। কখনো সামনে, কখনো পেছনে। বাজারে গিয়ে নীচু হয়ে টমেটো বাছছেন, লোকটা আলুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। ডিউটিতে যাচ্ছেন, লোকটা। ঘোড়ায় চেপে হুমনিপোতা ব্লক অফিসে যাচ্ছেন, সামনে হেঁটে যাচ্ছে লোকটা। এমনকি হারান সাধুখাঁর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গেছেন, সেকেন্ড ব্যাচ, বরযাত্রীদের ব্যাচেই বসেছেন, খাতির বেশি পাওয়ার জন্য। সবে একটা মটন কাটলেট শেষ করে দ্বিতীয়টায় কামড় দিয়েছেন, থার্ড-রো তে দেখতে পেলেন লোকটাকে। চাপদাড়ি। প্যান্টের ওপরে ফুলছাপ হাওয়াই শার্ট। শ্রীমন্ত দারোগা যতবার তাকালেন ততবার দেখলেন লোকটা ওঁর দিকেই তাকিয়ে। এমনকি ইচ্ছে করে অন্যদিকে মুখ করে চোখের মণি ট্যারা করে দেখলেন। কোনো পরিবর্তন নেই। লোকটা তাঁকেই গিলছে। দারোগাবাবু খুব ভাবিত হলেন।

এভাবে চার-পাঁচদিন কাটল। দারোগাবাবু ভেতরে ভেতরে খুব চিন্তিত হলেন। খুন-টুন হয়ে যাবেন না তো! একবার ভাবলেন এটা আড়াইসিকি থানার দারোগা হরিনিবাসের কোনো চাল নয় তো! ডুমুচ্ছেতে কোনো অশান্তি নেই বলে ভাবটা এমন—'দাও পাঠিয়ে শ্রীমন্ত দারোগার ঘাড়ে। বুঝুক ঠেলা। মোট কথা খুবই চিন্তার মধ্যে আছেন। সাতদিনের মধ্যে ভুঁড়ি দু-এক ইঞ্চি কমে গেছে।' বেল্টে দুখানা ফুটো বাড়াতে হয়েছে। কোনো কাজেই আর আগের মতো মন লাগে না। অত যে চা খেতে ভালোবাসতেন, দিনে আট-দশ কাপ, সেই চা দেখলে এখন তার গা বমি দেয়। টুথব্রাশে পেস্ট লাগাতে গিয়ে প্রায়শই শেভিংক্রিম লাগিয়ে দাঁতে ঠেকিয়ে ওয়াক্ থুঃ করছেন। বাড়িতেও কথাবার্তা বলা কমিয়ে দিয়েছেন। কোনো রকমে ডিউটিটা করছেন।

প্রথম সপ্তাহটা ভালোভাবে কাটল। রোববারের দিনটা মাংসের ঝোল, আলুপোস্ত আর বিউলির ডাল দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরে দু-ঘণ্টা ছাঁকা ঘুম দিলেন। সোমবার সকালে মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে দ্বাদশ মন্দিরের দিকে তাকাতেই দেখলেন সেই দাড়িওলা ফুলছাপ

হাওয়াই শার্ট পরা লোকটা দাঁড়িয়ে। আজ আবার হাতে একটা হকিস্টিক। এই প্রথম সত্যিকারের ভয় পেয়ে গেলেন ডাকসাইটে দারোগা শ্রীমন্ত দত্ত। ঠিক করলেন মন্দিরের দিকে না গিয়ে ডানদিকে রাধাকান্ততলার পাশ দিয়ে ঘুরপথে মিশনমাঠে যাবেন। হাঁটা নিয়ে কথা, তা সে যে পথ দিয়েই হোকনা কেন।

শ্রীমন্ত দারোগা হাঁটছেন। টি-শার্ট, হাফ-প্যান্ট আর কেড্‌স জুতোয় যথেষ্ট সাহসী এবং স্মার্ট হবার চেষ্টা। নার্ভাসনেস কাটানোর জন্য বেশ চড়া গলায় গান ধরলেন।— "আমি ভয় করব না ভাই, করব না; দু-বেলা মরার আগে মরব না, ভাই মরব না.....।

বিধির বিধান কে খণ্ডাবে! রাধাকান্ততলা পার হয়ে বিবেকানন্দ স্কুলের গেটের সামনে এসেছেন কী আসেননি, আবার সেই লোকটা। বসাকদের আইসক্রিম কলের সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে গল্প করছে। শ্রীমন্তকে দেখেই চোঁ চোঁ দৌড়। শ্রীমন্ত দারোগা বুঝলেন লোকটা ভয় পেয়েছে। এতদিন ভেবে আসছিলেন লোকটা বদ মতলবে এসে ওঁকেই ভয় দেখাচ্ছে। আজ ওঁর চোখ খুলল। লোকটাকে বেপাড়ার কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালাতে দেখে তাঁর সাহস ফিরে এল। মনে মনে ভাবলেন, আজ একটা হেস্তনেস্ত, একটা এসপার-ওসপার করেই ছাড়ব। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। এখন তাঁর ভয়ডর ঘুচে গেছে। এতদিন ভাবছিলেন লোকটা ওঁকে ওয়াচ করছে। আজ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন লোকটা ভয় পেয়ে আড়ালে যেতে চাইছে।

অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে কখনো দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। অবশ্য দূরের থেকে মুখটাও ভালো ঠাহর করতে পারছেন না। তার ওপর গালভর্তি মৌচাকের মতো দাড়ি। তবে হাঁটার ভঙ্গিটা খুব চেনা চেনা মনে হল। শ্রীমন্ত যেন চোখের পলকে একমাস আগের শ্রীমন্ত হয়ে গেলেন। যেন আড়াইসিকি থানার দারোগা পদামস্তানের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছেন। ঠিক করে ফেললেন যেভাবেই হোক লোকটাকে ধরতে হবে। দীপক বিষ্ণুর বাড়ির গলিটা টপকাতে গিয়ে দেখলেন ব্যাটা গুটিসুটি মেরে অম্বিকা সর্দারের পানগুমটির পেছনে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীমন্ত সামনে আসতেই আবার দৌড়। 'থাম, থাম, গুলি করব' বলে হাতের কুকুর তাড়ানোর লাঠিটাকে রিভলবারের মতো তাগ করে পেছন পেছন ছুটলেন। তাড়াহুড়োতে লোকটা পড়ল ড্রেনের মধ্যে। উঠে পালাবার আগেই ঘাড়ের ওপর শ্রীমন্ত দারোগার সলিড রদ্দা। লোকটা কুঁই-কুঁই করে দারোগাবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে ধরল।

—কে রে তুই? ব্যাটা নচ্ছার পাজি শয়তান, ইয়ার্কি মারার জায়গা পাসনি। আমার

সঙ্গে টক্কর দিবি? কেউ পারল না, আড়াইসিকি থানার দেড়সিকির দারোগা হরিনিবাস পারল না, তুই তো কোথাকার ছারপোকা। কী নাম তোর?

—আজ্ঞে স্যার, বলছি দাঁড়ান। জামাটা ছাড়ুন, ঘাড়ে বড্ড ব্যথা লাগছে। দু-এক দিনের মধ্যেই দিয়ে দেব স্যার। সত্যি বলছি, স্যার। আর ভুল হবে না। একটু অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেসলাম স্যার। এবার কাটিয়ে উঠেছি। এই কাল পরশুর মধ্যে, ধরুনগে স্যার বুধবারের মধ্যে, মিটিয়ে দেব।

—কী উলটো-পালটা বকছিস। মাথায় ছিট আছে নাকি! জিজ্ঞেস করলাম নাম, আর তুই তার উত্তরে হাবিজাবি বকছিস। বলি কী দিয়ে দিবি বলছিস শুনি।

—বুঝতে পারছি, স্যার। অনেকদিন হয়ে গেল। কথার খেলাপ ভালো নয় জানি। নেহাত আপনার মতো মহানুভব বলে পার পেয়ে গেলাম। দু-একটা দিন সময় দিন, স্যার।

—বুঝলাম না কী বলতে চাইছিস। তোকে তো আমি চিনিই না। আগে কখনো দেখেছি বলেও মনে হয় না। কদিন ধরে দেখছি পাড়ায় ঘুরঘুর করছিস। আমাকে চোখেচোখে রাখছিস। সামনে পড়লে পালাবার ধান্দা করছিস। কে তুই?

শ্রীমন্ত দারোগা লোকটার চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করতে গিয়েই ঘটল এক কাণ্ড। কালো কুচকুচে চাপদাড়িটা তার ডান হাতের মুঠোয় চলে এল। লোকটাও ভ্যাঁ করে কেঁদে পা-দুটো জড়িয়ে বলল—আমাকে ছেড়ে দিন, স্যার। আর কক্ষনো আসব না আপনার থানার চৌহদ্দির মধ্যে। কালকেই আপনার একশো টাকা দিয়ে দেব। ধার থাকা ভালো নয়।

—তুই ছিদাম না? তাই তো বলি, চলন-বলনটা কেমন যেন চেনা বলে ঠাহর হচ্ছিল। এখন মনে পড়ছে, আড়াইসিকি থানার সামনে তোর চায়ের দোকান ছিল। একশো টাকা ধার নিয়েছিলি পরিবারের অসুখ বলে। অ্যাদ্দিনে খেয়াল হল। তা কে পাঠিয়েছে তোকে এখানে? নিশ্চয় কেউ পাঠিয়েছে।

—আজ্ঞে স্যার, হরিনিবাস দারোগা ক'দিন থেকে পেছনে জোঁকের মতো লেগে আছেন। রোজই বলছেন, শ্রীমন্তর থানায় কোনো গণ্ডগোল নেই। কিছু চোর-বদমাশকে আপনার থানায় চালান করার জন্য আমাকে লাগিয়েছিল। আমি স্যার, পদা, ভোম্বল, জগা, নুলো, পচা এদের সঙ্গে কথা বললাম, কেউই রাজি হল না। আপনাকে সবাই দেবতা বলে মানে। আমিও মানব স্যার। কথা দিলাম। আর আপনার একশো.....।

থাক। ওটা আর দিতে হবে না। তুই এখানে থেকে যা। তোকে একটা পোলট্রি করে দেব। বেশ ডিম আর মাংস খাওয়া যাবে। হরিনিবাসকে কীভাবে টাইট দেওয়া যায় ব্যবস্থা করছি।

মাসখানেক কেটে গেছে। শ্রীমন্ত দারোগা এখন বেশ ভালো আছেন। ভুঁড়িটা শান্তির জল পেয়ে আবার ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তাঁর আর মনে কোনো ভয়ডর নেই। আবার দিনে আট-দশ কাপ চা খাচ্ছেন। কোনো টেনশন নেই। মোট কথা শ্রীমন্ত দারোগা এখন বহাল তবিয়তে আছেন।

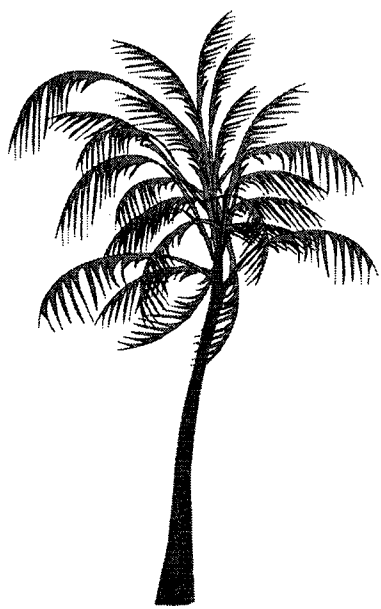

আক্কেল সেলামি

খবরের কাগজ পড়তে-পড়তেই বাঁ-হাত দিয়ে জানলার পর্দাটা একটু তুলে বাইরেটা দেখে নিলেন স্মৃতিময়বাবু। বেশ ঝকঝকে রোদ উঠেছে। মনটা ফুরফুরে লাগছে। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই কথাটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলেন—কই গো, বাজারের থলেটা দাও; সাড়ে দশটা বেজে গেল। এর পরে বাজারে গেলে আর কিছু পাব ভেবেছ? ইস! বড্ড দেরি হয়ে গেল। খবরের কাগজটাও পড়া হল না ভালো করে। কত খবর, পড়ে শেষ করা যায় না। বুঝলে গিন্নি, হেতমপুরে ডাইনি অপবাদে এক মহিলাকে গ্রামবাসীরা পিটিয়ে মেরেছে। এম. আই. এস-এর টেন পার্সেন্ট বোনাসটা তুলে দিল। লোকে আর টাকাপয়সা রাখবে কোথায়!....কই গো, কোথায় গেলে গো! কী অত সকাল থেকে রান্নাঘরে টুকুস-টাকুস খুটুর-খুটুর করছ, সামনে এসে বোসো না দু-দণ্ড। রোববারের সকাল বলে কথা। অন্য দিন তো ঘুম ভাঙতে-না ভাঙতেই পায়ে চাকা লাগিয়ে গাড়ি গিয়ারে ফেলে দিতে হয়। তোমারও তাড়া থাকে, আমারও দাঁতে ব্রাশ লাগাবার সময় থাকে না।....এই যে কাল শহর জুড়ে গ্রেগ চ্যাপেলের পুশকুত্তলিকা, থুড়ি কুশপুত্তলিকা, পোড়াল ওরা, তাতে কি ওই লালমুখো সাহেবের কিছু এল গেল, না তিনি বোঁচকা-বেডিং নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চম্পট দিলেন? বুঝলে প্রতিমা, ভালো খবর একটাও নেই। না-না, ভুল বললাম। তোমার জন্যে অন্তত একটা সুখের খবর আছে। বি এস এন এল এসটিডি আর লোকাল দুটোরই রেট কমিয়েছে। তোমার সুদিন এবার এসে গেল। চুটিয়ে বাপের বাড়ির সঙ্গে খোসগল্পের টক-টাইম বাড়াতে পারবে।

অনেকক্ষণ ধরেই রান্নাঘর থেকে বাসনের ঝনঝনানি আর কাপডিশের টুংটাং আওয়াজ আসছিল। তার সঙ্গে কলের থেকে ফুল স্পিডে জল পড়ার তুমুল শব্দ। সেদিকে হুঁশই নেই স্মৃতিময়বাবুর। আসলে সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর মনোযোগ বড়ো কম। তাঁর অবিশ্যি দোষ-টোষও বিশেষ নেই। প্রথম দিকে চেষ্টাও করেছিলেন অনেক। কিছুতেই কিছু হয়নি। একদিন ভাবলেন আজ দুটো ভাতেভাত রেঁধে গিন্নির গোমড়া মুখে হাসি ফোটাবেন। কপাল মন্দ হলে যা হয় আর কী। ভাত চাপিয়ে দিয়ে খবর শুনবেন বলে টিভিটা চালিয়ে সোফায় বসলেন, ব্যস দফারফা। ওপর থেকে

প্রতিমার হেঁড়ে গলার পরিত্রাহি চিৎকার—নাকে কি তুলো গুঁজেছ, না কি কাকভোরে জরদা দেওয়া বেনারসি পান মুখে ঠুসে বসে আছ? ভাত যে পুড়ে ঝামা হয়ে গেল সেদিকে খেয়াল নেই? পোড়া গন্ধে তো পাড়ার লোকের অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার জোগাড়। বলি কে তোমার মাথায় দিব্যি দিয়েছিল সাতসকালে সংসারের এই উপকারটা করার জন্য। যত বয়স বাড়ছে তত বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পাচ্ছে।

স্মৃতিময়বাবু বুঝলেন কাজটা বড়ো আহাম্মকি হয়ে গেছে। সে যাত্রা দুঃখ-টুঃখ প্রকাশ করে হাসিমুখে পোড়া হাঁড়ি মাজতে বসে গিয়েছিলেন। আর একদিন মাছের ঝোল রাঁধতে গিয়ে স্বাদ বাড়বে ভেবে খানিকটা হিং আর জাফরান দিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া চা করতে গিয়ে চিনির বদলে নুন দিয়ে কতদিন যে বউয়ের মুখ ঝামটা খেয়েছেন তার কোনো হিসেব নেই। এখন আর বড়ো একটা রান্নাঘরের ধারকাছ মাড়ান না।

স্মৃতিময়বাবু দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন বাঁকা চোখে। পৌনে এগারোটা। চঞ্চলতা প্রকাশ পেল, নাঃ আজ কপালে আবার গিন্নির মুখনাড়া আছে। গলার স্বরটাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে বললেন—বাজারের থলেটা কী ইঁদুরের পেটে চলে গেল নাকি? দিতে এত দেরি করছ কেন? আর হ্যাঁ, দেরি যখন হয়েই গেল, তখন আর এক কাপ চা দিয়ে দাও। খেয়েই যাই। সকালের চা-টা খেয়ে ঠিক মেজাজ এল না।

মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই পরপর দুটো বিস্ফোরণের শব্দ। গিন্নির মেজাজের সুখ্যাতি ভালোমতোই জানা আছে স্মৃতিময়বাবুর। হবে নাই বা কেন। আটাশ বছরের আনইন্টারাপ্‌টেড সহাবস্থান। কত সাইক্লোন টাইফুন সুনামি সামলে এখনও ব্যাটিং করে যাচ্ছেন।

স্মৃতিময়বাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বিস্ফোরণের শব্দে তাঁর সব কথা চাপা পড়ে গেল।

—দাঁড়াও দাঁড়াও। বাজারের থলে আর চা-চা করে মুখে ফেনা তুলে ফেললে। কাজ না থাকলে রাস্তায় গিয়ে পাড়ার জঞ্জাল পরিষ্কার করো কোদাল বেলচা নিয়ে। সমাজসেবা হবে। লোকে বাহবা দেবে। আমাকে জ্বালিও না।....তোমার আর কী, ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। মালতীর মা যে আজ আসেনি সে খেয়াল আছে? এইমাত্র বাসনের ডাঁই মেজে উঠলাম। এখন চা-ফা হবে না। পালের দোকান খোলা আছে, গিলে নিও। আমাকে না বকিয়ে বাজারটা করে আমাকে উদ্ধার করো। আর হ্যাঁ, আজ আর

জলখাবারের জন্যে আটার তাল মাখতে ইচ্ছে করছে না। বাজার করে আসার সময় শিঙাড়া জিলিপি নিয়ে এসো যদি গরম পাও। না হলে ম্যাগিও আনতে পারো।

ঠিক তিন মিনিট পরে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ। আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে গিন্নি এসে দাঁড়ালেন সোফার কাছে—এ কী! চা তো ঠান্ডা জল হয়ে গেল। অর্ধেক খেয়ে আর খাওনি দেখছি। তোমার মতো ভুলো লোককে নিয়ে আর চলে না। দয়া করে আমাকে এবার রেহাই দাও।

স্মৃতিময়বাবু চমকে উঠলেন। একেবারে রেঞ্জের মধ্যে গিন্নি। খবরের কাগজটা সরিয়ে রাখতে গিয়ে আর এক বিপত্তি। আসলে চায়ে উনি চুমুকই দেননি। ভুলে গেছেন। কাগজের নীচের দিকটা এতক্ষণ চায়ের কাপে লুটোপুটি খাচ্ছিল। কাপের অর্ধেক চা যে কাগজের পেটে গেছে সেটা এতক্ষণে বুঝলেন। মনে-মনে বেশ লজ্জিতও হলেন। আমতা-আমতা করে দু-বার সরি বলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লেন। নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে দরজার পেছনের হুক থেকে বাজারের থলে দুখানা নিয়ে চটি গলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তায় বেরিয়ে দুশো গজ পথ গেছেন কী যাননি, আবার এক ফ্যাসাদ। কে যেন পেছন থেকে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর নাম ধরে ডেকে চলেছেন—স্মৃতিময়বাবু ও স্মৃতিময়বাবু, একটু দাঁড়ান।

প্রথমটায় খেয়াল করেননি। খানিক পরে বুঝলেন। হাজার হলেও পিতৃদত্ত নাম তো, সহজে ভুল হওয়ার নয়। হাঁটার গতি কমিয়ে দিলেন। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করতেই শুনতে পেলেন, ও স্মৃতিদা শুনুন। করেছেন কী অ্যাঁ!

ততক্ষণে লোকটার নিশ্বাস তাঁর ঘাড়ের কাছে পড়তে শুরু করেছে। স্মৃতিময়বাবু তাকিয়ে দেখলেন পাশের বাড়ির বিশ্বম্ভরবাবু তাঁর পাঞ্জাবি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। পান খাওয়া দাঁত বের করে মিষ্টি-মিষ্টি হাসছেন—বাব্বা! কী বেখেয়ালে লোক আপনি, অ্যাঁ! কখন থেকে পেছন-পেছন আসছি, মানে দৌড়চ্ছি, আর হেঁকে-হেঁকে ডাকছি। আপনার হাঁটার যা ইস্পিড—

স্মৃতিময়বাবু খুব একটা আমল দিতে চাইলেন না। লোকটাকে উনি বিলক্ষণ চেনেন। এক নম্বর বকবকমবাজ। পারতপক্ষে কথা বলতে চান না। তবু ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে হয় ভেবে চলতে-চলতেই বললেন,—অঁ, তাই বুঝি। ডাকছিলেন? একটু তাড়া ছিল আর কী। তা বলুন, যা বলার বলে ফেলুন।

—না, মানে, তাড়া যে আছে বোঝাই যাচ্ছে।

—কী করে বুঝলেন? হাত-ফাত, থুড়ি পিঠ-ফিঠ দেখতে জানেন নাকি?

—না, মানে পা।

—তার মানে? তামাশা করছেন?

—কী যে বলেন দাদা। আপনার সঙ্গে তামাশা করব সে ধৃষ্টতা আমার আছে?

স্মৃতিময়বাবু ভুরু তুলে বললেন,—বাজার করতে হবে। এর পর বাজারে গেলে মাছের আঁশ আর নাড়িভুঁড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। বলি আমার বকুনিটা কি আপনি খাবেন?

—তা যা বলেছেন। আমারও একই অবস্থা। সকাল থেকে রাত অব্দি ওই আপনার মতোই বকুনি। শুধু বকুনি আর বকুনি। মুখঝামটা খেতে-খেতে দেখুন না কত রোগা হয়ে গেছি। আপনি তো তবু, যাক বলতে নেই, আজ আপনার জন্মবার-টম্মবার নয় তো, মানে তেলে জলে আছেন। আমার অবস্থাটা দেখুন, হাত-পায়ের শিরাগুলো যেন শুকনো ছোলাশাক।

স্মৃতিময়বাবু এবার বেশ বিরক্ত হলেন। তবু যথাসম্ভব ভদ্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করে বললেন—আরে মশাই, বেশ লোক আপনি! বলছি তাড়া আছে। তখন থেকে একই কথা হাজিয়ে যাচ্ছেন। যা বলার চটপট খোলসা করে বলে ফেললেই তো হয়। তখন থেকে গৌরচন্দ্রিকা করছেন কেন?

শব্দটা ঠিক বুঝলাম না, মুখ্যু মানুষ। আপনার কাছে আমি, মানে যাকে বলে হিরে আর জিরে। ইংরেজি শব্দ না ফারসি? আগে কারও মুখে শুনিনি তো তাই বললাম। কথাটার অর্থ যদি বুঝিয়ে বলতেন। আচ্ছা আজ না হয় থাক। তাড়া আছে বলছিলেন।

স্মৃতিময়বাবু এবারে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না। মেজাজ হারিয়ে ফেললেন। বেশ বিরক্তির সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলেন—ধুর মশাই এখন যান তো। কানের পোকা নড়িয়ে দিলেন। এইজন্যেই পাড়ায় আপনাকে কেউ পছন্দ করে না।

লোকটা দুই কানে হাত দিয়ে, গদগদ ভাব করে, চোখে-মুখে বেশ ভক্তি-টক্তি এনে বললেন—বলছিলাম কী, যাকগে না হয় থাক, বলে কাজ নেই। কীসের থেকে কী হয়ে যাবে। বলতেও সংকোচ হয়। আপনার মতো মানুষের নজর সব সময় ওপরের দিকে থাকে। আমার মতো চশমখোর তো আপনি নন। বেরোবার সময় তাড়াহুড়োতে ওরকম একটু আধটু মিসটেক হতেই পারে। আর তা ছাড়া চটির দিকে কজনই বা খেয়াল করে বলুন। নেহাত আমি বিয়েবাড়ি টিয়েবাড়িতে পুরোনো চটি পালটে নতুন

চটি হাতিয়ে, সরি পাতিয়ে নেওয়ার ধান্দায় থাকি বলেই চটির দিকে নজর রাখি। বলি ডান পায়ের চটিটা কি বউদিঠাকরুনের?

স্মৃতিময়বাবুর হুঁশ ছিল না। নিজের মনেই ডবল স্পিডে হেঁটে যাচ্ছিলেন। লোকটার শেষ কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে পায়ের দিকে তাকালেন। সত্যিই তো দু পায়ে দুরকম চটি। একপাটি নিজের, আর এক পাটি গিন্নির। এতক্ষণে খেয়াল হল কেন ওরকম অস্বস্তি হচ্ছিল। আমতা আমতা করে বললেন, আরে মশাই, কীরকম লোক আপনি! গৌরচন্দ্রিকা না করে আরও আগেই বলতে পারতেন। যাকগে, বাজার এসে গেছে। আপনি এবার আসতে পারেন। আমি না হয় বাড়ি ফেরার সময় একটা রিকশা নিয়ে নেব।

সত্যিসত্যিই বাজারের কাছে এসে পড়েছিলেন দুজনে। স্মৃতিময়বাবু চারপাশটা দেখে নিয়ে পা থেকে চটিজোড়া খুলে মাছের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর একটা ডিঙি মেরে বাজারের গলিতে ঢুকে পড়লেন। সঙ্গের লোকটি বেগতিক দেখে পিঠটান দিল।

শেষবেলার বাজার। ভালো জিনিস কিছু নেই বললেই হয়। নেহাত রবিবার বলেই দু-চারটে সবজিওলা তখনও ছিল। চটপট করে কিছু ডাঁটা মুলো-শিম-বেগুন নিয়ে এগোলেন মাছের গলির মধ্যে। পচা মাছ কিনে-কিনে গিন্নির কাছে বকুনি খেয়ে ইদানীং দু একটা বাঁধা মাছওলা পছন্দ করে রেখেছেন। ভাবলেন গঙ্গার কাছ থেকে কিছু কুঁচোকাঁচা মাছ নেবেন। রোববার দিন শেষ পাতে একটু পুঁটি-মৌরলার টকঝোল খারাপ লাগে না। গিন্নিরও খুব পছন্দ। নিলে খুশিই হবে।

কাছে গিয়ে মুখটা কাঁচুমাচু করে দাঁড়াতেই গঙ্গা জিজ্ঞেস করল—কে গেল, দাদা?

স্মৃতিময়বাবু চমকালেন—কে গেল মানে? কে আবার কোথায় যাবে? মৌরলা কত করে দিচ্ছিস। পচা হবে না তো?

—মানে, বাবা না মা?

স্মৃতিময়বাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না। খুব যে একটা বোঝার চেষ্টা করলেন সেরকম ভাবও ফুটে উঠল না।

—তা কত বয়স হয়েছিল? আশি পেরিয়েছিল? ভুগলেন টুগলেন? তাই দেখিনি ক'দিন বাজারে। দাড়ি আর খালি পা দেখেই বুঝেছি। যা হোক, মৎস্যমুখের মাছটা বাবু আমার এখেন থেকেই নেবেন। দামের জন্যে চিন্তা করবেন না।

স্মৃতিময়বাবু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—সাতসকালে গাঁজাফাঁজা টেনেছিস নাকি? কী বলতে চাস?

—বলি দাম কি কোনোদিন বেশি নিয়েচি আপনার থেকে? সে আপনি ভাববেন না....গুরুদশা নিয়ে মাছবাজারে এলেন কেন, আমাকে খবর পাঠালেই চলে আসতাম।

স্মৃতিময়বাবু যেন কিছুরই তাল খুঁজে পাচ্ছেন না। মনের ভেতর হাপরের ওঠানামা। চাইলাম মাছ, আর ও ব্যাটা মৎস্যমুখ গুরুদশা তখন থেকে কী সব প্রলাপ বকে চলেছে।

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন,—আরে মশাই, তালকানা নাকি? দিলেন তো পা টা মাড়িয়ে। চোখের মাথা খেয়ে বসে আছেন নাকি? উঃ! পুরো পাতাটার নুনছাল উঠিয়ে দিলেন।

—সরি দাদা, দেখতে পাইনি। এক্সট্রিমলি সরি।

সরি বললেই সাত খুন মাপ হয়ে গেল? আমার পায়ের ব্যথাটা কি আপনি সারিয়ে দেবেন? বুটজুতো পরে কেউ বাজারে আসে।

লোকটি মোলায়েম কণ্ঠস্বরে বলল—আপনিই বা ভিড়ের মধ্যে খালি পায়ে বাজারে এসেছেন কেন?

স্মৃতিময়বাবু বিষম খেলেন। খালি পা, মুখে চার পাঁচ দিনের দাড়ি, গায়ে চাদর জড়ানো, ধুতিটাও কোরা, বেরোবার সময় চুলে চিরুনি দেওয়ার কথাও খেয়াল হয়নি—গঙ্গার আর অপরাধ কী? অশৌচ-অশৌচ ভাব তো বিলক্ষণ ফুটে আছে। নিজের অপরিণামদর্শিতার জন্যে মনে-মনে পরিতাপও হচ্ছিল খুব। এ যাত্রায় মাছ কেনার আশা ত্যাগ করলেন। কপালে বউয়ের মুখনানা থাকলে খণ্ডাবে কে?

গঙ্গার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে চলে এলেন ডিমের দোকানে। নিদেন কিছু ডিম নিয়ে ঘরে না ঢুকলে রেহাই নেই। বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছেন গিন্নি নিরামিষ একদম খেতে পারে না। বাড়ি ফিরে গিন্নির বাউন্সারগুলো কীভাবে ফেস করবেন, হুক করবেন না ডাক করবেন, তাই ভাবতে ভাবতে বাজারের গলি থেকে বেরোলেন। আবার কবে বাজারে আসতে পারবেন সেই আশঙ্কায় ছ'টা পোল্ট্রির ডিম আর কেজি পাঁচেক আলু পিঁয়াজও কিনে নিলেন। ব্যাগের ওজনটা ভালোই হল। তার ওপর রাস্তায় ইটের খোয়া ফেলেছে। পায়ে যেন ছুঁচ ফুটছে। ব্যাগের ভারে একদিকের কাঁধ ঝুলে গেছে। হাত পালটে-পালটে কোনো রকমে রিকশাস্ট্যান্ডের কাছাকাছি এলেন।

—স্যার, দিন-দিন, আমাকে দিন ব্যাগদুটো। আমি থাকতে আপনি ব্যাগ বইবেন

এটা কি ভালো দেখায় বলুন। আমি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। আপনি বরং একটা রিকশা নিয়ে চলে যান। অ্যাই বিরিঞ্চি, বাবুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়। সাবধানে চালাবি, যেন একটুও জার্কিন না লাগে।

স্মৃতিময় হকচকিয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় একটু ঘাবড়ে গেলেন। তবে মুখে প্রকাশ করলেন না। পাশে পাশে হাঁটছিল বলে আগে ভালো করে খেয়াল করেননি। আলগোছে দেখে তখন মনে হয়েছিল পাড়ার বিপিনের তেলেভাজার দোকানে সর্বক্ষণ বসে থাকা বখাটে ন্যাড়াটা। এখন সামনাসামনি দেখে ন্যাড়া বলে মনে হল না। ন্যাড়ার চেহারার সঙ্গে অবশ্য বিস্তর মিল আছে। কেমন যেন ধন্ধে পড়ে গেলেন স্মৃতিময়বাবু। কী করবেন ভেবে ওঠার আগেই একরকম টেনে হিঁচড়ে ব্যাগদুটোর দখল নিয়ে নিয়েছে ছেলেটা।

স্মৃতিময়বাবু দুবার ঢোঁক গিলে আমতা-আমতা করে বললেন,—তুমিই একটু আগে মাছবাজারে গলির মধ্যে আমার পেছন-পেছন আসছিলে না? তোমার নাম ন্যাড়া তো? বিপিনের দোকানে থাকা হয় না?

ছেলেটা অমায়িক হাসি হেসে বলল—কী পচা গরম পড়েছে বলুন। রাস্তায় খোয়া ফেলার আর সময় পেল না। চাল-টাল কিনলেন বোধ হয়। ভালোই করেছেন। এ কী! পায়ের পাতাটা তো চটকানো ছানার জিলিপি করে দিয়েছে। আপনি কিছু বললেন না? ছেড়ে দিলেন? নিন, রিকশা এসে গেছে। উঠে পড়ুন। সাবধানে। পায়ে যেন চাড় না লাগে।

স্মৃতিময়বাবু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন,—তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না। তুমি ন্যাড়া নও তো! তোমার নাম কী? যেচে আমাকে সাহায্য করতে এসেছ কেন? চেনো আমাকে? আমার হেলপ্ লাগবে না। তুমি আসতে পারো। আমি তোমাকে চিনি না।

—দেখুন স্মৃতিদা, না চেনাটা, নাম না জানাটা কোনো বড়ো ব্যাপার নয়। এখন নাম জানেন না, জানতে কতক্ষণ? ন্যাড়াকে তো চেনেন। তাতেই হবে। আমি ন্যাড়ার ছোটো ভাই। আমাকে আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে ভালোই চিনি। আপনার মতো মানুষ লাখে তিনটে মেলে। নিন উঠুন।

—থাক-থাক, কোনো দরকার নেই। যেচে উপকার করা খারাপ, জানো তো? দাও, ব্যাগদুটো দাও সাবধানে। ঝাঁকিয়ো না। ডিম আছে।

—ঠিক আছে। আপনি উঠুন, আমি ব্যাগদুটো আপনার পায়ের মাঝখানে রেখে দিচ্ছি। একটা কথা বলব স্যার?

—আবার কী কথা? তোমার তো দেখছি কথার আর সীমা পরিসীমা নেই।

—বলছিলাম কী দাদা, বউদিঠাকরুণ বললেন বাড়িতে চা পাতা, পোস্ত আর সরষের তেল বাড়ন্ত। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বলতে বলেছেন। তা আপনার পায়ের আবার এই অবস্থা। আবার নামবেন, আবার উঠে—।

—তোমার সঙ্গে বউদির কোথায় দেখা হল? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি? আমার বাড়ি কোথায় বলো তো?

—লজ্জা দেবেন না স্যার। আপনার মতো মহামান্য লোকের বাড়ি না চিনে থাকা যায়? আটচালার বাঁদিকে পুকুরটার পরেই তো আপনার বাড়ি। হলুদ রঙের দেওয়াল, সাদা গ্রিল দেওয়া গেট, উঠোনে গাঁদা আর চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়। ঠিক বলছি কিনা বলুন। তা আপনি আবার কষ্ট করে নামবেন কেন, আমাকে টাকা দিন, এনে দিচ্ছি। আপনার জন্যে কিছু করতে বড়ো মন চায়। আপনি রিকশায় বসে থাকুন। এই পা নিয়ে আবার খোয়ার মধ্যে যেতে হবে না।

স্মৃতিময়বাবু যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—তুমি আমার বাড়িতে কী করতে গেসলে?

—আর বলবেন না। বাজারে আপনাকে খালি পায়ে ঘুরতে দেখে ভাবলাম বউদি-ঠাকরুনের কাছ থেকে আপনার ভালো জুতোজোড়াটা চে' আনি। তা বউদিঠাকরুনের দেখলাম আপনার ওপর বিস্তর ক্রোধ। বললেন কী—না থাক, আপনার শুনে কাজ নেই।

—না, না বলো। বলে ফেলো। আমার জানা দরকার।

বললেন কী, বুড়ো মরুকগে। খালি পায়ে হেঁটে দেখুক কেমন লাগে। বুড়োর ভিমরতি হয়েছে। স্যার, আর বলা যাবে না। আপনি শুনলে দুঃখ পাবেন।

দুঃখ! ছোঃ! তুমি খেপেছ? স্মৃতিময় পাকড়াশিকে টাইট দেওয়া অত সোজা নয়। এই নাও একশোটা টাকা রাখো। জিনিসগুলো কিনে নিয়ে এসো। আমি চললাম। একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। এই বিরিঞ্চি, চালা তো দেখি স্পিডে।

বাড়ি গেটে পৌঁছতেই স্মৃতিময় প্রায় ভিরমি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন।

—বলি তোমার আক্কেলটা কী শুনি। দু-ঘণ্টা ধরে কী করছিলে? বাজারশুদ্ধু তুলে এনেছ নাকি? আবার অচেনা অজানা একটা লোককে দিয়ে জুতো চেয়ে পাঠানো হয়েছে!

তা জুতোজোড়া করলে কী? এখনও তো দেখছি খালি পায়ে। আর কী ভুলো মনরে বাবা। বাজার যাওয়ার সময় পয়সা নিয়ে যেতে কেউ ভুলে যায়, তা এই তোমাকেই দেখলাম। লোকটাকে তো কস্মিনকালেও দেখেনি। ওর হাতে দুশো টাকা দিতে ভরসা হচ্ছিল না। তা লোকটা দেখলাম ভালোই চেনে। তোমার কাছে পড়েছে বলল। তা ছাড়া বলল—।

—তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে, না কি? আমি টাকা চেয়ে পাঠাব কেন? টাকা তো আমি নিয়েই গেছি। তা ছাড়া জুতো আমি পরেই গিয়েছিলাম। তবে ভুল করে আমার একপাটি আর তোমার একপাটি পরে ফেলেছিলাম। এইটুকুন তো রাস্তা। সে তো রিকশা করেই আসা যায়। বরং তুমিই তো ভুলোরাম। চা-পাতা, সরষের তেল আর পোস্ত আনার কথা ভুলে মেরে দিয়েছ। তার জন্যেই তো দেরি হল। তা আমি ওকে, যাচ্চলে নামটাও জিজ্ঞেস করা হল না, একশোটা টাকা দিয়েছি। এক্ষুনি আনছে। এই নাও, ব্যাগদুটো ধরো। আজ মাছ পাইনি। ডিমের ঝোল-ভাতই করো।

—তুমি কি বাজারে গিয়ে নেশাটেশা করে এসেছ নাকি? পরশুদিন মাসকাবারের মুদিখানা বাজার করে আনলে নিজের হাতে। আজ আবার পোস্ত তেল চা লাগবে কী জন্যে শুনি। একবারও কি তোমার মাথায় এল না এই সামান্য কথাটা? মহা ফেরেপ-বাজের পাল্লায় পড়েছ তুমি। ও আর এসেছে। তোমার একশোটা টাকাই জলে গেল।

—আর তুমিই বা কী শুনি। নাম-না-ধাম না জেনেই নতুন জুতোজোড়াটা আর দুশো টাকা দিয়ে দিলে? বুদ্ধিশুদ্ধি তোমারই বা কবে হবে শুনি। শুধু আমার ভুল ধরে গেলে হবে? যাকগে যা হওয়ার হয়ে গেছে। অনেক শিক্ষা হল। দুজনেরই আক্কেল সেলামি দেওয়ার দরকার ছিল। পঞ্চতন্ত্রে আছে না 'অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ'। পরীক্ষায় খুব কারক-বিভক্তি লিখতে দিত।

—অতশত বুঝি না বাপু। তবে ভুল আমারও হয়েছে। সকালে তোমার ওপর চোটপাট করাটা ঠিক হয়নি।

—ঠিক আছে মাপ করে দিলাম। তবে ন্যাড়ার ভাই যখন বলেছে তখন ওর নাম নিশ্চয়ই গ্যাঁড়া হবে। কোনো সন্দেহ নেই। না হলে দুদিক থেকে গ্যাঁড়াবেই বা কেন। এবার পাড়ার ক্লাবকে বলে ওকে একটা গ্র্যান্ড সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বুঝলে।

—আর তুমি সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি হবে।

অদ্ভুত ডাকাতির গল্প

জায়গাটাকে পুরোদস্তুর শহর বলা না গেলেও গ্রাম বলা যায় না, কোনো মতেই। বরং আধা শহর বা প্রায় শহরই বলা যেতে পারে। কলকাতা থেকে কী-ই বা এমন দূর, বড়ো জোর বিশ কিলোমিটার। শহরের সব বৈশিষ্ট্যই এখানে বিদ্যমান, কয়েকটি মাত্র ছাড়া। যেমন পাতালরেল, চক্ররেল, ট্রাম কিংবা ভিক্টোরিয়া, নন্দন, অ্যাকাডেমি ইত্যাদি। সুতরাং খোদ কলকাতায় থাকতে পারছেন না বলে বাড়ির মালিক বিজয়কেতন মুখোটির কোনো আপশোশ বা মনোবেদনা নেই। বরং মেট্রোপোলিসের ধোঁয়া কালি যানজট থেকে মুক্ত হয়ে একটু খোলামেলায় থাকলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে। বিজয়কেতনের ভাগ্যটাও ভালো বলতে হবে। ঠাকুর্দার দূরদৃষ্টি ছিল মানতে হবে বৈকি। গঙ্গার ধারে বাইশকাঠা জমির ঠিক মাঝখানে তিনতলা বাড়ি। দেখে বোঝার উপায় নেই যে একশোর বেশি বয়স বাড়িটার। ঝকঝকে তকতকে। চারদিকে রকমারি ফুলের বাগান। আধুনিক আসবাবপত্র। হাল ফ্যাশানের সোফাসেট থেকে শুরু করে ফ্রিজ টিভি ওয়াশিং মেশিন মোবাইল ফোন ডিভিডি প্লেয়ার মাইক্রোওভেন, এমনকি কম্পিউটার পর্যন্ত। বাড়ির সামনে বিশাল গেট। থামের গায়ে সাদা পাথরে লেখা ব্রিগেডিয়ার বিজয়কেতন মুখোটি। বছর দশেক হল অবসর নিয়ে এক্সপোর্টের ব্যাবসা করেন। টাকাপয়সা সোনাদানা জমিজায়গা নিয়ে সম্পত্তির কোনো হিসেব তাঁর আছে বলে মনে হয় না। বাড়িতে লোক বলতে পরিবারের সদস্যসংখ্যা নিজেকে নিয়ে তিন। স্ত্রী এবং তাঁর শ্যালকপুত্র, মানে গিন্নির ভাইপো। একমাত্র পুত্রসন্তান সস্ত্রীক বিদেশে থাকে। গিন্নির ভাইপোর নাম অবিকল্প সান্যাল। সত্যিই তার বিকল্প নেই। বিজয়কেতনের ভাষায় অকালকুষ্মাণ্ড। মাঝে মাঝে নিজেই আক্ষেপ করে বলেন—"কী ভিমরতিই হয়েছিল আমার গিন্নির, নইলে এমন অপদার্থ ছেলেকে কেউ পুষ্যিপুত্র করে।" স্কুলের বিদ্যে নাইন ফেল। যত রকম কুসংসর্গে মেশা যায়, যতরকম কু-কাজ করা যায় সবই তার আয়ত্তে। কতবার ভেবেছেন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন, গিন্নির কথা ভেবে নিজেকে সংযত রেখেছেন। অবিকল্পর ডাক নাম গুণধর। ওর পিসি ডাকে গুনো বলে। সত্যিই গুণধর। চোর বললে কম বলা হবে। ডাকাতের বাবা। ও নাকি চোর ডাকাতের দলেও

নাম লিখিয়েছে এমন কথা বিজয়কেতনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মাঝে মাঝে বলে থাকেন। বাড়িতে কর্মচারীর সংখ্যা সাত। একজন বিজয়কেতনের সদাসঙ্গী ম্যানেজার কাম আড্ডার অংশীদার। একজন গিন্নির খাস কাজের লোক। ঠাকুর মালি দারোয়ান ড্রাইভার ইত্যাদি নিয়ে আরও পাঁচজন। এত বৈভব, এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও বিজয়কেতনের চিন্তার শেষ নেই গুণধরকে নিয়ে। থানা-পুলিশ করলে লোক জানাজানি হবে। তাতে নিজের মুখেই চুনকালি লাগবে। তাই মাঝে মাঝে চিন্তার গাঢ় মেঘে ঢেকে যায় তাঁর মনের আকাশ।

কার্তিক মাসের শেষ। বাতাসে হিমেল ভাব। বেলা ছোটো হয়ে আসছে। পশ্চিমের বারান্দায় আরামকেদারায় বসে আছেন বিজয়কেতন। হাতে একটা মোটা কাগজের খাম। খামটা খুলে ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে চোখের সামনে মেলে ধরলেন। কিছুক্ষণ মন দিয়ে পড়ার পর আবার ভাঁজ করে খামে ভরে কোলের ওপর রেখে দিলেন।

—বাবু চা খাবেন না কফি?

বিজয়কেতন ডান দিকে তাকালেন। কাঁধের গামছায় হাত কচলাতে কচলাতে নিরাপদ জিজ্ঞেস করল, চা দেব বাবু?

—চা, আচ্ছা দাও। আর হ্যাঁ শোনো, গিন্নিমাকে একটু ডেকে দিয়ো তো। খানিক পরে গিন্নিমা এলেন। পেছনে পেছনে দু-কাপ চা হাতে করে নিরাপদ। কাপ দুটো টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল নিরাপদ, মনিবের দিকে পেছন করে।

গিন্নি জিজ্ঞেস করলেন কী হল ডাকলে কেন? শরীর খারাপ? না আজ তোমার আড্ডার বন্ধুরা আসবেন না?

না, না, তেমন কিছু না। আজ বড়ো আনন্দের দিন। বহু দিনের অপূর্ণ একটা সাধ একটা ইচ্ছে আজ পূর্ণ হল।

কী হয়েছে খুলে বলো না কেন বাবা। বুড়ো বয়সে তোমার এই আদিখ্যেতা ভালো লাগে না। বলি কী এমন সাধ পূরণ হল যে তুমি খুশিতে একেবারে যাকে বলে ডগমগ হয়ে গেলে?

বিজয়কেতন হাতের খাম থেকে কাগজটা বের করে গিন্নির হাতে দিলেন। খানিক পরে তাঁর সে কী আর্তচিৎকার, 'ও মা আমার কী হবে গো। সব্বোনাশ হয়ে গেল। কী অলক্ষুনে চিঠি গো। কে পাঠাল গো। কার এমন কুমতি জাগল। আমাদের....।'

গিন্নিকে থামিয়ে দিয়ে বিজয়কেতন বললেন আরে এমন দারুণ একটা আনন্দ সংবাদ,

কোথায় পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন মিলে মচ্ছব করবে, তা না উনি ভিয়েন করে মরাকান্না কাঁদতে বসলেন। আরে কটা লোকের ভাগ্যে এমন সোনার সুযোগ আসে বলতে পার? বাড়িতে ডাকাত পড়া একি সকলের জীবনে হয়? তাও আবার আগাম চিঠি দিয়ে। এসব তো একশো বছর আগে ঘটত। আর শহরে তো ঘটেই না বলতে গেলে। ওঃ কী দারুণ একটা খবর।

তোমার মাথাটা একদম গেছে। ও মা আমার কী হবে গো। ঠাকুর, তুমি আমার কী সব্বোনাশ করলে।

গিন্নিমার কান্না শুনে আধ ডজন কাজের লোক, মায় দারোয়ান পর্যন্ত এসে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

গুণধর হাঁফাতে হাঁফাতে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে পিসেমশাই? কোনো খারাপ খবর?

খারাপ খবর কী বলছিস রে হতভাগা। এমন কপাল ক'জনের হয়? এতদিনে জাতে ওঠার মতো একটা সুযোগ এল। চিঠি দিয়ে বাড়িতে ডাকাতি করতে আসা, এ জিনিস বড়ো জমিদার-টমিদার না হলে হয় নাকি? যাক, এতদিনে ওরা আমাকে স্বীকৃতি দিল।

আমি কিস্যু বুঝতে পারছি না পিসেমশাই। কীসের চিঠি, কীসের ডাকাতি, আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আরে বুদ্ধু, এসব বুঝতে গেলে এলেম লাগে। নাইন ফেল বিদ্যে নিয়ে যদি সব কিছু বোঝা যেত তা হলে তুইও এদের মতো বড়ো ডাকাত হয়ে যেতিস।

কাদের মতো?

তবে আর বলছি কী। বাড়িতে ডাকাত পড়বে। সামনের বুধবার। অমাবস্যার রাতে। ঠিক দুটো কুড়িতে। এই যে তার চিঠি, পড়ে দেখ। না থাক। তোর তো বিদ্যের বহর পাতে দেবার মতো নয়। আমিই পড়ছি। শোন। আর হ্যাঁ, কালিকিংকর, নিরাপদ, বংশী, প্রাণকেষ্ট, মালতীর মা, তোরাও সবাই মন দিয়ে শোন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়কেতন মুখোটি মহাশয়, আগামী বুধবার, তিরিশে কার্তিক, রাত্রি দুটো বেজে কুড়ি মিনিটে আপনার বসতবাটিতে আমরা ডাকাতি করা মনস্থ করেছি। আপনি প্রস্তুত থাকবেন। কোনো রকম বাধা দেবার চেষ্টা করলে সপরিবার জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। থানা-পুলিশ করার চেষ্টা করলেও লাভ হবে না। হিতে বিপরীত হবে। আশা করি এর অন্যথা হবে না।

ভবদীয়

অমঙ্গলানন্দ, মহাবলানন্দ, অমিততেজানন্দ, বিশ্বপরাক্রমানন্দ, ত্রিভুনেশ্বরানন্দ।

চিঠির শেষটুকু পড়ার আগেই বংশী দারোয়ান আরিব্বাস বলে লাফ মেরে নিজের ঘরের দিকে দৌড় লাগাল। বাকিরাও 'বাবু আমাদের ছুটি দিয়ে দিন' বলে একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিল।

গুণধর বলল, পিসেমশাই তা হলে কী করবেন? এতো বড়ো সর্বনেশে খবর। পুলিশে খবর দেবেন?

খেপেছিস? জীবনে একবারই সুযোগ এসেছে। আর হয়তো কখনও আসবে না। শোন, একটা কথা জেনে রাখিস, একটু আধটু হার্টের প্রব্লেম না থাকলে, একটু আধটু সুগার কিম্বা স্পন্ডিলাইটিস না থাকলে যেমন স্ট্যাটাস থাকে না, তেমনই বাড়িতে চিঠি দিয়ে ডাকাত ফাকাত না পড়লে লোকে তেমন মান্যি করে না।

গিন্নির কান্না এতক্ষণে থেমে গেছে। ঝাঁপিয়ে উঠে বললেন, থাকো তুমি তোমার পেয়ারের ডাকাত ফাকাত নিয়ে। ব্যা ব্যা, কী কুচ্ছিত নাম সব। অবগলানন্দ, মহাবলীপুরম এগুলো নাম নাকি? যা হয় করো। আমি গুনোকে নিয়ে চল্লাম দাদার কাছে। যার ছেলে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে শান্তি পাই।

বিজয়কেতন হাত দুটো কাঁধের ওপর তুলে ডাম্বেল ভাঁজার ভাব করে হাসতে হাসতে বললেন, খামোকা ঘাবড়াচ্ছ। ডাকাত মানে কী খারাপ নাকি! ভালো, শিক্ষিত ডাকাতও তো হয়, না কি? দাদার কাছে যাওয়ার দরকার কী? তা ছাড়া গুনো কি আমাকে একা ফেলে যাবে নাকি? ও একটা ইয়ংম্যান। সাহসী ছেলে। কীরে গুনো, থাকবি না আমার সঙ্গে? ডাকাতের কথা তো এতকাল খগেন মিত্তিরের বইতেই পড়েছিস। আসল ডাকাত কেমন হয় দেখে নে একবার।

বলছিলাম কি পিসেমশাই, আপনি কি সিন্দুকের টাকাকড়ি সোনাদানা রুপোর বাসন কোশন সব ডাকাতদের দিয়ে দেবেন?

তা ছাড়া কী? বললাম না ওয়ান্স ইন অ্যা লাইফ অপোরচুনিটি। মিস করলে চলবে? ব্রিগেডিয়ার বিজয়কেতন মুখোটির দিল যে কত বড়ো হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছারা। নিরাপদ, প্রাণকেষ্ট, মালতীর মা, কালিকিংকর, বংশীটা কোথায় পালাল আবার, যাক গে ছাড়, হ্যাঁ, শোন সবাই, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি থাকতে তোদের কোনো ক্ষতি হবে না। বরং লাভই হবে। আমার দুখানা সিন্দুকে যা সোনাদানা হিরে মানিক আছে তা ওই পাঁচ পিস প্যাংলাকার্তিক ডাকাত নিতে পারবে না, যতই তাদের

অমিতেজানন্দ, মহাবলানন্দ, বিশ্বপরাক্রমানন্দ নাম হোক না কেন। বলছিলাম কী এই সুযোগে তোদেরও কিছু লাভ হবে। মেঝে থেকে কুড়িয়ে যা পাবি তাই তোদের রাখার জায়গা নেই।

গিন্নি মুখ ঝামটে বলে উঠলেন, চালাকি পেয়েছ। সব বিলিয়ে দেবে? আমার বাবার দেওয়া মকরচূড় মুকুট, সীতাহার, ললন্তিকা, ময়ূরকঙ্কণ, বিছেকবচ এগুলো বিলিয়ে দিলে দেখাব মজা।

বিজয়কেতন মুচকি হেসে বললেন, তোমার বাবার কথা আর তুলো না তো, কতকগুলো পেতলের ছাইপাঁশ দিয়ে মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়েছেন। নেহাত আমি মকরকেতন মুখোটির ছেলে ব্রিগেডিয়ার বিজয়কেতন মুখোটি, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলে। তোমার ওই ছাতাপড়া গয়না অমন অ্যারিস্টোক্রাট বিলেতফেরত ডাকাতরা ছুঁয়েও দেখবে না।

আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে বুধবার। আঁশবটি দিয়ে কচুকাটা করব তোমার পেয়ারের বগলাকান্ত ডাকাতদের।

"মালতীর মা দুটো পান দে। চিবিয়ে নিয়ে ঠাকুরঘরে যাব।" গিন্নিমা দাপাতে দাপাতে বিদায় নিলেন।

বিজয়কেতন হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। নামটাও ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না। কোথায় অমঙ্গলানন্দ, আর কোথায় বগলাকান্ত। কোথায় মহাবলানন্দ, আর কোথায় মহাবলীপুরম। বাপের বাড়িতে কখনো ডাকাত পড়েনি তো, তাই অভিজ্ঞতা নেই। হিংসেয় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

সারাদিন বাড়িতে একটা থমথমে ভাব। বিকেলবেলায় বিজয়কেতন সব কর্মচারীদের ডেকে ছোটোখাটো মিটিং করে নিলেন। কার কী কাজ বুঝিয়ে দিলেন। গুণধরকে ডাকেননি। ওকে আগেই বলে রেখেছিলেন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে নিতে। কাজের লোকদের নির্দেশ দিলেন যে যার ঘরে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নিতে। ডাকাতদের সামনে যাওয়ার দরকার নেই। ডাকাত হল দেবতা। কিছু অনর্থ হলে বিপদ আসতে পারে। দারোয়ানকে বললেন সদরের গেটটা পুরো খুলে রাখতে। গেট বন্ধ দেখলে ডাকাতরা অপমানিত বোধ করতে পারে। বাড়ির সমস্ত আলো জ্বেলে দিতে বললেন। ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদির প্লাগ খুলে রাখতে বললেন, যাতে ডাকাতদের কোনো অসুবিধা না হয়।

ঢং ঢং করে দুটো ঘণ্টা বাজল। মাথায় টুপি আর আলোয়ান গায়ে দিয়ে বারান্দায়

বসে আছেন বিজয়কেতন। সদরের লোহার গেটটা হাট করে খোলা। সারা বাড়ি সুনসান। আর মাত্র কুড়ি মিনিট। তারপরেই মাহেন্দ্রক্ষণ। জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত।

বিজয়কেতন হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। দুটো বেজে আঠারো। আর দু মিনিট। একশো কুড়ি সেকেন্ড মাত্র। সিন্দুকের চাবির গোছাটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে গোল টেবিলটার ওপরে রাখলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু পকেটঘড়ির টিকটিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাইরে একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ডেকে উঠল। ধুপধাপ পায়ের শব্দ কানে এল। বিজয়কেতন উঠে দাঁড়ালেন। দুটো কুড়ি। হঠাৎ পায়ের ওপর ধপাস করে কেউ আছড়ে পড়ল। বিজয়কেতন দেখলেন গুণধর তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। পিসেমশাই, অন্যায় করে ফেলেছি, বুঝতে পারিনি। এবারের মতো মাফ করে দিন। আর কক্ষনো করব না।

বিজয়কেতন দু হাতে গুনোকে তুলে বললেন। মাপ তোকে আমি চিঠিটা পাওয়া মাত্রই করে দিয়েছি। পড়েই বুঝেছি। তোর মতো অপদার্থ গণ্ডমূর্খ ছাড়া এ আর কারোর মাথা থেকে বেরোবে না। দু-লাইন চিঠি লিখতে চোদ্দোটা বানান ভুল। আর চলবি পিসির বুদ্ধিতে? এটুকু তোদের দুজনের কারোর মাথাতেই এল না যে এখনকার যুগে, মানে ইনটারনেট, মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগে চিঠি দিয়ে ডাকাতি হয়? এখন হচ্ছে চেম্বারের যুগ। রগে ঠেকাও, ক্লিক করে ঠুকে দাও। খেল খতম। চিঠি দিয়ে ডাকাতি। ছোঃ, তোর পিসিকে বলে দে যেন আমার সঙ্গে টক্কর দিতে না আসে। আর ওর ফিনফিনে পেতলের গয়নাগুলো যেন আমার সিন্দুকে না রেখে চালের টিনের মধ্যে রেখে দেয়।

এক এক করে বংশী, নিরাপদ, প্রাণকেষ্ট, মালতীর মা, মোহনানন্দ সবাই এসে হাজির। কারোর চোখেমুখে কোনো বিস্ময়ের লেশমাত্র নেই। গিন্নিমা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।

বিজয়কেতন বললেন, আরে বাবা, আমার ওপর ডাকাতি করা কি সহজকথা? তা ছাড়া দরকারই বা কী? দুদিন বাদে আমি চোখ বুজলে সবই তো তোর। তুইও তো আমাদের ছেলে। পুষ্যিপুত্রও তো পুত্র, নাকি? তবে হ্যাঁ, সব থেকে বড়ো ডাকাতি তো আমিই করলাম। ডা-কা-তি মানে জানিস? ডান কানে তিল। আমার ডান কানে তিলটা দেখেছিস? এটার জন্য আর কেউ ডাকাতি করার সাহস পায় না? যাক, রাত শেষ হয়ে এল। হিম পড়ছে। সবাই শুয়ে পড়ো। আর হ্যাঁ মালতীর মা, এককাপ কড়া করে কফি করে আন। আর তোর গিন্নিমার জন্যে দুটো পান।

কালীনারায়ণপুর ব্রিজে একদিন

বীরনগর স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট। ছটা দশে কৃষ্ণনগর থেকে ছেড়েছে। এখন সাতটা। ঠাসাঠাসি ভিড়। গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। গ্রীষ্মকাল। দিন বড়ো হলেও সন্ধে নেমে এসেছে। অবশ্য প্লাটফর্মে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে থাকায় আলোর ঝলমলানিতে বোঝা যাচ্ছে না অন্ধকার নেমেছে কিনা। রোজই ট্রেনটা দাঁড়ায় বীরনগর স্টেশনে একটু বেশি সময়ের জন্য। বড়োজোর মিনিট সাতেক। আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ক্রসিং হয়। রানাঘাটের পর থেকে সিঙ্গাল লাইন। শুধু বীরনগর আর বাদকুল্লা স্টেশনে ডবল লাইন, মানে আপ এবং ডাউন দু'টো লাইন আছে। যে ট্রেনটা আগে পৌঁছায় সেটা দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষা করে অন্য ট্রেনটা আসার জন্য। রেলের নিয়ম 'লাস্ট কাম, ফাস্ট গো'। অর্থাৎ যে ট্রেনটা পরে আসে সেটা আগে ছেড়ে যায়। দু'টো ট্রেনের গার্ড নিজেদের মধ্যে গোলা, মানে একটা লোহার রিং বিনিময় করে ক্রসিং হয়ে যাওয়ার প্রতীক হিসেবে। প্রত্যেকদিনই ডাউন কৃষ্ণনগর লোকাল বীরনগর স্টেশনে আগে পৌঁছায়। আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জার পরে এসে গোলা বিনিময় করে আগে ছেড়ে চলে গেলে ডাউন ট্রেনটা ছাড়ে। সব মিলিয়ে বড়োজোর মিনিট দশেক। রানাঘাট এবং বীরনগরের মাঝখানে একটাই স্টেশন, কালীনারায়ণপুর। সেখানে একটাই লাইন, একটাই প্লাটফর্ম। দু'খানা গাড়ি দাঁড়াবার ব্যবস্থা নেই। কালীনারায়ণপুর স্টেশন ছাড়লেই চূর্ণী নদীর ওপরেই রেলব্রিজ। শুধু ট্রেন যাবার জন্যে ব্রিজটা। নদীতে খেয়া পারাপার করে। ব্রিজের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া বারণ। তবু কিছু অতি সাহসী লোকজন ট্রেনের সময় খেয়াল করে, যখন ট্রেন যাওয়া-আসা করে না তখন হেঁটে ব্রিজ পার হয়। সিগন্যাল লাল থাকলে তবেই আসা যাওয়া করে।

ট্রেনের ভিতর প্রচণ্ড গরম। দরদর করে ঘামছি। হাতের রুমালটা ভিজে জবজবে। তবু ভাগ্য ভালো থাকায় আজ জানলার ধারে সিট পেয়েছি। বহুদিন পরে কৃষ্ণনগরে এলাম। অথচ আগে এসব জায়গায় আমার ঘর-বাড়ি ছিল। আমার জন্ম রানাঘাটে। পড়তাম কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে। মনে পড়ে গেল কৈশোরের দিনগুলোর কথা।

নদীর ধারে ইস্কুল। তার পাশে খেয়াঘাটা, ঘাটের ধারে শিবমন্দির। তার পাশে ঈশ্বরকাকার ছোটো চায়ের দোকান। সামনে বাঁশের খুঁটি পেতে বেঞ্চি। মাস্টারমশাইরা টিফিনের সময় চা খেতে আসতেন। কাচের বয়ামে লেড়ো বিস্কুট, পানকেক, বাদামচাক এবং নানা ধরনের বেকারির বিস্কুট। আমার প্রাণের বন্ধু ছিল বারিন। ছায়ার মতো দুজনে ঘুরতাম। আমরা খুবই গরিব ছিলাম। আমাদের থেকেও গরিব ছিল বারিনদের পরিবার। বারিন লেখাপড়ায় ভীষণ ভালো ছিল। ছোটোখাটো চেহারা, মাথাভর্তি উসকোখুসকো চুল। মুখে মালিন্যের ছাপ। কিন্তু চোখদুটো ছিল ভারী উজ্জ্বল। ওর চোখ যেন কথা বলত। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলেজেও আমরা একসঙ্গে। পলিটক্যাল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে বি. এ পাশও করেছি। সে অনেক বছর আগের কথা। দেখতে দেখতে পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে। এম. এ পাশ করে আমি ব্যাংকের চাকরি নিয়ে চলে গেলাম অনেক দূরে রাজস্থানে। আমাদের রানাঘাটের বাসও উঠে গিয়েছিল সেই সময় থেকে। বাবা বাড়ি বিক্রি করে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে এলেন। বারিনের সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আর দেখা হয়নি। প্রথম দু-একবছর চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। কুড়ি বছর বাইরে বাইরে অন্য রাজ্যে কাটিয়ে যখন আমি ব্যাংকের এগ্‌জিকিউটিভ হয়ে কলকাতায় এলাম তখন খোঁজ করার চেষ্টা করেছিলাম। খোঁজ পাইনি। লোকমুখে শুনেছিলাম কী একটা ঝামেলায় অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হয়ে কয়েকমাস জেলও খেটেছিল বারিন। তারপর কোথায় যে চলে গেল কে জানে। অনেক চেষ্টা করেও কোনো খোঁজ আমি পাইনি। স্কুলকলেজে বারিনের সাহিত্যের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। চমৎকার লেখার হাত ছিল। ভীষণ ভালো ছড়া লিখত। ওর স্বপ্ন ছিল নামী লেখক হবে। ঘরে ঘরে ওর গল্প ছড়ার বই লোকে পড়বে। নামী দামি পত্রপত্রিকায় ওর লেখা ছাপা হবে। বিখ্যাত আবৃত্তিশিল্পীরা ওর কবিতা আবৃত্তি করবে। আমিও ওকে খুব উৎসাহ দিতাম।

ট্রেনটা হঠাৎ চলতে শুরু করল। কোনো হুইস্‌লও দেয়নি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অনেক যাত্রী প্ল্যাটফর্মে নেমে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছিল অসহনীয় গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য। ছাত্রজীবনের দিনগুলোর মধ্যে, বারিনের স্মৃতির মধ্যে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলাম যে কখন আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জার এসে আবার ছেড়ে চলে গেছে টেরও পাইনি। আমাদের ট্রেনটা ছেড়ে দিতেই একটা শোরগোল শোনা গেল। গরমের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যেসব ডেলি প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করছিল,

চা খাচ্ছিল, তারাও ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গেটের হ্যান্ডেল ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—'দাদা, সরুন, সরুন। গেটটা ছেড়ে দাঁড়ান।'

—'আরে ভাই, হাঁ করে দেখছটা কী? গেটের মুখ থেকে ঝুড়িগুলো সরাও তো। দেব ফেলে লাইনে, তখন বুঝবে। ভেন্ডার কামরায় যেতে পার না?'

জানলা দিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে দেখছিলাম রানিং ট্রেনে কেমন সব উঠে পড়ল। সবই অভ্যেসের ব্যাপার। ডেলি প্যাসেঞ্জার বলেই হয়তো সম্ভব।

একজন হকার আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে এসে বীরনগরে নেমে আবার আমাদের ট্রেনটাতে উঠেছে। ওরা বোধহয় এরকমই হবে। হকারদের এরিয়া ডিমার্কেশন করা আছে বলে শুনেছি। এই হকারটার এরিয়া হয়তো রানাঘাট থেকে বীরনগরের মধ্যেকার স্টেশন। লোকটা আমার কামরায় উঠতেই একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার জিজ্ঞেস করল, 'লালগোলা প্যাসেঞ্জার কোথায় আটকে ছিল ভাই?'

মুখের মধ্যে একরাশ বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে তুলে লোকটা বলল, 'আর বলেন কেন, মানুষের আক্কেল-বুদ্ধি কমে যাচ্ছে দিন দিন। দু'জন উটকো লোক, বয়সের গাছ পাথর নেই, বিরিজের ওপর দে' হেঁটে আসছিল। সিংগেল যে সব্‌জে হয়ে আছে সেদিকে খ্যাল নেই। আপনভোলা হয়ে গপ্পো করতে করতে আসছিল। ডাউন শান্তিপুর লোকাল কালীনারায়ণপুর স্টেশন যখন ছেড়েছে, লোকদুটো তখন বিরিজের মাঝমধ্যিখানে।'

—'কাটা পড়েছে?' একসঙ্গে তিন চারজন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

একজন বলল, কত বয়স হবে? বাচ্চা না বুড়ো?' কেউ বলল—'জলে ঝাঁপ দিতে পারল না?'

আমি অন্যমনস্কভাবে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখছিলাম। কত বদলে গেছে চারদিক এই পঁয়ত্রিশ বছরে। যখন কলেজে পড়তাম কত গ্রাম গ্রাম ছিল এসব জায়গা। পাকা বাড়ি একখানাও ছিল বলে মনে করতে পারছিলাম না। শুধু সবুজ ধানখেত আর মাঝে মাঝে এক আধখানা চালাঘর। দু'চারটে খেত বাদে বাদে একটা করে শ্যালো পাম্প। চাষিরা ভাগ করে চাষের জমিতে জল দিত। কত রকম পাখি বসে থাকত ইলেকট্রিকের তারে। দূরে দূরে ইতস্তত গ্রাম, চালাবাড়ি আর তাল খেজুরের সারি। কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে আমাদের কলেজ অনেক দূর। বাসের ভাড়া ছিল তেরো পয়সা। এই বাসভাড়াটুকু আমাদের কাছে ছিল মহামূল্যবান। সেটা বাঁচাবার জন্য আমি আর

বারিন ট্রেন লাইন ধরে ধরে হেঁটে কলেজে যেতাম। সময়ের অভাব ছিল না। চল্লিশ মিনিটের মতো লাগত। বিপ্রদাস পলিটেকনিকের পাশ দিয়ে চার্চের পেছন দিয়ে আমরা লাইনের পাথর নিয়ে ইলেকট্রিকের পোস্টে মারতাম টিপ পরীক্ষা করার জন্য। ধাতব পোস্টে ধাক্কা খেয়ে পাথরগুলো নিউটনের কথামতো দ্বিগুণ গতিতে ছিটকে যেত। একেকদিন বিকেলে ফেরার সময় আমরা পাঁচ পয়সা দিয়ে কাঁচা টমেটো, কখনও শাঁকালু বা কাঁচামিঠে আম, সঙ্গে ফ্রি নুন কিনে প্যান্টের পকেটে রেখে খেতে খেতে চলে আসতাম। কত মজার মজার গল্প হত আমাদের মধ্যে। এখন এসব মনে হলে হাসি পায়।

হকারটার কথা কানে যেতেই চমকে উঠলাম। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল সেদিনটার কথা। আটত্রিশ বছর আগের কথা। কত স্মৃতিই তো ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু এই ঘটনার কথা আমি কখনও ভুলতে পারছি না। অলৌকিক বলে যে কিছু হয় সেটা এখন স্বীকার করি না, তখন করতাম। সেদিন বারিন নিজের জীবন বিপন্ন করেও আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। না হলে এই আমি আর পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করার জন্যে বেঁচে থাকতাম না। ভীষণভাবে বারিনের কথা মনে পড়ল। ওর চোখদুটো আমার সমস্ত চেতনাকে নাড়িয়ে দিল।

দিনটা ছিল রবিবার। সকাল ন'টা নাগাদ বারিন এল আমাদের বাড়িতে। বলল, 'চল অপু, সুমনের কাছে যাই। ওর কাছে পি. এন. বি.-র দেওয়া ইনটারন্যাশনাল পলিটিক্সের কিছু নোটস আছে, টুকে নিয়ে আসি।' তখন জেরক্স মেশিনের চল হয়নি। সব কিছু হাতেই কপি করতে হত।

আমাদের বাড়ি থেকে কালীনারায়ণপুর দু'ভাবে যাওয়া যেত। এক আমাদের বাড়ির সামনের খেয়াঘাট বেরিয়ে সন্ন্যাসী বাগান হয়ে, আর একটা সাইকেলে হিজুলি হয়ে রেলব্রিজের এপারে শ্যামলের দোকানে সাইকেল রেখে খেয়ানৌকা পার হয়ে কালীনারায়ণপুরে সুমনদের বাড়ি।

বারিন বলল, 'তুইও সাইকেল নে। আমাদের বাড়িতে অনেক পাকা কুল হয়েছে, মা তোর জন্যে পেড়ে রেখেছে। ওগুলো নিয়ে সাইকেল রেখে খেয়া পেরিয়ে যাব। আমি রাজি হয়ে গেলাম পাকা কুলের লোভে। মাকে বললাম বারিনদের বাড়ি থেকে আসছি। আমি সাঁতার জানতাম না বলে মা কখনো নদী পেরোতে দিত না। খেয়া নৌকায় যাব বললে তক্ষুনি নাকচ হয়ে যেত।

দুজনে দুটো সাইকেল নিয়ে যখন কালীনারায়ণপুর খেয়াঘাটে পৌঁছলাম তখন সকাল এগারোটা। কলেজে পড়লেও এখনকার কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মতো অত স্বাধীনতা ছিল না, বিশেষ করে মফস্‌সলে। খেয়াঘাটে বারিন সাইকেল রাখত ওখানকার একমাত্র দোকানে। দোকানটা বন্ধ। বারিন বলল, 'চল অপু, সাইকেল নিয়ে নৌকায় উঠি।'

আমার ভীষণ ভয় করল। বললাম, 'নারে, এমনিতে নৌকায় উঠেছি জানলে মা বকবে, তার ওপর সাইকেল? আমি যাব না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকি বরং, তুই চট করে গিয়ে সুমনের কাছ থেকে নোটসগুলো নিয়ে আয়। আমি কপি করে দেব। কাল কলেজে ওকে দিয়ে দেব।

বারিন খুব সাহসী। তার ওপর ভালো সাঁতার কাটতে পারে। সে জায়গায় জলে আমি পাথর। কেন যে মা ছোটোবেলা থেকে জলের কাছে যেতে বারণ করত কে জানে। ফলে সাঁতারটাই শেখা হল না। বারিন বলল, 'তুই একটা আস্ত ভিতুরাম। ভিতুর ডিম কোথাকার।। চল, তার চেয়ে বরং ব্রিজ দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাই।'

ব্রিজ দিয়ে যাওয়ার কথায় আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'না-না, আমি ওসব পারব না। আমার ভয় করে। ব্রিজটা যা সরু। দু'পাশে এক ফুট করে জায়গাও নেই। তার ওপরে লাইনের মাঝখানে পাতা টিনগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। নীচে তাকালে জল দেখা যায়।

বারিন বলল, 'তুই কাঠের স্লিপারগুলোর ওপর পা ফেলে ফেলে যা। এইটুকুন তো ব্রিজ, হুস করে চলে যাবি দেখিস। অকারণে ভয় পেলে কাজ পণ্ড হয়।'

আমার ভয় তবু যাচ্ছে না। বললাম, 'যদি ট্রেন এসে যায় উলটোদিক থেকে।'

ও বলল, 'এখন কোনো ট্রেন নেই। এগারোটা পঞ্চান্নর কৃষ্ণনগর লোকাল চলে গেছে। এর পরে সাড়ে বারোটার শান্তিপুর। নে চল, ওপরে ওঠ।'

আমরা ব্রিজের সিকিভাগ দিয়েছি কী যাইনি, বারিন চিৎকার করে বলল, 'অপু ট্রেন। কালীনারায়ণপুর প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে দিয়েছে। তার মানে এগারোটা পঞ্চান্নর কৃষ্ণনগর লোকাল যায়নি। লেট করেছে। তুই তাড়াতাড়ি সামনের থাম্বাটার ওপরে গিয়ে বসে পড়। ট্রেনের দিকে তাকাস না। ভয় পাবি না।'

আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করে বললাম, 'তুই কী করবি?'

ট্রেনটা তখন আমাদের থেকে তিরিশ-বত্রিশ ফুট দূরে। সবে প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়েছে বলে স্পিড খুব বেশি নেই। ড্রাইভার আগে দেখেনি। এখন চোখে পড়তেই জোরে হর্ন দিল। হয়তো গতি কমানোর চেষ্টা করল। বোঝার মতো অবস্থায় ছিলাম না আমি।

-'অপু, শিগগির পালা। লাফ মার থাম্বাটার ওপরে। সাইকেল নিতে না পারলে ছেড়ে দে। যা হয় হবে।' আমার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। কে যেন আমার শরীরে বল আর মনে সাহস দিল। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে সাইকেল দু'হাতে তুলে পিলারটার ওপরে লাফিয়ে চোখ বুজে বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে ট্রেনটা চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। বারিনের কী হল জানতে পারলাম না। আমি 'মা-গো' বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম।

ট্রেনটা চলে যেতেই দেখলাম বারিন দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে। ব্রিজের রেলিঙের পাশে এক চিলতে কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে। সাইকেলটা ব্রিজের রেলিঙে ঠেসান দিয়ে রাখা আছে।

'তুই ঠিক আছিস তো অপু? কিছু হয়নি তো?'

আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। সামনে তাকিয়ে দেখলাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য।

'মুখে দিলে মজা, দেবুর ছানার গজা। এক টাকা পিস, বারোটা দশ টাকা।' দেব নাকি স্যার? বাক্স আছে। বাড়ির জন্য.....।'

ঝমঝম শব্দে চমকে উঠলাম। ট্রেনটা কালীনারায়ণপুর ব্রিজ পার হচ্ছে। একই রকম আছে। নীচে নদীতে খেয়া নৌকা চলছে। পিলারের ওপর দুজন লোক পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আমি অধীর দৃষ্টিতে বারিনকে খুঁজতে লাগলাম।

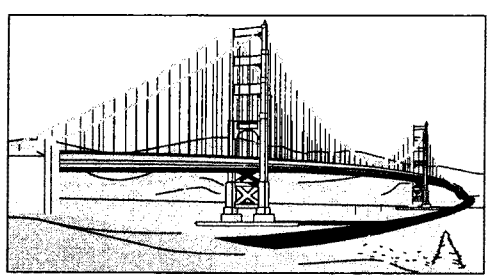

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে

আচমকা পেছন থেকে ডাকটা একদম পছন্দ নয় সুশীতলবাবুর। বিশেষ করে কোনো শুভ কাজে বেরোবার সময় তো কখনোই নয়। নামের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো সামঞ্জস্যই নেই তাঁর। এমনিতে চাল-চলনে, আচার-আচরণে স্বভাবগতিতে মোটামুটি নরম-সরম ভাব থাকলেও পেছনে কেউ ডাকলেই তাঁর মেজাজটা আর সুশীতল থাকে না; অসম্ভব কুপিত হয়ে পড়েন। যেমন হলেন আজকে, এই খানিক আগে।

সকাল সকাল উঠে স্নান-ফান সেরে ছাদে গিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং' বললেন। তারপর কাচা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে চুল আঁচড়ে বগলে ছাতা নিয়ে বেরোলেন। বারান্দায় থেকে গিন্নি 'দুগ্গা দুগ্গা' বললেন। গলায় আঁচল জড়িয়ে জোড়হাত কপালে ঠেকালেন। চৌকাঠ পেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছেন কী দেননি, পেছন থেকে কর্কশ গলার আওয়াজ—"সুশ্‌তলদা, ও সুশ্‌তলদা, কোথায় চল্লেন সাতসকালে?"

কোনো উত্তর নেই। দেবার প্রয়োজনও মনে করলেন না। চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন। রতন পাকড়াশীর কয়লার গোলার কাছে আসতেই আবার সেই হেঁড়ে গলা—"ও সুশ্‌তলদা, বলি এত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছেন? কীসের এত তাড়া? পালের দোকানের এক ভাঁড় চা খেয়ে গেলে হত না?"

সুশীতলবাবু অনেকক্ষণ ধরেই শুনে আসছিলেন। পেছনে না তাকিয়েই গলার আওয়াজ আর কথা বলার ধরন দেখে বুঝে নিয়েছিলেন লোকটা আর কেউ নয়, সামনের বাড়ির নিকামায়ে আশুতোষ চক্কোত্তি। দেখলে পিত্তি চটকে যায়। সাত জন্মে কথা বলেন না তার সঙ্গে। অথচ লোকটা সকলের সব কিছুর মধ্যে থাকে। চাঁদিফাটা রোদ্দুরে ক্লান্ত গলদঘর্ম হয়ে দুহাতে দুটো ভারী ব্যাগ নিয়ে বাজার থেকে ফিরছি, বেচু সিকদারের তেলেভাজার দোকানের বেঞ্চিটা থেকে ভেসে এল—"সুশ্‌তলদা, কটা বাজে দেখুন তো।". ভাবুন অবস্থাটা। পিত্তি চটকে যায় কিনা বলুন। দেখছে দুহাতে দুখানা দশ কেজির ব্যাগ, ঘাড় বেঁকে যাচ্ছে, তার মধ্যে বাবুকে টাইম বলতে হবে। এ কী হাওড়া স্টেশনের সামনে দিয়ে যাচ্ছি নাকি যে বড়ো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় বলা যাবে?

কিংবা ধরুন আপনি টালিগঞ্জে অটোর লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, সামনে পঞ্চাশজন লোক। লাল-হলুদ ছোপলাগা দাঁত নিয়ে একগাল হেসে আপনার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল—"ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছেন তো? ইংল্যান্ড, জার্মানি যতই তড়পাক, ব্রাজিলকে বিট করতে পারবে না, বলুন। রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, কার্লোস, কাফুদের চটকই আলাদা, বলুন। শিল্পী, বলুন।"

কেউ এমন করলে পিত্তি চটকায় কিনা। মাঝে মাঝে মনে হয়, দিই ওর নাকে একটা ঘুঁষি বসিয়ে। সব প্রশ্নের মধ্যে একটা "বলুন" জুড়ে দেবে। আরে বাবা, আমি কি তোর ইয়ার দোস্ত, না তুই আমার দাবা খেলার পার্টনার, যে সব কথা বলতে হবে। ভালো করে কথা বলতে পারে না। জীবনে কখনো 'সুশীতল' বলতে পারল না। স্ স্ করে 'সুশ্তল' বলে। দেব একদিন কুকুরটাকে লেলিয়ে। হাড়ে হাড়ে টের পাবে। পালাবার পথ পাবে না।

আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে হেঁটে যাচ্ছেন সুশীতলবাবু। বেশ বুঝতে পারছেন আশুতোষ চক্কোত্তি তাঁর তিন ফুটের মধ্যে এসে গেছে। হাওয়াই চপ্পলের ফ্যাট্ ফ্যাট্ আওয়াজ কানে আসছে। বিরক্তিকর লাগছে। জুতো ঘেষটে ঘেষটে চলা একেবারে পছন্দ করেন না তিনি। মনে মনে ওর মুণ্ডপাত করে ছাড়ছেন। একবার ভাবলেন দাঁড়িয়ে দু'কথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু ওর মতো অসভ্য বর্বর আহাম্মকের সঙ্গে বাক্যবিনিময় দূরের কথা, মুখদর্শন করতে ইচ্ছে করে না। তার ওপর একটা শুভকাজে বেরোচ্ছেন। চিঠিখানা আজকে ডাকে না দিলেই নয়। অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে মেয়ের জন্যে একটা সত্যিকারের ভালো পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন বক্স নম্বর দিয়ে। তেত্রিশখানা চিঠি এসেছে। তার থেকে বেছেবুছে মনের মতো একটা পাত্র ঠিক করেছেন। সবদিক থেকে ভালো। ইঞ্জিনিয়ার। মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিতে মোটা মাইনের চাকরি করে। বাবা-মার একমাত্র সন্তান। কলকাতায় নিজের বাড়ি। কোনো দাবিদাওয়া নেই। সকালবেলা গৃহদেবতার আশীর্বাদ নিয়ে চলেছেন পোস্ট অফিসে চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলার জন্য।

সুশীতলবাবু মানুষটা কারোর সাতে পাঁচে থাকেন না। মানে থাকতে চান না। পাড়াতেও কারোর সঙ্গে কস্মিনকালেও মেশেন না। বাড়ি আর অফিস, অফিস আর বাড়ি করে কাটিয়ে দিয়েছেন এতটা কাল। অবশ্য এ পাড়ায় উনি বেশিদিন যে এসেছেন তাও নয়। পাশের পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে অনেককাল ছিলেন। চাকরি করতেন ব্যাংকে।

অফিসারও হয়েছিলেন। নানা জায়গায় বদলি হয়েছেন। তবে পরিবার নিয়ে কখনো যাননি। মেয়ের পড়াশোনার জন্য ওদের নিতেন না। একা একাই হাত পুড়িয়ে খেয়েছেন। বছর দুয়েক হল এ পাড়ায় জমি কিনে বাড়ি করেছেন। মাস দুয়েক আগে রিটায়ারও করেছেন। ফলে পাড়ার লোকের সঙ্গে ওর স্ত্রী-কন্যার যা মেলামেশা বা পরিচয় তার কণামাত্রও ওঁর নেই। তাছাড়া সুশীতল সান্যাল লোকটা বেশ আপনভোলা। কোনো কিছুই ভালো করে খেয়াল করেন না। অনেকটা হাতে চশমা নিয়ে বাড়িময় তোলপাড় করে চশমা খুঁজে বেড়ানোর মতো। আগে নাকি বেশ ভুলো ছিলেন। বাজারের থলে হাতে বেরিয়ে বাজার ভুলে গিয়ে বন্ধুর বাড়িতে দাবা খেলে দু'ঘন্টা বাদে খালি ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ফিরে গিন্নির মুখনাড়া খেয়েছেন। একবার তো সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসেছিলেন। নিকট আত্মীয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়ে আর একটা বিয়েবাড়িতে এক ভরি সোনার হার উপহার দিয়ে পেটপুরে খেয়ে এসেছিলেন। কী কারণে সেদিন তাঁর বউ-মেয়ে যেতে পারেননি। বাড়ি ফিরতেই গিন্নি আর মেয়ে যখন জিজ্ঞেস করেছিল যে বিয়েবাড়ি গিয়ে বাড়ির আত্মীয়স্বজন, কাউকে দেখলে না, এমনকি যার বিয়ে, মানে আমাদের মেয়ে মলিকেও চিনতে পারলে না, তখন মুখটা কাঁচুমাচু করে বলেছিলেন— "একদম খেয়াল করিনি।" কতদিন অফিস যাবার সময় খালি পায়েই বেরিয়ে পড়তেন। যখন পায়ে কিছু ফুটত বা ভিড় বাসে কেউ পা মাড়িয়ে দিত তখন খেয়াল হত। এছাড়া ভুল ট্রেনে ওঠা, ভুল বাসে চড়া, জামাকাপড় ইস্ত্রি করাতে নিয়ে গিয়ে টেলারিংএর দোকানে দিয়ে দেওয়া এ তো তাঁর রোজকারের ঘটনা ছিল। একবার তো টেলিফোন অপিসের ড্রপ বক্সে ইলেকট্রিক বিল আর চেক ফেলে চলে এসেছিলেন। সাপ্লাই থেকে লাইন কেটে দিতে ব্যাংকের পাশবুক দেখে তাঁর খেয়াল হয়েছিল। সাংসারিক কাজে বারংবার ভুল করলেও অফিসের কাজে কখনো ভুল করতেন না। নিখুঁত। পারফেক্ট। ব্যাংক অফিসারের দায়িত্বপূর্ণ কাজ ঠিকভাবেই সামলেছেন। তবে জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা করেছিলেন বাড়ি করার সময়। অফিসের সহকর্মীর সঙ্গে পাশাপাশি দুটো প্লট কিনেছিলেন। ভিত পুজোর দিন সহকর্মীর প্লটে ঘটা করে ভিতপুজো করেছিলেন। শেষে সেদিন কী ভাগ্যিস সময়মতো সহকর্মী বন্ধুটি এসে পড়েছিলেন তাই বাঁচোয়া। তারপর থেকে নাক-কান মলেছেন। ইদানীং আর বিশেষ ভুলটুল করেন না। সবসময় সাবধানে কাজ করেন। তা ছাড়া মেয়ে, বউ একেবারে গোয়েন্দার মতো চোখেচোখে রাখে।

নকড়ি হালদারের গমকলের কাছে আসতেই আশুতোষ চক্কোত্তি লাফ মেরে সামনে এসে দাঁড়াল। এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করল—"দাদা কি আমার ওপর রাগ করেছেন? আচ্ছা, কথায় কথায় রাগ করলে চলে, বলুন। কালকে সহবাগের ব্যাটিংটা দেখলেন তো। কী খেলা না খেলল, বলুন। ইন্ডিয়ার কেউ একজন প্রথম লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি করল ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে। ফারুক ইঞ্জিনিয়ার লাঞ্চের আগে নাইনটি ফোর করেছিল। সহবাগের ক্যালি আছে, বলুন। ইন্ডিয়ার ওনলি ট্রিপ্‌ল সেঞ্চুরিয়ান।"

সুশীতল সান্যাল আর সুশীতল থাকতে পারছেন না। মাথার ভেতরটা গরমে ফুটছে। রগের কাছটা দপদপ করছে। দাঁতে দাঁত চেপে আছেন। সত্যি বলতে লোকটাকে এত কাছ থেকে এই প্রথম দেখলেন। একবার ভাবলেন লোকটাকে এমন শিক্ষা দেবেন যেন জীবনে আর কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে না আসে। অনেক কষ্টে রাগ সংবরণ করলেন।

"পোস্টাপিসে যাচ্ছেন? চিঠি পোস্ট করবেন? আর্জেন্ট লেখা রয়েছে দেখছি। পোস্টাপিসের কথা আর বলবেন না। কোনো দায়দায়িত্ব নেই, বলুন। অথচ আগে কী ছিল, বলুন। লিখতে না লিখতেই পৌঁছে যেত। আর এখন? এইজন্যেই তো কুরি...."

পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে খামটা হাতে নিয়ে পাশ-পকেটে রাখলেন। লোকটার যা স্বভাব হট করে না জিজ্ঞেস করে বসে কার চিঠি, কীসের চিঠি, কাকে লিখেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কুনজর না লেগে যায়। শুভকাজ বলে কথা। অবশ্য এর মধ্যেই লেগে গেছে কিনা কে বলতে পারে। পকেটের ভেতর থেকেই চিঠিটা ছুঁয়ে কপালে হাত ঠেকালেন।

"বিয়ে-থার ব্যাপার বুঝি? কার? কন্যার? আপনার তো একটিই সন্তান, তাই না সান্যালমশাই? তা, ঠিকই করেছেন। সময়মতো বিয়ে-থা দিয়ে দেওয়াই ভালো, বলুন। বুঝলেন কিনা সান্যালমশাই, আমারও একটিই সন্তান। ভাবছি এবার ছেলেটারও বিয়ের বন্দোবস্ত করব। দু-একটা খোঁজখবর পেয়েছি। ঝামেলা মিটিয়ে দেওয়াই ভালো, বলুন। বলছেন না কেন?"

সুশীতলবাবু আর মেজাজ আয়ত্তে রাখতে পারলেন না। অনেকক্ষণ ধরে 'বলুন বলুন' শুনে ধৈর্যের পাঁচিল ভেঙে গেছে। বিরক্তি প্রকাশ না করেই ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন—"কী বারবার 'বলুন বলুন' করছেন। কী বলতে হবে বলুন। আপনার সঙ্গে আমার পিরিতের কারণ কিছু আছে? বলুন।"

আশুতোষ চক্কোত্তির মুখের হাসিটা কিন্তু অকপট। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতে ছোপ ধরে গেলেও হাসবার সময় গাল ছড়িয়ে হাসেন। মুখের মধ্যে কোনোরকম বিরক্তি বা শয়তানি-ভণ্ডামির চিহ্নমাত্র থাকে না। গদগদ হয়ে একগাল হাসি নিয়ে বললেন—"আপনিও তো প্রত্যেক কথার শেষে একটা 'বলুন' লাগাচ্ছেন। আর আমি 'বলুন' বললে আপনি রেগে যাচ্ছেন। আচ্ছা বলুন, কথার শেষে এই যে 'বলুন' বলার অভ্যাস এটা কি খারাপ? বলুন। শুনতে বেশ ভাল্লাগে না, বলুন। কেমন একটা অ্যাকসেন্ট, মানে অনেকটা দলবৃত্ত ছন্দের মতো একটা শ্বাসাঘাত লাগে, না? বলুন। যাক্‌গে ওসব কথা ছাড়ুন। বলুন তো সুশ্‌তলদা, সোনার দামটা যে সেনসেক্স-এর মতো হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে এটা কেমন কথা। ছেলেটার বিয়ের যোগাযোগ করছি। কিছু যদি একটা লেগে যায় তখন কী হবে বলুন। রিটায়ার করেছি। তার ওপর একটা বাড়িও....।"

সুশীতলবাবুর আর শুনতে ভালো লাগছিল না। শুভকাজে দেরি হলে বা বাগড়া পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়। চক্কোত্তিমশাইকে দুটো ঠান্ডাগরম কথা শোনাবার ইচ্ছেটাকেও কাজে লাগাতে পারছেন না। লোকটাকে দূর থেকে দেখেছেন বা কণ্ঠস্বর শুনেছেন আগে অনেকবার। কিন্তু একেবারে সামনে, মানে করমর্দন দূরত্বে, যাকে বলে রেঞ্জের মধ্যে এই প্রথম পেলেন। রাগ চেপে রেখে বললেন—"আপনি মশাই বেশ নাছোড়বান্দা দেখছি। দেখছেন তাড়া আছে। জরুরি কাজে যাচ্ছি। পথ আগলে খোশগপ্পো শুরু করলেন। অন্য অনেক লোক তো রয়েছে, তাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলুন না। আমাকে ছেড়ে দিন। দরকারি কাজ রয়েছে।"

আশুতোষ চক্কোত্তি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েন আর কী। মিনিট দুয়েক ধরে ঘাড় এপাশ ওপাশ করে হেসে নিয়ে মোলায়েম করে বললেন—"বটেই তো, বটেই তো। দোষ তো আমারই। আপনাকে খামোকা আটকে রাখলাম। উচিত কাজ হয়নি, বলুন। নিশ্চয় পোস্টাপিসে যাচ্ছিলেন চিঠি ডাকবাক্সে ফেলতে। বুকের কুলুঙ্গিতে উঁকি মারছিল, দেখেছি। তবে পাশ-পকেটে রাখার দরকার ছিল না। বুঝতে পারছিলাম বিয়ে-থার ব্যাপার। কোণায় হলুদের টিপ দেখেই ধরেছি। বেশ করেছেন। যান, আপনাকে আর আটকাব না। আমার মেয়ে না থাকলেও ছেলের বিয়ের সম্পর্ক করতে গিয়ে টের পেলাম কন্যাদায় কী জিনিস। মেয়ের বাপেদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কোনো পরিমাপ হয়

না, বলুন। চুপ করে থাকবেন না। বলুন হয় কিনা। হয় না, হয় না সান্যালমশাই। আমি জানি, হয় না।"

সুশীতলবাবু আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছেন। এই লোকটার সম্বন্ধে কত কিছু ভেবে বসে আছেন। মনে মনে কত গালাগাল দিয়েছেন। অথচ একবারও তাঁর মনে এল না লোকটা কত কিছু জানে। ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল, রোনাল্ডো-রোনাল্ডিনহো-কার্লোস-কাফুদের নাম, সোনার দাম, সেনসেক্স, সহবাগের ব্যাটিং, লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি মিস করা, ট্রিপল্ সেঞ্চুরি, এমনকি দলবৃত্ত ছন্দ অব্দি অকপটে উগরে দিচ্ছে। লোকটা নিশ্চয় শিক্ষিতই হবে।

কিছুটা আপশোশের ভঙ্গিতে বললেন—"আপনি তো রাস্তার উলটো দিকের বাড়িটাতেই থাকেন, তাই না?"

আশুতোষ চক্কোত্তি এবার জোরে না হেসে ঠোঁটে হাসলেন। ভাবটা যেন—কী! দিলাম তো তোমার মাথা থেকে রাগের পাহাড়টা নামিয়ে। মোলায়েম করে বললেন—"আজ্ঞে না, সান্যালমশাই। আমি এপাড়া ছেড়ে গেছি বছর দুয়েক আগে। মানে আপনি বাড়ি করলেন, আর আমিও চলে গেলাম। নর্থ ক্যালকাটায় আমার ছেলে বাড়ি করেছে। জমিটা অবশ্য পৈতৃক। তবে ভিতপুজোটা ঠিক নিজের জমিতেই করেছিল।"

সুশীতলবাবু লজ্জা পেলেন। মনে মনে ভাবলেন লোকটাকে এতদিন নিকামায়ে অসভ্য বর্বর আহাম্মক কত কিছুই না ভেবেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে পুরোটাই উলটো। বরং লোকটা কর্মঠ, জ্ঞানী, সামাজিক, মিশুকে এবং সর্বোপরি শিক্ষিত। সাধারণত হেসে কথা বলার অভ্যেস না থাকলেও মুখে চেষ্টিত হাসি ফুটিয়ে বললেন—"প্রায়ই আপনাকে এ পাড়ায় পথে-ঘাটে-বাজারে দূর থেকে দেখি, এমনকি ওই হলুদরঙা বাড়িটায় ঢুকতে বেরোতে দেখি বলে ভাবতাম ওখানেই আপনি থাকেন।"

পকেট থেকে পানের ডিবে বের করে একটা পান গালে দিয়ে ডিবেটা এগিয়ে বললেন—"চলবে?"

"আজ্ঞে না। ধন্যবাদ।"

"বুঝলেন কিনা সান্যালমশাই, এ পাড়াটাকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছি। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আপনি তো দু'বছর এসেছেন। পাড়ার খবর-টবর বিশেষ রাখেন না। ওই বাড়িটা আমার এক বন্ধুর। একটা বিশেষ কাজে আমাকে মাঝেমধ্যেই আসতে

হয়। তা ছাড়া এখানে আমার অনেক মানুষের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক। তাই দূরে চলে গেলেও সপ্তাহে দু-তিনদিন আসতেই হয়। আশ্চর্য হলেন? বলুন।"

মুখে কিছু না বললেও, সুশীতলবাবু এবার সত্যিই আশ্চর্য হলেন। মানুষকে ওপর থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। চক্কোত্তিমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি এখন কী করেন? মানে চাকরিবাকরি?"

"ও কিছু না। ও কিছু না। এখন কিস্যু কাজের কাজ করি না, সব অকাজের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছি। আগে একটু আধটু মাস্টারি করার চেষ্টা করতাম। এখন তাও করি না। যাক গে, আপনাকে আর আটকাব না। অনেক সময় নষ্ট করলাম। ও হ্যাঁ, যে কথাটা বলবার জন্য আপনাকে ডাকছিলাম। আমার আর হয়তো এদিকে ঘন ঘন আসা হবে না। আমি নর্থ ক্যালকাটায় থাকি। ওদিকে গেলে যাবেন। আশা করছি, র‍্যাদার প্রার্থনা করছি, আপনার যাত্রা শুভ হোক। দেখবেন আবার হয়তো কোনোদিন হুট করে দেখা হয়ে যেতে পারে। বলুন পারে কিনা। পারে পারে। রিলিজিয়নস্ মেশিন মুভ্‌স ইন দি এয়ার। ঠিক কিনা বলুন।"

সুশীতলবাবু চুপ করে আছেন দেখে আবার শুরু করলেন "বুঝলেন না তো? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এবারে বুঝলেন? বলুন। আচ্ছা চলি। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনি যতই আমাকে অ্যাভয়েড করুন আর অপছন্দই করুন, আমি কিন্তু আপনাকে খুব পছন্দ করি। আমার ছেলের জন্যও খোঁজাখুঁজি করছি। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দু-একটা চিঠিও দিয়েছি। তা, যদি লেগে যায় তা হলে কিন্তু নেমন্তন্ন করব। অবশ্যই আসতে হবে সপরিবার। দেখা হবে চলি।"

* * *

সুশীতলবাবুর মনটা আজ সত্যিই বেশ সুশীতল। বারান্দায় বসে হাতের খামটা বারবার নেড়েচেড়ে দেখছেন। মুক্তোর মতো অক্ষরে লেখা সমীরণ সান্যাল, ৭/৩, মোহিনী কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৪। প্রেরকের নামের জায়গায় সংক্ষেপে লেখা শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, বেলগাছিয়া, কলকাতা। মেয়ের ফটো পাঠিয়ে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন, তার উত্তর এসেছে। ছেলে খড়গপুর আই আই টি-র ইঞ্জিনিয়ার। একমাত্র সন্তান। ছেলের বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট ছিলেন। সম্প্রতি রিটায়ার করে

অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য অনেকগুলো স্কুল করে দিয়েছেন। মেয়ের ফটো দেখে তাদের সম্পূর্ণ পছন্দ হয়েছে। ছেলের বাড়িঘরদোর দেখে আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন। পছন্দ হলে ওঁরা মেয়ে দেখতে আসবেন।

মেট্রো রেলে বেলগাছিয়া স্টেশনে নেমে রিকশায় সস্ত্রীক চলেছেন সুশীতলবাবু। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি। হাতে নামী দোকানের মিষ্টির বাক্স। ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ি খুঁজে রিকশা থেকে নামলেন। ঝকঝকে সদ্য রং করা দোতলা বাড়ি। গেটের পাশে পাথরের ফলকে লেখা—অধ্যাপক শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, এম এ, ডি ফিল।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে 'আসুন, আসুন সান্যালমশাই' শুনে চমকে উঠলেন সুশীতলবাবু। ভূত দেখছেন নাকি। কী গেরো। এখানেও সেই আশুতোষ চক্কোত্তি! লোকটা তা হলে ঘটক নাকি! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

"আসুন, ম্যাডাম। অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই।"

সুশীতলবাবু আমতা আমতা করে বললেন—"আপনি এখানে? এটা শম্ভুনাথ চক্রবর্তীর বাড়ি না? উনি আছেন?"

"আরে মশাই, এখনও রাগ করে আছেন মনে হচ্ছে। রাস্তা থেকেই কথা বলবেন নাকি? ভেতরে আসুন। রাগ পুষে রাখলে চলে, বলুন?"

"না, মানে শম্ভুনাথবাবু কি আপনার আত্মীয়, না বন্ধু?"

আর একবার হাসিতে ফেটে পড়লেন আশুতোষ চক্কোত্তি। এ হাসি বড়ো চেনা। কিন্তু একটুও বিরক্তির সঞ্চার হল না সুশীতল সান্যালের মনে। সোফায় বসতে বসতে বললেন, "শম্ভুনাথবাবু আছেন তো?"

"বিলক্ষণ আছেন। সশরীরে আপনার সামনে বসে আছেন। চিমটি কেটে দেখতে পারেন। আমারই নাম শম্ভুনাথ চক্রবর্তী। আশুতোষ আমার ডাক নাম। পোশাকি নাম শম্ভুনাথ। আপনার বাড়ির উল্‌টোদিকের বাড়িটা, যেটাতে আপনি আমাকে ঢুকতে বেরোতে দেখতেন সেটা আসলে একটা অনাথ আশ্রম। স্ট্রিট চাইল্ডদের জন্য একটা সমাজসেবা বলতে পারেন। বসুন, চায়ের কথাটা আগে বলে আসি।"

সুশীতলবাবু আর একবার লজ্জিত হলেন। না জেনে কত বিরূপ ধারণাই না পোষণ করেছিলেন ওঁর সম্বন্ধে। কত বড়ো মাপের মানুষ। উচ্চশিক্ষিত, তার ওপর সমাজসেবী।

এ রকম ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন—"কিছু মনে করবেন না চক্রবর্তীমশাই। না জেনে আপনাকে হয়তো কটূক্তি করে থাকতে পারি। আপনি তো ঘুণাক্ষরেও কখনও বলেননি আপনিই অধ্যাপক শম্ভুনাথ চক্রবর্তী। এরকম হেঁয়ালির কোনো অর্থ আছে, বলুন।"

"দূর মশাই, আপনার সঙ্গে আমার সামনাসামনি কথাই তো হল মাত্র সেদিন। অন্যদিন তো দূর-দর্শন। দূরের থেকে মানুষ বোঝা যায়? চেনা যায়? মানুষ চিনতে হলে তার মনের তলদেশ ছুঁতে হয়। ক'জন আমরা সে চেষ্টা করি বলুন। সেদিন কী আর জানতাম যে আপনি আমারই ঠিকানায় চিঠি পোস্ট করতে যাচ্ছেন। দেখুন তো কী যোগাযোগ। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলুন। আসলে কী জানেন এই গরমে সমীরণ যদি সুশীতল হয় তবে কী ভালো বলুন। সাধ করে কী আর সেদিন বলেছিলাম ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। যাক চা-টা খেয়ে পঞ্জিকা দেখে আচার ব্যবস্থা দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলুন! আপনার মেয়েকে আমি পুত্রবধূ হিসেবে দাবি করছি। এখন নিশ্চয় আর রাগ করবেন না, বলুন।"

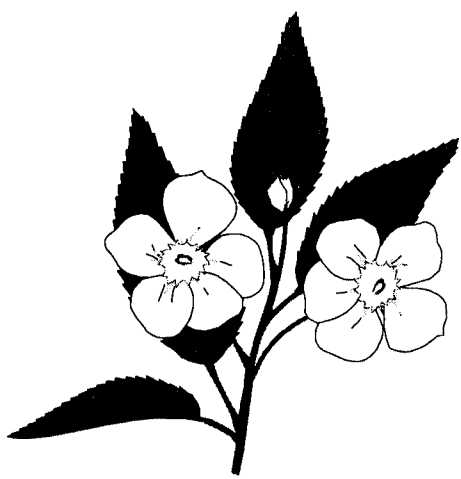

জার্মান স্টিলের ছুরি

রিন্টু, টিংকু, যিশু আর মলি চারজনে হুড়মুড় করে পড়া ফেলে উঠে পড়ল। দোতলার বারান্দা দিয়ে পড়ি কি মরি করে নীচে নামার জন্য দৌড়ল।

টিংকু বলল, "এই দাদা, যাচ্ছি তো, মেজোকাকা 'চাণক্য' দেখতে দেবে তো?"

"কেন দেবে না? আমরা তো পুরো দু' ঘণ্টা পড়েছি।" রিন্টু রাগ রাগ মুখে জবাব দিল।

"হল্ট"।

চারজনেই আচমকা থেমে গেল। পেছনে একবার তাকিয়েই টিংকু বলল, "মরেছে রে, মেজোকাকা।"

"নো টিভি। লাইন দিয়ে দাঁড়াও। উঁহুঁ, ওইভাবে নয়। ফল-ইন করো। বড়ো থেকে ছোটো। ছাব্বিশ জানুয়ারির প্যারেড দ্যাখোনি?"

খুব চটপট চারজনে দাঁড়িয়ে পড়ল। যিশু বয়সে ছোটো হলেও রিন্টুর থেকে লম্বা। তাই ও দাঁড়াল সকলের আগে তারপর রিন্টু। তারপর টিংকু। সবশেষে মলি। রিন্টু আর যিশু একই ক্লাসে পড়ে। ফোরে। টিংকু টু-এ। আর মলি এবার প্রথম স্কুলে যাবে।

"কে নিয়েছে? সত্যি করে বলো। কুইক। না বললে কিন্তু কঠোর শাস্তি হবে।" মেজোকাকার গলার স্বর একটু বাড়ল।

রিন্টু বলল, "আমি তো কিছু নিইনি, মেজোকাকা।"

"তুমি নাওনি তো কী হয়েছে? তোমাদের মধ্যেই কেউ নিয়েছে। শিগগির বলো কে নিয়েছে।"

চারজনের অবস্থাই কাঁদোকাঁদো। চোখ দিয়ে জল বেরোবার উপক্রম। সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

যিশু সাহস করে বলল, "আমরা কেউ নিইনি বাবা। আমরা তো পড়ছিলাম। আমরা দেখিইনি কে নিয়েছে।"

"মিথ্যে কথা বোলো না। টু লাই ইজ আ সিন। জানো না সে-কথা? কেউ না নিলে যাবে কোথায়? এটা কি কর্পূর যে উবে যাবে? সকালবেলাতেও আমি দেখেছি।

মর্নিংওয়াক করে ফিরে এসে রাখলাম টেবিলের ওপর। তোমাদের মধ্যেই কেউ নিয়েছ।"

রিন্টু আর টিংকুর বাবা, মানে যিশু আর মলির জ্যাঠামশাই, ঘর থেকেই বলে উঠলেন "কেন মিছিমিছি বাচ্চাগুলোকে বকছিস দিপু? ওদের আটকাস না, ছেড়ে দে।"

"তুমি বুঝতে পারছ না দাদা, জলজ্যান্ত জিনিসটা টেবিল থেকে উধাও হয়ে যাবে। ওরা না নিলে কে নেবে বলো তো? ওপরে তো বাইরের লোক কেউ আসেনি।"

"কী হারিয়েছে তোর সেটাই তো বলিসনি। তা ওরা বলবে কী করে।"

"ও বলিনি বুঝি। আই অ্যাম সরি!" মেজোকাকার গলার স্বর নরম হতে দেখে রিন্টু একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, ও বেশ বুঝতে পারছিল মেজোকাকার সন্দেহটা ওর ওপরেই বেশি। আজ তো নতুন নয়। এর আগে বহুবার এরকম হয়েছে। একবার সে কী বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়েছিল। হাসতে-হাসতে সকলের পেটে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। আর মেজোকাকা রাগে, লজ্জায় ব্যাগের ভেতর জামাকাপড় ভরে ছোটোপিসির বাড়ি চলে গিয়েছিল। তিনদিনের মাথায় বাবা গিয়ে বকাবকি করে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

সেবার তো চশমা-চশমা করে বাড়ি মাথায় তুলেছিলেন মেজোকাকা। তিন ঘণ্টা ধরে পাঁচজন মিলে চশমা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। চশমা খুঁজে দেওয়ার জন্য মেজোকাকা মোটা অঙ্কের পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, খুঁজে দিতে পারলে পাঁচজনকেই একটা করে আস্ত আইসক্রিমের কাপ দেবেন। শেষ অবধি তন্নতন্ন করে খুঁজেও যখন পাওয়া গেল না, তখন মেজাকাকা ঠিক আজকের মতোই ওদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের ট্রায়াল হবে।"

রিন্টুর এখনও স্পষ্ট মনে আছে, টিংকু জিজ্ঞেস করেছিল, "এই দাদা, ট্রায়াল কী রে?"

রিন্টু সেদিন কী উত্তর দিয়েছিল সেটা মনে করলে ওর আজও হাসি পায়, রিন্টু বলেছিল, "দূর বোকা ট্রায়াল মানে জানিস না? খুব সহজ। ট্রায়াল মানে নতুন জামা-প্যান্ট গায়ে দিয়ে দেখে নিতে হয় মাপমতো হয়েছে কিনা। মেজোকাকা বোধ হয় আমাদের জামা-প্যান্ট বানিয়েছেন। তাই ট্রায়াল দেবেন।"

এখন রিন্টুর মনে হয় ভাগ্যিস সেদিন সময়মতো মেজোকাকিমা এসে পড়েছিলেন। তাই সে-যাত্রায় আর ট্রায়াল হয়নি। মেজোকাকিমা এসেই মেজোকাকাকে বলেছিলেন, "শুধু-শুধু বাচ্চাগুলোকে তিন ঘণ্টা ধরে হয়রান করালে। চশমা তো তোমার চোখে।"

তাই শুনে মেজোকাকা সেদিনও বলেছিলেন, "আই অ্যাম সরি।" তারপর রাত্রিবেলা

খাবার টেবিলে মেজোকাকিমা যখন রিন্টুর বাবা আর ছোটোকাকুকে ঘটনাটা বলেছিলেন তখন সকলের সে কী হাসি। রিন্টুর মা আর ছোটোকাকিমা তো রান্নাঘরে গিয়ে হেসে লুটোপুটি। তারপর মেজোকাকিমাও যেই হেসে ফেলেছেন তখন মেজোকাকা জল খেতে গিয়ে বিষমটিসম খেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে গটগট করে চলে গিয়েছিলেন। তার পরদিন সকাল থেকে মেজোকাকা নিখোঁজ। শেষ অবধি রিন্টুর বাবা ছোটোপিসির বাড়িতে টেলিফোন করে যখন জানলেন, তখন গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

আজকেও তাই মেজোকাকার মুখে "আই অ্যাম সরি" শুনে রিন্টু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এই না মেজোকাকিমা আবার সবাইকে বলে দেন, আর মেজোকাকাও ব্যাগে জামাকাপড় ভরে আবার ছোটোপিসির বাড়ির দিকে রওনা দেন!

ভাগ্যি ভালো আজ আর তেমন কিছু ঘটল না। রিন্টুর বাবা বললেন, "বলেছিস, কি না বলেছিস মনে করে দ্যাখ। ওইটুকু-টুকু ছেলে কী হারিয়েছে না বললে ওরা বুঝবে কেমন করে। সবাই কি তোর মতো এক একটি আস্ত ব্যোমকেশ বা ফেলু মিত্তির?"

মেজোকাকা এবারে সত্যি-সত্যিই লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললেন, "আমার দাঁতন-কাঁটা ছুরিটা পাচ্ছি না দাদা। কত ভালো একটা জিনিস। ওরিজিনাল জার্মান স্টিলের ছুরি। ভোরবেলা মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে দাঁতন কেটে নিয়ে এলাম। তারপর রাখলাম টেবিলের ওপর। দাড়ি কামিয়ে শেভিং সেটটা রাখতে গিয়ে দেখি ভ্যানিশ।"

"দ্যাখ, হয়তো আসশ্যাওড়ার জঙ্গলে ফেলে এসেছিস।" রিন্টুর বাবা হাসতে হাসতে বললেন।

মেজোকাকা গলার স্বর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে বললেন, "ইমপসিবল, দাদা ইমপসিবল। হতেই পারে না। পৃথিবী উলটে গেলেও হতে পারে না। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি টেবিলের ওপর রেখেছিলাম।"

রিন্টুর খুব ভয় করছিল এই না মেজোকাকিমা এসে বলেন যে "ছুরি তো তোমার ফতুয়ার বুকপকেটে।"

রিন্টু যদিও বুঝতে পারছিল যে, মেজোকাকার ফতুয়ার বুকপকেটে লবঙ্গার কৌটোটা ছাড়া আর কিছু নেই, তবুও সে দিনের চশমা কেলেঙ্কারির কথাটা মনে হতেই ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

রিন্টুর বাবা এবার ঘর থেকে বারান্দায় এসে বললেন, "আর তোরও বলিহারি

শখ। এই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির ফ্যাগ এন্ডে কেউ আসশ্যাওড়ার ডাল দিয়ে দাঁত মাজে কখনও শুনিনি। বাজারে কি টুথব্রাশ, টুথপেস্টের অভাব নাকি?"

"বুঝবে না দাদা, বুঝবে না। এসব জিনিসের কদর দিন-দিন হারিয়ে যাচ্ছে। কোনোদিন ব্যবহার তো করলে না। করলে বুঝতে পারতে এর ভেষজ গুণ। টুথপেস্ট টুথব্রাশ এর কাছে কিস্‌সু না।"

কথার মাঝখানে রিন্টুর মেজোকাকিমা ওপরে উঠে এসে মেজোকাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ গো, ঝন্টুকে দেখেছ?"

ওরা চারজনেই খুব অবাক হয়ে গেল যে, মেজোকাকার ওইরকম অগ্নিমূর্তি দেখেও মেজোকাকিমা কী সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

মেজোকাকা বললেন, "কই না। ঝন্টু তো এখানে নেই।"

মেজোকাকিমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কী! ঝন্টু তো নীচেও নেই। গেল কোথায় তা হলে?"

রিন্টুর বাবা বললেন, "ভালো করে খুঁজে দ্যাখো বউমা, কোথাও হয়তো লুকিয়ে আছে।"

মেজোকাকিমা বললেন, "না দাদা, আমরা সবাই মিলে দেখেছি, নীচে নেই।"

যিশু হঠাৎ বলল "ঝন্টু তো ছোটকার সঙ্গে বাজারে গিয়েছিল। ও ছোটকার পিঠে কাল চল্লিশবার সুড়সুড়ি দিয়ে দিয়েছিল বলে ছোটকা বলেছিলেন ওকে বল কিনে দেবেন। তাই সকালে ও ছোটকার সঙ্গে বাজারে গিয়েছে।"

"বললাম, অত চিন্তার কারণ নেই। কোথাও-না কোথাও আছে। যাবে কোথায়।" রিন্টুর বাবা ঘরে গিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বললেন।

মেজোকাকা ফোঁস করে উঠলেন, "যাবে কোথায়? তুমি এখনও বলছ এই কথা! থিংক অ্যাবাউট মাই দাঁতন-কাটা ছুরি। গেল কোথায়?"

"ছুরি আর মানুষ কি এক হল দিপু? এই বুদ্ধি নিয়ে তুই আর্মির মেজর ছিলি কী করে? ভাবলে আমার অবাক লাগে।"

নীচে ছোটকার গলার আওয়াজ পেয়ে মেজোকাকিমার পেছন পেছন সবাই প্রায় দৌড়ে নীচে নেমে গেল।

মেজোকাকিমা জিজ্ঞেস করলেন, "ঝন্টু কই! তোমার সঙ্গে বাজারে গিয়েছিল না?"

"না তো। যাবে বলেছিল। তারপর কী খেয়াল হল গেট অবধি গিয়ে আবার চলে

এল। ছোটকার বলার মধ্যে কোনো উদ্বেগ লক্ষ না করে ছোটোকাকিমা বললেন, "তোমার সঙ্গে যায়নি বলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে? ছেলেটা গেল কোথায় দেখতে হবে না?"

ছোটকা কিছু না বলে চুপচাপ সোফায় বসে পড়ে বললেন, "আজ ক'টা থেকে খেলা রে যিশু?"

"দশটা থেকে। ডে অ্যান্ড নাইট।" যিশু নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল।

"আজ অস্ট্রেলিয়া নির্ঘাত হারবে।"

ছোটকার কথা শেষ না হতেই মেজোকাকার বজ্রগম্ভীর ধমক, "ডোন্ট বি সিলি, নিলু। বয়স হয়েছে এখনও সার বুদ্ধি হল না। দেখছিস ছেলেটাকে পাওয়া যাচ্ছে না, আর তুই এখন খেলার গল্প করছিস।"

রিন্টুর বাবা বললেন, "দিপু ঠিকই বলেছে নীলু। যা, একটু সামনের মোড় অবধি দেখে আয়। একা-একা কতদূরেই বা যাবে। তবু দিনকাল তো ভালো নয়। একটা দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ! মেজোবউমা, তোমরা বরং সিঁড়ির ঘর, বাথরুম এগুলো একবার দেখে এসো। আর হ্যাঁ, ছাদটা দেখেছ কেউ?"

"না দাদা, দেখা হয়নি।" মেজোকাকিমার প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা।

রিন্টুর ঠাকুরমা সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলেন, "ওরে ঝন্টু রে, কোথায় গেলি রে। হে বাবা ক্ষেত্রপাল, সামনের অমাবস্যায় তোমায় জোড়া পাঁঠা মানত করলাম। আমার ঝন্টুকে ফিরিয়ে দিয়ে যাও বাবা।"

যত সবাই মিলে ঠাকুরমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই, ততই ঠাকুরমা কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। বাড়তে বাড়তে ঠাকুমার কান্না যখন শেষ ধাপে পৌঁছল তখন রিন্টুর বাবা রেগে গিয়ে বললেন, "চুপ করো তো মা। ঝন্টু আসবে তো ঠিকই। হয়তো কাছেপিঠে কোথাও গেছে। আমরা তো খোঁজখবর করছি।"

ঠাকুরমার কান্না কিছুতেই থামানো গেল না।

মেজোকাকিমা ও ছোটোকাকিমা ঘুরে এসে কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, "না, পাওয়া গেল না। সিঁড়ির ঘর, ঘুঁটের ঘর, বাথরুম, ভাঁড়ার ঘর সব খুঁজেছি। কোথাও পেলাম না।"

ছোটকাকিমা কথা বলতে বলতে ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেলেন। ছোটকা তাড়াতাড়ি

ধরে না ফেললে ডাইনিং টেবিলের কোনায় লেগে মাথাটাই হয়তো ফেটে যেত। তাড়াতাড়ি জল এনে চোখেমুখে ছিটিয়ে দেওয়া হল।

রিন্টু, টিংকু, যিশু সবাই লক্ষ করল মেজোকাকার কপালে ভাঁজ বাড়ল, আর বাঁ হাতের আঙুলগুলো ডান গালের আঁচিলটার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টেনশন বাড়লে বা রাগ বেড়ে গেলে মেজোকাকার কপালে যে ভাঁজ পড়ে এবং বাঁ হাতের আঙুল ডান গালের ওপর চলে যায় এইসব লক্ষণ রিন্টু, টিংকু, যিশুদের ভালোই জানা আছে। মলিটা ছোটো বলে ওকে কেউই পাত্তা দেয় না।

যিশু বলল, "বড়োমা, আমরা একবার ছাদটা দেখে আসব? রিন্টু, টিংকুর মাকে যিশু বড়োমা বলে আর ওদের বাবাকে বলে জ্যাঠামণি।"

ছাদের কথা শুনে রিন্টুর বাবা বললেন, "না, না, তোমাদের কাউকে ছাদে যেতে হবে না। আমি আর নিলু দেখছি। আয় তো নিলু।"

ছোটকা বললেন, "তুমি বরং মেজদাকে নিয়ে যাও। আমি ততক্ষণ স্কুটারটা নিয়ে নদীর ধারটা দেখে আসছি। বলা তো যায় না দুরন্ত ছেলে। হয়তো ঘুড়ি ওড়াতে গিয়েছে। বা অনেক সময় হালদারবাড়ির পটলা বলে ছেলেটা ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যায়, তার সঙ্গে যেতে পারে।

মেজোকাকা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বললেন, "কী বললি! নদীতে মাছ ধরতে যায়। ডেঞ্জারাস! ঝন্টুর অ্যাংলিং-এর নেশায় পেয়েছে। বড়দা, সাংঘাতিক খবর। আমি তো কিছুই জানতাম না।"

"আরে না, না। তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওইটুকু ছেলে, বড়োজোর সাত-আট বছর বয়স, ওর কি মাছধরার নেশাটেশা সম্বন্ধে কোনো বোধবুদ্ধি আছে? এমনিই হয়তো পটলার সঙ্গে খেলাধুলো করে, তাই নিলুর মনে হয়েছে ঝন্টুও ওর সঙ্গে মাছ ধরতে গেছে।"

"তা হলে এখন কী করবে? থানায় খবর দেবে?" মেজোকাকা টাকের পেছনটায় একবার হাত বুলিয়ে নিতে নিতে বললেন।

রিন্টুর বাবা বললেন, "দাঁড়া দাঁড়া। আগে ভালো করে সব দিক খুঁজে দেখি। তারপর থানা পুলিশ করা যাবে। থানা-পুলিশের কথা জানিস তো! একবার ছুঁলে আর রক্ষে নেই। ছেলে ফিরে পাওয়ার পরেও তার ঝক্কি সামলাতে হয়—কেন ছাদে গিয়েছিল, কোনো চিঠিপত্তর রেখে গেছে কি না এইসব হাজারটা প্রশ্ন। তার চেয়ে বরং চল,

তুই আর আমি একবার ছাদটা দেখে আসি। তা ছাড়া চিলের ঘরটাও তো দেখা হয়নি। ওগুলো দেখে তারপর না হয় থানা পুলিশের কথা ভাবা যাবে।

মেজোকাকা তখনই চিৎকার করে উঠলেন, "কতদিন বলেছি ছাদের দরজাটা আন্ডার লক অ্যান্ড কি রাখতে। কে কার কথা শোনে। ছাদের দরজাটা বন্ধ থাকলে আর এই আশঙ্কাটা থাকত না। অন্তত এটা বুঝতাম যে সীমান্তের একটা দিকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো।"

কথাগুলো শূন্যে ভাসিয়ে দিলেও মেজোকাকার লক্ষ্য যে মেজোকাকিমা রিন্টু আর যিশু সেটা দু'জনে দু'জনকে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল। কিন্তু তখনই এক কাণ্ড হল। মেজোকাকার কথা শুনতে শুনতে মেজোকাকিমাও এমন ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেন যে সেটা দেখে রিন্টু, যিশুরও খুব হাসি পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেজোকাকার গলার ভলিউম বাড়ল। "হাসছ কেন? কী হয়েছে? বলো, ছুরিটা দেখেছ তোমরা?"

ওরা দু'জনে ঘাবড়ে গিয়ে বলল "না, মানে খুব খিদে পেয়েছে তো তাই হাসি পেয়ে গেল।"

"কী বললি? খিদে পেলে হাসি পায়? শুনিনি কখনও। নেভার। বড়দা, ছাদে যাবে তো চলো। কোথায় যে গেল ছেলেটা!"

কথা বলতে বলতে দু'জনে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

রিন্টু আর যিশু ওঁদের পেছন পেছন ছাদে গেল। মেজোকাকা কিছু বললেন না, বকাবকি করলেন না দেখে দু'জনেই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

রিন্টুর বাবা বললেন, "দিপু, তুই আগে চিলেকোঠার ঘরটা ভালো করে খুঁজে দ্যাখ। খাটের তলাটলাগুলোও দেখবি।"

মিনিট পাঁচেক ধরে গোয়েন্দাদের মতো তল্লাশি চালাবার পর হতাশ হয়ে বেরিয়ে এসে মেজোকাকা ফতুয়া দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। রিন্টুর বাবা রিন্টু আর যিশুকে দিয়ে জলের ট্যাঙ্কের ঢাকনাটাকে ছাদের ওপর নামিয়ে ফেলেছেন। ট্যাঙ্কের সঙ্গে লাগোয়া কলের পাইপের ওপর দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ভেতরটা দেখতে গিয়ে মেজোকাকার নাকের ওপর থেকে চশমাটা খুলে ঝপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গেল। মেজোকাকা সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, "ও! মিসফরচুন নেভার কাম্‌স অ্যালোন। দেখলে বড়দা, বিপদের ওপর বিপদ কীভাবে আসে। এখন আমি কী যে করি!"

মেজোকাকার অসহায় অবস্থা দেখে রিন্টুর বাবা বললেন, "আবার তোর খুদে বাহিনীকে ধর। ওরা ঠিক উদ্ধার করে দেবে।"

শেষ অবধি পাঁচখানা আইসক্রিমের কাপ পুরস্কার হিসেবে ঘোষণা করার পর মেজোকাকার চশমা উদ্ধার হল।

নীচে স্কুটারের হর্ন শুনে রিন্টু আর যিশু ছুটে নেমে গেল। মেজোকাকা বললেন, "তাড়াতাড়ি চল। নিলু এসে গেছে। কী খবর আনল দেখি।"

ছোটোকাকার মুখে যখন সবাই শুনল যে, ঝন্টুকে কোথাও পাওয়া যায়নি তখন সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেল। রিন্টু, যিশুরা বুঝতে পারছিল সাংঘাতিক খারাপ একটা কিছু ঘটতে চলেছে। বারান্দায় একটা মাদুরে ছোটোকাকিমা শুয়ে আছেন। কপালে জলপট্টি দেওয়া। রিন্টুর মা আর মেজোকাকিমা সমানে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

মেজোকাকা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, "বউদি এখানে ভাঙা শিশিবোতল এল কোত্থেকে?"

রিন্টুর মা শান্ত গলায় জবাব দিলেন, "পুরোনো খবরের কাগজওলা এসেছিল। কিছু শিশি-বোতল ছিল, দিয়ে দিলাম। ওগুলো একেবারে ভাঙা বলে নেয়নি।"

"ব্যস। হয়ে গেল। আর দেখতে হবে না। নির্ঘাত ঝন্টুকে থলেয় পুরে নিয়ে গেছে। কতদিন বলেছি এইসব উটকো লোক সম্বন্ধে কেয়ারফুল থাকবে। ওরা হল ছেলেধরার এজেন্ট। তা না হলে অত বড়ো বস্তা আনার দরকারটা কী শুনি। বড়দা, তুমি এখনই থানায় ফোন করো। ওরে নিলু, শিগগির বেরিয়ে দ্যাখ। কতবার বলেছি ছেলেমেয়েগুলোকে চোখে-চোখে রাখতে। কে কার কথা শোনে! আমার ছুরি যায় যাক, ছেলেটাকে তো খুঁজে বের করতে হবে।"

বাড়িসুদ্ধু লোক কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। বড়োদের কান্না দেখে ছোটোরাও কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

ছোটকার দু-তিনবার বাইরে যাওয়া-আসা, একে-তাকে জিজ্ঞেস করা আর হইচই চ্যাঁচামিচি শুনে ততক্ষণে উঠোনে পাড়ার অনেকে এসে জড়ো হয়েছে।

পাশের বাড়ির টিটোর ঠাকুরমা এসে মেজোকাকিমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "তোমার ছেলেকে ভগবানই পাঠিয়েছেন। তিনিই রক্ষা করবেন। তুমি মিছিমিছি কেঁদে কী করবে বউমা?"

পাড়ার রেশনের দোকানের মালিক বিভূতি নস্কর হঠাৎ নিজের মনেই বলতে শুরু

করলেন, "দিনকাল ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে মুখুজ্জেমশাই। এই তো পরশুদিন পরিষ্কার দিনদুপুরে জলজ্যান্ত একটা ছেলেকে ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেল। কতই বা বয়স। ঝন্টুর বয়সিই হবে বড়ো জোর। যাক..."

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিভূতি নস্কর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রিন্টুদের স্কুলের নন্দ-স্যার বললেন, "নস্করমশাই, বিশ্বাস বলে আজকাল আর কিছু রইল না সংসারে। এই হকারগুলোকে বিশ্বাস করা খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

ততক্ষণে মেজোকাকা চেক লুঙ্গির ওপরে তাঁর প্রিয় পোশাক মখমলের পাঞ্জাবি চাপিয়ে রোয়াকে এসে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে এক লাফে লেবুগাছের তলা থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "এই তো। হোয়াট ইজ দিস? ঝন্টুর হাওয়াই চপ্পল। ব্যস, নো ডাউট অ্যাবাউট কিডন্যাপিং।"

সবাই ছুটে এসে মেজোকাকার হাতের চটিটা দেখতে লাগল। মেজোকাকিমার কান্না থামানো দায় হয়ে গেল।

হঠাৎ থপ করে একটা আওয়াজ হতেই সবাই আর-একবার চমকে উঠল। মেজোকাকা সেদিকে তাকাতেই দেখলেন আর এক পাটি চপ্পল। তারপর ওপরদিকে তাকিয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার করলেন, "হতভাগা ইডিয়ট, আধঘণ্টা ধরে বাড়িসুদ্ধ লোককে পাগল-নাচ নাচালি। আয়, এবার নেমে আয়। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন, দেখে নিচ্ছি। পিঠের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বানাব।"

সবাই ওপরদিকে তাকিয়ে দ্যাখে, একটা তেডালার ওপর বসে ঝন্টু খিলখিল করে হাসছে। রিন্টুর বাবা এসে বললেন, "খুব হয়েছে। এবার নেমে এসে পঞ্চাশবার ওঠ-বোস কর।"

ঝন্টু নেমে আসতেই মেজোকাকিমা ওকে জড়িয়ে ধরে আরও খানিকটা কেঁদে নিলেন।

ছোটকা জিজ্ঞেস করলেন, "তুই হঠাৎ গাছে উঠতে গেলি কেন?"

ঝন্টু চোখের ইশারায় ওর বাবাকে দেখিয়ে ডান হাতটা পকেট থেকে বের করে ছোটকাকে দেখাল।

ছোটকা বললেন, "এ কী রে? এ যে মেজদার জার্মান স্টিলের ছুরি। কোথায় ছিল রে?"

মেজোকাকা লাফিয়ে এসে বললেন, "দেখি। এই তো, এগজ্যাক্টলি আমারটা। সেম হ্যান্ডল, সেম কালার। কোথায় পেলি তুই? বল, কেন নিয়েছিলি?"

মেজোকাকার ধমকানিতে ঝন্টুর প্রায় নাকানিচোবানি খাওয়ার মতো অবস্থা। কেঁদেই ফেলত, যদি না সেই সময় ঠাকুরমা এসে পড়তেন।

ঝন্টু বলল, "পেয়ারা গাছের মগডালে একটা সুন্দর গুলতির কাঠ দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম বাবা যখন বাথরুমে যাবেন সেই সময় চট করে গুলতির কাঠটা কেটে এনে ছুরিটা ঠিক জায়গায় রেখে দেব। কিন্তু সবাই এমন ভয় পেয়ে হইচই শুরু করে দিলেন যে, আমি আর নামতে পারলাম না।"

মেজোকাকা ছাড়া সকলেই প্রাণ খুলে হাসতে শুরু করে দিল।

মেজোকাকা ঝন্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন নো প্লে। যাও, সোজা পড়ার টেবিলে বসে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বানানটা একশোবার লেখো। এই তোমার শাস্তি।"

রিন্টুর মা বললেন, "ঠাকুরপো, তোমার চশমা খুঁজে দেওয়ার জন্য তুমি বাচ্চাগুলোকে আইসক্রিম খাওয়ালে, আর আমরা তোমার ছেলেকে খুঁজে দিলাম, আমাদের সবাইকে আইসক্রিম খাওয়াবে না?"

মেজোকাকা গটগট করে ওপরে চলে গেলেন। সবাই একটু থমকে গেল। মেজোকাকার স্বভাব তো সকলেরই জানা।

একটু পরে মেজোকাকা আবার নীচে নেমে এসে ছোটকার হাতে একটা চকচকে একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন, "যা তো নিলু, সবার জন্য আইসক্রিম নিয়ে আয় তো।"

রিন্টু যিশু, ঝন্টুরা সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে বলল, "কী মজা।"

রিন্টুর বাবা বললেন, "যাক, বাঁচালি দিপু, আমি তো ভাবলাম তোর বউদির কথা শুনে তুই আবার ব্যাগ গুছিয়ে গোপাদের বাড়ি চলে যাচ্ছিস।"

আবার একচোট হাসির ঝড় বয়ে গেল।

ছোটকা স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে মেজোকাকা চেঁচিয়ে বললেন,

"ওরে শোন ঝন্টুর জন্য একটা বেশি নিয়ে আসবি। ওর কল্যাণেই তো সকলের আইসক্রিম খাওয়া...।"

সেজোমামার অদ্ভুত চিঠি

টুটু বলল, "না রে বিল্টু, আমি স্পষ্ট শুনেছি সেজোমামা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলছে ইম্পসিব্‌ল ইম্পসিব্‌ল। এ হতে পারে না। তুমি বুঝতে পারছ না। পরের ছেলে, দু'দিনের জন্যে এসেছে। যদি কিছু হয়ে যায় কী কৈফিয়ত দেবে?"

বিল্টু বলল, "কাকে বলছিল রে?"

"সেজো মামিমাকে।"

"কী নিয়ে রে? সেজোকাকুর কী হয়েছে? কোনো বিপদ?"

"তা জানি না। তবে কালকেও শুনেছিলাম সেজোমামা সেজো মামিকে বলছিল ঐ চিঠির কথা। কালকের ডাকে কী একটা যেন চিঠি এসেছে। খুব ভয়ের। তাতে নাকি এই বাড়ির অনেকের নাম লেখা আছে।"

"কার কার নাম আছে রে? সেজোকাকারও?"

"দূর বোকা, সেজোমামার নাম তো থাকবেই। সেজোমামার নামেই তো চিঠিটা এসেছে। অবশ্য শ্যামল বলে লেখেনি। সেজোমামার ডাক নাম যে বুবাই সেটা পত্রলেখক জানে।"

বিল্টু হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ রে টুটু, অত বড়ো লোকের নাম বুবাই হয় নাকি রে?"

টুটু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "তোর আই কিউ কিন্তু খুব কম। তোর যখন ষাট বছর বয়স হবে তখন কি তোর নাম বিল্টু থেকে বঙ্কুবিহারী করে দিবি?"

"হ্যাঁ রে টুটু, ওতে তোর নামও আছে?"

"আরে, সেইজন্যেই তো সেজোমামার এত চিন্তা। বাবা তো আমাকে এবার পুজোয় আসতে দিতেই চায়নি। সেজোমামা মাকে খুব করে ধরল। তাই এলাম।"

"তা, তুই চিঠিটা পড়েছিস?"

টুটু কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় তার সেজোমামার গলা শোনা গেল— "বড়দা, বড়দা..."

বিল্টু বলল, "ঐ দ্যাখ সেজোকাকু বাবাকে ডাকছে। বোধহয় নতুন কোনো ক্লু পাওয়া গেছে। চ, আমরা লুকিয়ে শুনি।"

"বড়দা, তুমি বুঝতে পারছ না, রীতিমতো ভয়াবহ চিঠি। নিশ্চয় কোনো জাত ক্রিমিনালের কাজ। তুমি এখনই পুলিশে খবর দাও। দেখছ না চিঠিটায় আমাদের হাউস ফিজিসিয়ান ড. ভারমার নামও লেখা আছে।"

"তা কী লিখেছে চিঠিতে?"

সেজোমামা বলল, "আরে সেটা বুঝতে পারলে তো হয়েই যেত। কেসটা মিস্টিরিয়াস। তবে আমি সিয়োর, ক্রিমিনাল অনেক ভাষা জানে। সেই চর্যাপদ ব্রজবুলি থেকে শুরু করে সংস্কৃত, ল্যাটিন, এমনকি হিব্রু পর্যন্ত।"

"দেখি চিঠিটা।"

আড়াল থেকে টুটু আর বিল্টু উঁকি মারে। টুটু বিল্টুকে ঠ্যালা দিয়ে আস্তে আস্তে বলে, "দেখছিস, বড়োমামার মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে।"

চিঠিটা শেষ করে বড়োমামা বললেন, "ঠিক আছে। ওখিরাকে ডাক। ওকে বল শুকুরামের রিকশায় করে গিয়ে ও. সি. মিস্টার লস্করকে খবর দিয়ে আসুক।"

সেজোমামা অধৈর্য হন। "দাদা, তুমি চিঠিটা কিচ্ছু পড়নি। বলছিলাম অপরাধী খুব সাধারণ বুদ্ধির লোক নয়। হাইলি ইনটেলেকচুয়াল। এর মধ্যে তো ওখিরা এবং মিস্টার লস্করের নামও আছে। ঠিক মতো না জানার জন্য লস্করকে লস্কুর করে দিয়েছে। সব থেকে আশ্চর্যের কথা শুকুরাম যে রাতে আমাদের বাড়ি থাকে এবং রিকশা চালায় সেটা কী করে জানল?"

"তা হলে এক কাজ কর। থানায় ফোন কর আমার নাম করে। আর আমি যাচ্ছি আমাদের কলেজের বাংলার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের কাছে। উনি একজন লিঙ্গুইস্ট।"

সেজোমামা বাধা দেন, "আমি বলি কি দাদা একবার জামাইবাবুকে খবর দাও। উনি তো ইনটেলিজেনসের বড়কর্তা। নিশ্চয় রহস্য সল্‌ভ করতে পারবেন।"

"তাই তো।" বড়োমামার মনে পড়ে যায়। বলেন, "আজকেই তো বরেনের টেলিগ্রাম পেয়েছি, বিকেলেই আসছে টুটুকে নিতে। ওদের সাতাশ তারিখে স্কুল খুলবে। তুই বরং টুটুকে একটু চোখে চোখে রাখিস। আমাকে স্টেশনে যেতে হবে ওকে রিসিভ করতে।"

দুপুরে খাওয়ার পর টুটু এসে বিল্টুকে বলল, "শিগগির বাগানে চ'। কথা আছে। আমি সেজোমামার টেবিল থেকে চিঠিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা কপি করেছি।"

বিল্টু উৎসাহভরে জিজ্ঞেস করে, "কী লেখা আছে রে?"

কিচ্ছু বুঝবি না। শুধু নামগুলোই বুঝতে পারবি। ওর মধ্যে আমার, ভারমার, ওখিরা, লস্কুর এবং শুকুরামের কথা লেখা আছে। সেজোমামাকে অ্যাড্রেস করে লেখা। লাস্টে লেখা বাবু।

বাগানে গিয়ে টুটু চিঠিটা দেখাল। সাধারণ সাদা কাগজে লেখা। কোনো তারিখ বা জায়গার নাম নেই। চিঠিটায় লেখা আছে—

"বুবাই, মাজার মা তো ওনিসাবাল। ভারমা আরাম তোয়। নল ভার। রীশরদিদির মা তো ওখিরায়াদির বখকেল। কি উদপরা তাবেই। লয়াঝি বুয়ষবির মা। জমি জর দে মা। তোর পর বাইযা মিআ। বেলিখু লস্কুর। ও খেরি তাশ তাসা মীগা। আবসি আয়া। ইলকে টুটু মিআ ন দি। ঐড়া ছাতা, না ওখিরা? লাখো রপ্তদন দিও বে। কি থানেশ। স্টেতময়ম সমিতু। বই যায়। সাবার দে মা। তোর বাবির মীগা আমি আছ। আলে শকুরাম তো রিকশা আই, বাবু।"

বিকেলে টুটুর বাবা আসতেই সেজোমামার মুখে হাসি খেলে গেল! তিনি চিঠির ব্যাপারটা সবিস্তার তাঁকে জানালেন। সব শুনে টুটুর বাবা বললেন, "দেখি কী চিঠি।" সেজোমামা চিঠিটা এনে তাঁর হাতে দিতে টুটুর বাবা সেটা খুব তাড়াতাড়ি পড়ে ফেরত দিলেন।

সেজোমামা বললেন, "ইজ ইট নট মিস্টিরিয়াস, জামাইবাবু?"

টুটুর বাবা কিছু বলার আগেই টুটু এল লাফাতে লাফাতে। "সেজোমামা, সেজোমামা, প্রবলেম সল্‌ভড। প্রমিস কর আমাদের দুজনকে ক্রিকেট ব্যাট কিনে দেবে।"

সেজোমামা বললেন, "আগে বল কী হয়েছে।"

"এই দ্যাখো চিঠির মিস্ট্রি সল্‌ভড।"

টুটু একটা কাগজ দিল। তাতে লেখা আছে—

বুবাই, আশা করি তোমরা কুশলে আছ। আমি আগামী রবিবার তোমাদের বাসায় যাইব। তুমি সময়মতো স্টেশনে থাকিবে। ওদিন দপ্তর খোলা রাখিও না, তাছাড়া ঐ দিন আমি টুটুকে লইয়া আসিব। আগামী সাতাশ তারিখে ওর স্কুল খুলিবে। আমি যাইবার পর তোমাদের জমিজমার বিষয় বুঝিয়া লইবে। তারাপদ উকিলকে খবর দিয়া রাখিও। তোমার দিদির শরীর ভালো নয়। তোমরা আমার ভালোবাসা নিও।

তোমার জামাইবাবু

"এটা আবার কোথায় পেলি?" সেজোমামা জিজ্ঞেস করলেন।

"তুমি তোমার মিস্টিরিয়াস চিঠিটা তলার দিক থেকে ওপর অবধি পড়। আর প্রয়োজনমতো দাঁড়ি কমা চেঞ্জ করে দাও। তা হলেই সল্‌ভড চিঠিটা পেয়ে যাবে।" টুটু উত্তর দিল।

সেজোমামা ঐ ভাবে চিঠিটা জোরে জোরে পড়তেই সবাই হো হো করে হেসে উঠল। আর সেজোমামা মুখ গম্ভীর করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাটতে লাগল। জামাইবাবু তাকে আচ্ছা বেকুব বানিয়েছেন।

টুটুর বাবা ঠাট্টার সুরে বললেন, "বুবাই, কাল থেকে চাকরিতে ইস্তফা দাও। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা যা পাবে তার থেকে এদের দুটো ক্রিকেট ব্যাট কিনে দিয়ো। আর শাস্তি হিসেবে আমাকে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দাও।"

টুটু ও বিল্টু সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "সেজোমামা হেরো, সেজোকাকু দুয়ো।"

সাধুবেশে মধুখুড়ো

ভোররাত থেকে সেই যে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এখনও থামেনি। রোববারের সকালটাই মাটি। আজ বিকেলের পঞ্চাননতলার 'ডাকাবুকো' ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচটা না পণ্ড হয়। একটু যে চুটিয়ে আড্ডা দেবে তারও উপায় নেই। যুগলের মিষ্টির দোকানের ছাদটার অবস্থা ওর গায়ের গেঞ্জিটার মতো। ঊনচল্লিশখানা ছ্যাঁদা। নাইনটি-টুতে দুর্গাপুজোর সময় কেউ একজন দিয়েছিল। উপহার পাওয়া জিনিস নাকি হাতছাড়া, সরি, গা-ছাড়া করতে নেই, এই বলে তিনটে বছর চালিয়ে দিল।

দুটো করে কচুরি আর তিনটেকে পাঁচটা কড়া চায়ের অর্ডার দিয়ে বেঞ্চিতে এসে বসল ওরা চার মক্কেল—মানে, পঞ্চা, নেদো, বাঁটুল আর রবি।

বেঞ্চি বলতে বাঁশের বাখারি দিয়ে বানানো। দোকানের সামনেটা জলে থই থই!

পঞ্চা মুখভর্তি কচুরি নিয়ে বলল—"হ্যাঁরে নেদো, দুদিন ধরে খুড়োকে দেখছি না তো! মরেফরে গেল না তো?"

নেদো আঙুল চাটতে চাটতে বলল, "তাই তো রে মাইরি, ব্যাপারটা তো খেয়ালই করিনি। সার্চিফাইং করতে হবে তো! আবার কোনো কেলেঙ্কারিয়াস কাণ্ড করে বসল না তো!"

রবি গম্ভীর গলায় বলল—"আবার ইংলিশ ঝাড়ছিস? কত পেয়েছিস ফার্স্ট টার্মে ইংরাজিতে?"

পঞ্চা বলল—"নারে, ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। রোববার সকালে খুড়ো কচুরি সাঁটাতে আসবে না এটা ভাবা যায়? নির্ঘাত অসুখ-ফসুখ করেছে। তাছাড়া খুড়ো বলেছিল ওর সামনের দিকের ঘরটা আমাদের ছেড়ে দেবে—মানে লিখে দেবে—চারমূর্তি ক্লাবের নামে।"

নেদো লাফিয়ে উঠে বলল—"তার মানে পারমেন্টলি দিয়ে দেবে? ফর গুড্?"

"গুড্ ব্যাড্ জানি না। খুড়ো বলেছিল ওর তো কেউ নেই। মরে গেলে তো ভূতের বাসা হবে। তার থেকে যদি..." পঞ্চার কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি শোনা গেল।

পাঞ্জাবির হাতাটা কনুইয়ের ওপরে তুলতে তুলতে ফতুদা হুকুম দিল—"দাও তো যুগলদা আটটা কচুরি।"

ফতুদাকে ঢুকতে দেখেই নেদো সিঁটিয়ে গেল। ফতুদা বলল—"কিরে বাঁটলো, মধুখুড়ো আসেনি আজ? ভাবলাম খুড়োর ঘাড় ভেঙে আজ বিকেলের ম্যাচের টিফিনখরচাটা তুলব। সে আর হল না। আর হ্যাঁ, পঞ্চু, তোমাদের চারমূর্তি ক্লাবের কদ্দূর কী হল। খুড়ো ঘর-টর দিল?"

ফতুদার কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে থেকে বজ্রগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল—"জয়-ত্-তারা, জয়-ত্-তারা, মা কালী কপালিনী, জয় বাবা মহেশ্বর।"

আচমকা এরকম চিৎকারে ওরা সবাই হকচকিয়ে গেল। পঞ্চা, নেদো, রবি আর বাঁটলো এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যুগল পেছনদিকে না তাকিয়েই খেঁকিয়ে উঠল, "এখন যাও তো, বউনির সময়। বেলায় এসো।"

সবাইকে চমকে দিয়ে "ওঁ তারকনাথ, জয় বাবা শিবশম্ভু" বলে ভেতরে ঢুকল টকটকে লাল গেরুয়া-পরা একমাথা জটা, মুখভর্তি কুচকুচে কালো দাড়ি-গোঁফওলা একজন লোক। গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। দেখে তান্ত্রিক বলে ভাবতে অসুবিধা হয় না। ফতুদার পাঞ্জাবির হাতাটা আবার নেমে এসেছে। গোটাবার কথা ভুলে গেছে। বোঝা গেল বেশ ভয় পেয়েছে। তাড়াতাড়ি যাতে ভেগে যায় সেজন্য বলল, "যুগলদা চারটে কচুরি আর দুখানা গরম জিলিপি সাধুবাবাকে দিয়ে দাও। পুণ্যি হবে।" সাধুবাবা ততক্ষণে দোকানের মাঝবরাবর নেদোদের বেঞ্চি পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ ধপ্ করে বেঞ্চির ওপরে বসে হাতের ত্রিশূলটা নেদোর গায়ের কাছে এমনভাবে রাখল যে নেদো সোজা দোকানের বাইরে। ফতুদা যে ফতুদা কথায় কথায় এত কাপ্তানি দেখায়, বাইরে এসে ফিসফিস করে বলল, "বুঝলি রোবে, এক্কেবারে সিদ্ধপুরুষ, যোগ-সাধন করা তান্ত্রিক বলে মনে হচ্ছে। চোখ দুটো দেখলিনা ভাঁটার মতো জ্বলছে। মনে হচ্ছে, এখুনি সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।"

বাঁটুল এমনিতে খুব চুপচাপ, কিন্তু কথা বলে খুব গুছিয়ে, বিজ্ঞের মতো। বলল, "আচ্ছা ফতুদা, সাধনসিদ্ধ তান্ত্রিক না হয় মানলাম। কিন্তু সাতসকালে কচুরি-জিলিপির দোকানে কেন?"

ফতুদা বলল—"বুঝলিনা এরা হল সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের সর্বময় কর্তা। দেখ, ভগবান

হয়ত তান্ত্রিকের বেশে এসে সবাইকে ঝালাই করে নিচ্ছে। দেখিস, বিকেলের দিকটা ভালো যাবে। সিয়োর পাঁচগোলে উইন। কেউ রুখতে পারবে না।"

বাঁটলো বলল—"তুমি আবার ভগবানে বিশ্বাস করতে শিখলে কবের থেকে? তোমার কি এব্যাপারে কোনো..."

বাঁটলোর কথা আটকে যেতে সবাই তাকিয়ে দেখল ওর চোখের দৃষ্টি সটান দোকানের দিকে। সকলে ওর চোখের দৃষ্টি ফলো করে যা দেখল সংক্ষেপে তা এই রকম—ডানদিকের হাতলভাঙা চেয়ারটায় বসে আছে সাধুবাবা। যুগল একটা বালতিতে সাধুবাবার পা ডুবিয়ে সেই জল খাচ্ছে এবং সবাইকে খাওয়াচ্ছে। কর্মচারী নিমাই একটা ঝকঝকে পদ্মপাতায় খানবারো ফুলো ফুলো কচুরি, চারখানা কিংসাইজ রাজভোগ নিয়ে সাধুবাবার সামনে একটা নড়বড়ে টুলের ওপর রাখল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে সাবাড় করে লম্বা দুটো ম্যাগনাম ঢেঁকুর তুলে সাধুবাবা দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াল। তারপর দুবার 'জয়-ত্-তারা', 'জয়-ত্-তারা' বলে হুঙ্কার ছেড়ে পঞ্চার কানের কাছে গিয়ে বলল, "আজ তিন গোলে জিতবি তোরা। কিচ্ছু ভাবিস না"—বলে সাধুবাবা হনহন করে এগিয়ে গেল।

ফতুদা বলল—"প্রমাণ পেলি তো? বলেছিলাম না সিদ্ধপুরুষ। ফোরকাস্ট করে গেল—শুনলি তো?"

পঞ্চা বলল, "সিধুপুরুষ তো বটেই। তা না হলে ওইরকম বাজখাঁই গলার আওয়াজ হয়!"

রোবে অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর চশমাটা খুলে জামার তলাটা দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, "আচ্ছা ফতুদা, সাধুবাবা তো আমাদের পাড়ার লোক নয়, এমনকি এ তল্লাটেও আগে কেউ আমরা দেখিনি। সাধুবাবা কী করে জানল যে আজ আমাদের ফুটবল ম্যাচ।"

"যোগ, সেরেফ যোগসাধনা, বুঝলি তো! যে সে লোক পারে না। ওরা তোর কান দেখে বা কপাল দেখে বলে দেবে তুই কটা সাব্জেক্টে ফেল করেছিস। তবে হ্যাঁ, তান্ত্রিকদের কখনও রাগাতে নেই। অভক্তি, অশ্রদ্ধা করতে নেই। তাহলেই কটমট করে তাকিয়ে দু'মিনিটেই বডি অ্যাশ করে দেবে।" ফতুদা বেশ বিজ্ঞের মতো লেকচার দিয়ে দিল।

নেদো বলল,—"চল, আমরা খুড়োকে কলিং করে আনি। ক্লাবঘরটা কবে দেবে

আর বিকেলের টিফিনের ব্যাপারটা ইনফার্ম করে আসি। অন্তত ওর মুখ থেকে একটা ইনসিওরেন্স আমরা পেতে চাই। দেবে কি—দেবে না!"

বাঁটুল এমনিতে চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে। নেদোর কথায় কথায় ভুল ইংরাজি ওর একদম সহ্য হয় না। খেপে গিয়ে বলল—"চুপ করতো। ভেতো সাহেব কোথাকার। ইংরাজির 'ই' জানিস না, কথায় কথায় ইংরাজি ফলাস। কথাটা ইনফার্ম—না কনফার্ম? আর ইনসিওরেন্স মানে জানিস? অ্যাসিওরেন্সকে ইনসিওরেন্স করে দিলি? একদম চুপ করে থাকবি। একটা টুঁ শব্দও করবি না এখন থেকে। বখাটে মাথামোটা একটা।"

পঞ্চা বলল—"চলো ফতুদা, নেদো ঠিক কথাই বলেছে। খুড়োর বাড়িতে হামলা করি গিয়ে। নাহলে নিজের থেকে একটা পয়সাও দেবে না।"

রোবে সাধুবাবার বারোটা কচুরি দু'মিনিটে গ্যারেজ করার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিল না। তাছাড়া সাধু-ফাধুর কেসগুলো ও একটু বিশেষভাবে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করে। হঠাৎ বলল—"তোরা কেউ খেয়াল করেছিস কি? সাধু বা তান্ত্রিকদের পায়ে ও রকম ইটরঙের কেড্‌স থাকবে কেন? হয় খড়ম পরবে, নাহলে মুক্তপদ থাকবে। জালি-ফালি নয়তো? সাতসকালে যুগলদার বিশ টাকা ওয়াটার করে দিয়ে গেল। আমার মনে হয় খুড়োর যে কেড্‌সজোড়া গত বুধবার আঁশতলার মাঠে ম্যাচের দিন হারিয়ে গিয়েছিল—এটা সেইটাই।"

সকলে মিলে গাবতলা দিয়ে নেমে খুড়োর বাড়ির দিকে রওনা দিল। অনন্ত মালাকারের মুদিখানার কাছে আসতেই সবাই দেখল খুড়োর বাড়ির সামনে খুব ভিড়। কেরোসিনের লাইনের মতো তিনখানা লম্বা লাইন স্কুলবাড়ির কাছ থেকে খুড়োর বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। দুটো মেয়েদের একটা ছেলেদের। বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও মহিলা হাতে চ্যাঙাড়ি আর দুখানা জ্বালানো ধূপকাঠি নিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে খুড়োর সদর দরজা দিয়ে উঠোনের দিকে।

ওদের কারোর মুখেই কোনো কথা নেই। দূর থেকেই বেশ ধূপ-ধুনোর গন্ধ নাকে লাগছে।

পঞ্চা বলল—"কী গো ফতুদা, খুড়ো কি বাড়িতে কালীমন্দির করল নাকি?"

নেদো আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বলল—"মনে হচ্ছে খুড়ো বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে পালিয়েছে, যাতে আমাদের ক্লাবঘর না দিতে হয়!"

মহাকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মহাদেবদা দোকানের বাইরে বড়োবড়ো চারখানা

বারকোশে চিনির সন্দেশ, বাতাসা, কদমা, নকুলদানার পাহাড় করে একটা মোড়ার ওপরে বসে আছে। দু-তিনটে কর্মচারী হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে যারা পুজোর প্রসাদ কিনছে তাদের সামলাতে।

"ব্যাপারটা মিস্টিরিয়ান মনে হচ্ছে"—কথাটা বলেই নেদো বাঁটলোর দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বলল—"সরি, ফের আমি ভুল ইংলিশ বলে ফেলেছি। কিছু মাইন্ড করিস না। অনেক দিনের ওব্যেস তো, তাই।"

ভিড় কাটিয়ে ওরা সবাই খুড়োর বাড়ির ভেতর ঢুকে যা দেখল তাতে সকলের হার্ট অ্যাটাক হবার জোগাড়। উঠোনের ঠিক মাঝখানটায় একটা লাল শামিয়ানা টাঙানো। তার নীচে একটা বাঘছাল পেতে চোখ বুঁজে বসে আছে সেই তান্ত্রিকটা। সামনে প্রচুর ফল আর মিষ্টির প্যাকেট। একটা তামার পাত্রে বেশ কিছু দশ আর পাঁচ টাকার নোট পড়ে আছে। দুটো হাফ-প্যান্ট পরা ছেলে টাকাগুলো গুছিয়ে একটা ফোলিও-ব্যাগের ভেতরে রাখছে।

পঞ্চা ফিসফিস করে বলল, "ও দুটো ডুগি-তবলা নাকি রে? ভালো করে চেক করতো! নিশ্চয় খুড়ো ডেকে এনে ওদের কাজে লাগিয়েছে।"

ফতুদা ভালো করে দেখবার জন্য পাঞ্জাবির হাতাটা গুটোতে গুটোতে যেই একটু এগিয়েছে অমনি তান্ত্রিকের বজ্রনির্ঘোষ হুঙ্কার—"জয়-ত্-তারা, জয়-ত্-তারা। মা রুদ্রকালী বগলাময়ী।" তারপর ফতুদার দিকে তাকিয়ে বলল—"মায়ের আদেশে আমাকে এখানে থাকতে হবে। মধুর পাওয়া স্বপ্নাদেশ ফেলা যায় কখনও? তোদের ক্লাবঘর আর হচ্ছে না। মায়ের আদেশ কি উপেক্ষা করা যায়?—নে, প্রসাদ খা। মাকে প্রণাম কর। তোর নাম তো ফতু, ভালো নাম বিপ্লব বটব্যাল—তাই না?"

ফতুদা হ্যাঁ, না কী বলবে ঠিক করতে পারল না। শুধু আমতা আমতা করে বলল, "না মানে, মধুখুড়ো, মানে মধুসূদন বটব্যাল, যার বাড়ি এটা, সম্পর্কে আমার জ্ঞাতি। তা, উনি কোথায় গেলেন? উনি তো বলেছিলেন ওনার ডান দিকের বড়ো ঘরটা আমাদের দেবেন ক্লাবঘর করার জন্য।"

মুহূর্তের মধ্যে তান্ত্রিকের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে গেল। সামনে রাখা একটা হোমকুন্ডের মধ্যে ডানপাশের থালা থেকে তুলে নেওয়া ধুনোর গুঁড়ো একমুঠো দিতেই দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। ফতুদাসহ ওদের পাঁচজনেরই ভয়ে হাত-পা বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। ফতুদার ইঙ্গিতে সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ে সাধুবাবার পায়ের ধুলো ডানহাতে

নিয়ে জিভে ঠেকাল। তারপর বলল—"বাবা, আমাদের অন্যায় হয়ে গিয়েছে। এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। আমরা আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই খুড়োর মতো।"

"তথাস্তু" বলে সাধুবাবা একটা পাত্র থেকে তেলমাখানো নিয়ে সিঁদুর ডানহাতের মধ্যমা দিয়ে সকলের কপালে তিলক এঁকে দিল। তারপরে প্রত্যেকের হাতে একটা করে হরতকি দিয়ে বলল—"নে, চিবিয়ে খা। সিদ্ধি লাভ হবে। এবার বাড়ি যা, বিকেলের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। টিফিনের জন্য চিন্তা করিস না সময়মতো পেয়ে যাবি। শুধু তিনবার তালি দিয়ে 'মট্‌মট্‌, ধুপ্‌ধুপ্‌, খুট্‌খুট্‌ বুহীন বুড়ো' মন্ত্রটা বলবি। যা চাইবি, তাই পাবি। এখন যা, বাড়ি ফিরে যা। তবে হ্যাঁ, মন্ত্রটা যখন তখন, যেখানে সেখানে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে যাসনে। কাজ হবে না।" আর একদফা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সবাই বাইরে এল।

ফতুদা বলল, "সাক্ষাৎ ভগবান, দেখলি তো! বলেছিলাম না—যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

পঞ্চা গম্ভীরভাবে বলল—"যোগসিদ্ধ, না আলুসিদ্ধ! তখনই আমার খটকা লেগেছিল। বারোটা কচুরি আর ছ'খানা জিলিপি দু'মিনিটে সাবাড়। এরকম কচুরি সাঁটাতে তো একজনকেই দেখেছি আমরা।"

ফতুদা বলল—"এসব বলিস না। শাপ দিয়ে দিলে মুশকিল হবে। তাছাড়া, বিকেলের টিফিনের ব্যাপারটাই কেঁচিয়ে যাবে।"

"তুমি থামো তো।" পঞ্চা খেঁকিয়ে উঠে বাঁটুলকে পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কী সব বলল। বাঁটলোও হাত-পা নেড়ে সায় দিল।

পঞ্চা আর বাঁটলো বলল—"নেদো, রোবে, তোরা একটু থাক। আমরা আধঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসছি।" কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ওরা চলে গেল।

আধঘণ্টার জায়গায় একঘণ্টা হয়ে গেল। ফতুদা অধৈর্য হয়ে বসে পড়েছে। দর্শনার্থীরা সবাই চলে গেছে। খুড়োর বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা জিপ থেকে দুজন পুলিশ ইনস্পেক্টর নেমে সটান খুড়োর বাড়ির ভেতরে গিয়ে সাধুবাবার সামনে দাঁড়ালেন! ফতুদা, নেদো আর রোবে পেছনে পেছনে গিয়ে একটু দুরে দাঁড়িয়েছে।

একজন ইনস্পেক্টর সাধুবাবাকে বললেন, "আপনার বাঁ হাতের আলখাল্লার হাতটা গোটান তো!"

সাধুবাবার তখন মুখের চেহারাটাই পালটে গেছে। ঠোঁট ঝুলে গেছে। চোখে-মুখে ভয়। একজন ইনস্পেক্টর বললেন, "খুব ভড়কি দিয়েছ খুড়ো। পঞ্চার চোখকে ফাঁকি

দেওয়া সহজ নয়। যখন সিঁদুরের তিলক পরাচ্ছিলে তখনই বাঁ হাতের উল্কিটা আমি দেখে ফেলেছিলাম—মধুসূদন বটব্যাল লেখা। তাছাড়া অতগুলো কচুরি খাওয়া আর সাধুর পায়ে কেড্‌স দেখেই সন্দেহ হয়েছিল যে খুড়ো নতুন চাল দিয়েছে।''

পঞ্চা আর বাঁটলো টুপি এবং গোঁফটা খুলে একচোট অট্টহাসি হেসে নিল। তারপরে বলল—''কী খুড়ো, কেমন জব্দ! ক্লাবঘর না দিয়ে চারমূর্তির হাত থেকে রেহাই পাবে ভেবেছ? সাধুবাবার পায়ে কেডস থাকলে নকল সাধু বলে সন্দেহ হয়।''

ফতুদা বলল, 'পঞ্চু, মন্ত্রটা একবার ট্রাই ক'রে দেখনা, জালি কি-না বোঝা যাবে!''

পঞ্চা বলল—''ধ্যুৎ তুমি খেপেছ? 'মটমট' এর 'ম', 'ধুপ্‌ধুপ্‌'-এর 'ধু' 'খুট্‌ খুট্‌'-এর 'খু' আর 'ব-হীন বুড়ো' মানে 'বুড়ো' শব্দটা থেকে 'বু' বাদ দিয়ে দাও। কী থাকে?—'ড়ো'—সব মিলিয়ে 'ম-ধু-খু-ড়ো'।''

নেদো ''ইনটেলিজেনটাল'' বলেই জিভ কেটে বাঁটলোর দিকে তাকিয়ে বলল—''আবার ভুল হল, না রে? কী হবে বলতো?''

''তোর মুণ্ডু আর মাথা।' বাঁটলো বলল—''খুড়ো, মায়াবিনী ড্রেসার্স থেকে পুলিশের ইউনিফর্ম আর গোঁফ-চুল ভাড়া করেছি। দশটা টাকা ছাড়ো। বিকেলের টিফিন বাবদ পঞ্চাশ টাকা, আর হয়রানি এবং টেনশন বাড়ানোর জন্য চল্লিশ—মোট একশো টাকা দাও।''

খুড়ো বিছানার তলা থেকে একটা আট-ভাঁজ করা একশো টাকার নোট বার করে বাঁটলোর হাতে দিয়ে বলল—''নে, তোদের দিয়েই আমার আনন্দ। আমার আর কে আছে বল! ক্লাবঘর করে ফ্যাল। শেষ বয়েস তো হয়েই গেল আমার। একটু দেখিস যেন কুকুর শেয়ালে না খায়!''

খুড়োর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেছে।

ওরা পাঁচজনেই নিচু হয়ে খুড়োর পায়ের ধুলো নিল।

মধুখুড়ো নট আউট

কথা ছিল সাড়ে আটটা নাগাদ সবাই যুগলের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবে। দশটা থেকে ম্যাচ। রামনগরে ব্যারিস্টারের মাঠে। সকালবেলাতেই বাঁটুল আর পটলাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মাঠটাকে ঠিকঠাক করে পিচের ওপর থেকে চোরকাঁটাগুলোকে তুলে ফেলে চুন দিয়ে ক্রিজের দাগগুলো টেনে রাখবে। গতকাল সন্ধের সময় ক্লাবের জরুরি টিম মিটিং ছিল। ক্লাবের কোচ ফতুদা পই পই করে পাখি পড়ানোর মতো করে বলে দিয়েছে—"দেখিস এই ম্যাচটা জিততেই হবে। প্রেস্টিজ ফাইট। টসে জিতলে ফিল্ডিং নিতে হবে। কুড়ি ওভারের ম্যাচ। স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা মুশকিল। সুতরাং পরে ব্যাট করলে রান চেজ করার সুবিধা অনেক।" ভুট্টো যেই বলে উঠেছে—"কিন্তু রামনগরের টিমে যে চার পাঁচজন গোদা গোদা ছেলে আছে। আমাদের কি..., অমনি ফতুদা, রেগে গেলে যা হয়, পাঞ্জাবির হাতাদুটোকে প্রায় বগল অবধি গুটিয়ে ক্যারাম বোর্ডের ওপর দুখানা পরপর ঘুঁষি মেরে বলল—"চুপ কর কাওয়ার্ড, অত যদি ভয় থাকে তবে ম্যাচ নিয়েছিলি কেন? শচীনকে ট্রাইকস ফুলটস দেয় না হাফভলি দেয়? ওর তো প্রায় বাপের বয়েসি।" ফতুদা এমনভাবে 'শচীনকে' বলল যেন মনে হল শচীন আমাদের ক্লাবেই খেলে। তবু ফতুদার মুখের ওপর কথা বলার ক্ষমতা কারোর নেই।

ন'টার সময় ফতুদা এসে সাইকেল থামাল। ধবধবে সাদা জামাপ্যান্ট, মাথায় কাউন্টি ক্যাপ ; পায়ে কেড্‌স, নীল ডোরাকাটা সাদা রিস্টব্যান্ড। ফতুদার এই জিনিসটা আছে। ক্রিকেটের আর এক নাম যে ডিসিপ্লিন ফতুদাকে দেখলেই বোঝা যায়। সারা জীবনে যার হায়েস্ট স্কোর সতেরো, তার কেতা দেখলে অবাক হতে হয়। দোকানের সিমেন্টের বেঞ্চির ওপর বাঁ পাটা রেখে সাইকেলে বসেই ফতুদা বলল—"নে, তোরা এসে গেছিস।" তারপর পঞ্চুকে ডেকে বলল—"তুই তো আজকের ক্যাপটেন। প্লেয়ার্স লিস্টটা ফাইনাল করে ফ্যাল।" পঞ্চু একবার এদিক-ওদিক দেখে নেদোর পিঠের ওপর স্কোর লেখার খাতাটা রেখে পেন্সিল নিয়ে রেডি হয়েছে, ফতুদা বলে উঠল—"শোন, বাঁটলো আর রবিকে দিয়ে ওপেন করাবি। তিন নম্বরে তুই নামবি। চার নম্বরে পটলা,

পাঁচ নম্বরে ভুট্টো, ছ'' নম্বরে নেদো আর লাস্ট নামবে, লাস্ট নামবে...।'' ফতুদাকে চুপ করে যেতে দেখে সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ফতুদা কিছু বলার আগেই ভুট্টো বলল—''ডুগি। আর রিজার্ভ থাকবে তবলা।''

''দ্যাট্‌স রাইট। কিন্তু ডুগি বা তবলা কাউকেই দেখছি নাতো। কেউ নিয়ে বাজাতে বসে গেল নাকি!''

ফতুদার কথায় সকলের চমক ভাঙল। সত্যিই তো এতক্ষণ কারোর খেয়ালই হয়নি যে ওরা দুই ভাই আসেনি। পঞ্চু বলল—''এ রকম তো হবার কথা নয় ফতুদা। ওরা বেশ ভালো মতোই জানে যে আজ ম্যাচ।''

রবি বলল—''আরে কাল সন্ধেবেলায় তো আমি ওদের দেখেছি বুধো দত্তর রেশন দোকানের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে...।''

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে নেদো বয়স্ক লোকদের মতো হাতদুটো পেছনে নিয়ে বলল—''আমার যেন কী রকম ডাউটফুল হচ্ছে। কাল বিকেলে একবার আমি ওদের টু ব্রাদার্সকে মধুখুড়োর সঙ্গে কেষ্টর স্নেক্‌স বারটার সামনে কিছু অ্যাটেনশলি ডিসকাস করতে দেখছি। আমার যেন ঠিক ভালো বলে মনে...।''

''চুপ কর তো। আর সাহেবের মতো ইংরাজি ঝাড়তে হবে না।'' তারপর পঞ্চুর দিকে ফিরে গম্ভীর মুখে বলল—''শোন, যে ভাবেই হোক, অ্যাট অল কস্ট, ডুগি তবলাকে খুঁজে বার করতে হবে। তোরা সাইকেল নিয়ে এক একজন এক একদিকে বেরিয়ে পড়। আধঘণ্টার মধ্যে তুলে আনা চাই। মনে রাখবি ওদের না হলে টিম করতে পারব না।''

''পারবে পারবে। ঘাবড়িয়ো না। তোমরা ইয়ংম্যানরা এত অল্পেতে ঘাবড়াও না কী বলব। আমাদের সময় তো একজন দু'জন হলেই টিম হয়ে যেত। একটা সেঞ্চুরি আর পাঁচটা উইকেট তো আমাদের বাঁধা ছিল।''

সবাই এক সঙ্গে পিছনে তাকাতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। সাদা প্যান্ট আর 'আদিদাস' লেখা একটা সাদা গেঞ্জি আর ইটরঙের কেড্‌স প'রে মধুখুড়ো এক মুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

''যুগল, কড়াইতে কী ভাজছ? কচুরি? দাও, ছেলেদের সবাইকে চারখানা করে দিয়ে দাও। আর হ্যাঁ, ডালটা একটু বেশি দিয়ো। তোমার তো আবার হাতে ওঠে না। শোনো, দুটো করে পক্কান্নও দিও। এই তো খাবার বয়েস। তার ওপরে আজ ওদের ক্রিকেট ম্যাচ।''

মধুখুড়োর এমনতর কথাতে সবাই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। খুড়ো বলে কী! একটা ফুটো পয়সাও যার হাত দিয়ে গলানো শক্ত সে কিনা কচুরি পক্কান্নর অর্ডার দিয়ে বসল। তাও আবার চারটে করে।

নেদো বরাবরই ডাকসাইটে। লঘু-গুরু মানে না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—"কী ব্যাপার খুড়ো! কেড্‌সটা না হয় বুঝলাম তোমার মিলিটারি চাকরির। কিন্তু প্যান্ট গেঞ্জিটা? তাও আবার 'আদিদাস' লেখা। কত দিয়ে ভাড়া করলে?"

"কী যে বলিস। কিনেই ফেললাম। প্রেস্টিজ ম্যাচ বলে কথা। ক্লাবেরও তো সুনাম বদনাম বলে একটা জিনিস আছে। কী বলো ফতু তাই না?"

ফতুদা বিরক্তভাবে বলল—"ঠিক বুঝলাম না। ক্লাবের ম্যাচ, তাতে আপনার সাদা জামা প্যান্ট কিনে প'রে ফেলার কী হল? আম্পারায়িং করবেন নাকি?"

"কী যে বলো ফতু। গদগদ হয়ে মধুখুড়ো বলতে শুরু করল, "পাড়ার ক্লাবের ম্যাচ। প্লেয়ারের অভাবে টিম হচ্ছে না, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব। এ হতে পারে না। কাল বিকেলেই ডিসিশন নিয়ে নিয়েছিলাম, যখন বুঝলাম ডুগি আর তবলার যা শরীরের অবস্থা তাতে আজ কেন আগামীকাল বিকেলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। আরে বাবা, বুড়ো হয়েছি তাই কি? এখনও মাঠে নামলে সোবার্সও পালাবে। আমেদ খাঁ, ধ্যানচাঁদকে জিগ্যেস করে আয়। কই হে যুগল, ছেলেদের দিয়েছ? গরম দেখে ফুলকো দেখে দিয়েছ তো?"

নেদো রেগে গিয়ে বলল—"কী উলটো-পালটা বকছেন? আমেদ খাঁ ধ্যানচাঁদ আবার ক্রিকেট খেলল কবে?"

"সে যাই হোক। কই হে পঞ্চু, প্লেয়ার লিস্টে সাত নম্বর নামটা লিখে ফ্যালো মধুসূদন বটব্যাল। এই নাও বাবা পাঁচটা টাকা রাখো। একটা নতুন বল তো কেনা দরকার।"

ফতুদা ততক্ষণে ফিউরিয়াস। শার্টের হাতা দুটো গুটিয়ে নিয়ে দোকানের বাঁশের খুঁটিতে পরপর দুখানা ঘুঁষি মারতেই বাতার ওপরে রাখা মুড়ো ঝ্যাঁটাখানা ছিটকে পড়ল ছোলার ডালের কড়াইয়ের মধ্যে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ফতুদা বলে উঠল—"আমাদের টিম হচ্ছে না, মশাই তাতে আপনার দরদ উথলে উঠছে কেন শুনি। কে নিচ্ছে আপনাকে? টিম না হলে আমি নামব। দরকার হলে ছ'জনে খেলব। তা বলে আপনাকে নেবো না।"

"সেটা কি ভালো দেখায় ফতু! কোচ খেলতে নামলে লোকে কী বলবে? নাও, নাও, সব তৈরি হয়ে নাও। আবার খেয়ানৌকা বন্ধ হয়ে যাবে কখন। ব্রিজ দিয়ে যেতে সময় লাগবে। এসো, এসো, পঞ্চু, নেদো। ভুট্টোটা কোথায় গেল। তবে হ্যাঁ, টসে জিতলে ফিল্ডিং নিয়ো।"

খুড়োকে নাছোড়বান্দা দেখে সবাই সিদ্ধান্ত নিল যে খুড়োকে ডুগির জায়গায় রাখা হবে। তবে বোলিং করতে দেওয়া নেই। এক ওভার বল করতে দেওয়া মানেই ছত্রিশ রানের বাড়তি বোঝা ঘাড়ে নেওয়া।

টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। ফতুদা খুড়োকে এক ধমক দিয়ে বলল—"শুনুন, আপনাকে ফিল্ডিং করতে হবে না। নেদোর ভাই ভ্যাবলাকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব। আপনি বরং একটু ঘুরে আসুন। ব্যাটিংয়ের সময় আসবেন।"

খুড়ো আমতা আমতা করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। ফতুদার অগ্নিমূর্তি দেখে সুড়সুড় করে কেটে পড়ল।

রামনগর টিম সাতান্ন রানে অল আউট হয়ে গেল। বাঁটলো আর রবি ফাস্ট উইকেটে বত্রিশ রান করল। দু' উইকেটে সাতচল্লিশ। সবাই ধরে নিয়েছে জয় হাতের মুঠোর। ঝটপট দুটো উইকেট পড়ে গেল। চার উইকেটে চুয়ান্ন। ফতুদা খুড়োর খোঁজ করছে। নেদোটা যদি একটা চার মারে তো ভালো। আউট হয়ে গেলেই খুড়োকে নামাতে হবে। চারটে রান করতেই হবে।

হঠাৎ নেদো উঁচু করে একটা শট মেরেছে। স্কোয়ার লেগের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বল। নির্ঘাত ছয়। ফতুদা, পঞ্চু, পটলা সবাই মাঠে ঢুকতে যাবে। রবি চিৎকার করে উঠল—"থ্রি চিয়ার্স ফর 'আমরা ক'জন' ক্লাব, থ্রি চিয়ার্স ফর নেদো।"

হঠাৎ সবাই চুপ। নেদো আউট। বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ ধরেছে একজন ফিল্ডার। ফতুদা গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখা গেল খুড়ো ডান হাতটা উঁচু করে হরিণের মতো ছুটে আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—"দেখলি বুড়ো হাড়ের ভেলকি। পারবি এ রকম হাই ক্যাচ ধরতে? বলেছিলাম না সোবার্সও আমাকে সমঝে চলে।"

এতক্ষণে কারোরই আর বুঝতে বাকি রইল না যে নেদোর মারা নিশ্চিত ওভার বাউন্ডারিটা খুড়োই বরবাদ করেছে। সেই সঙ্গে একেবারে হাতের মুঠোয় জিৎটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

পঞ্চু এসে ফিসফিস করে ফতুদাকে জিজ্ঞেস করল—"কী করবে? প্লেয়ার্স লিস্টে

তো খুড়োর নাম দেওয়া নেই। ডুগিরই নাম আছে। খুড়োকে তো সবাই চেনে। ডুগি বলে চালাতে গেলে তো মার খেতে হবে। বাঁটলোকে অবশ্য পাঠিয়েছি ডুগিকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে আসার জন্য।"

বলতে বলতে বাঁটলো ডুগিকে নিয়ে হাজির। ফতুদা একরকম ঠেলেই ডুগিকে ব্যাট হাতে মাঠে পাঠিয়ে দিল।

খুড়ো বলল—"আমি তা হলে এর পরেই নামব। কী বল?"

"আর নামতে হবে না। এটাই লাস্ট উইকেট।"

প্রথম বলেই ডুগির ছক্কা। আমবাগানের মধ্যে বল। সবাই হুড়মুড় করে মাঠের মধ্যে ঢুকে ডুগি আর ভুট্টোকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এল।

ডুগির মুখ থেকে শোনা গেল কাল বিকেলে খুড়ো ওদের তিরিশখানা ফুচকা খাইয়েছিল। ব্যস! রাত্তির থেকে দু'ভাইয়ের অসহ্য পেট ব্যথা। আজ বারোটা পর্যন্ত বত্রিশবার ছোটোঘরে যেতে হয়েছে। ফতুদা শার্টের হাতা দুটো বগল অবধি গুটিয়ে খুড়োকে এই মারে তো সেই মারে।

খুড়ো মুখখানা লরি চাপা পড়া ব্যাঙের মতো করে বলল—"সরি ফতু, আমি বুঝতে পারিনি যে ওটা নেদোর ক্যাচ। ওরা যে অনেক আগেই আউট হয়ে গিয়েছে আর ওই ছয়টা হলে আমরা জিতব এটা বুঝিনি।"

"আর ডুগি তবলার ব্যাপারটা। ওটাও কি না বুঝে করেছিলেন?

"কী আর করব। ওরা ছেলের মতো। ফুচকা খেতে চাইল। তাছাড়া ডুগি বলেছিল একটা কাপ-আইসক্রিম খাওয়ালে আজ মাঠে আসবে না। তাই হজমি বলে ওদের দুটো জোলাপের বড়ি খাইয়ে দিয়েছিলাম।"

"ক্রিমিনাল। এখন ছাড়ুন তো পঞ্চাশ টাকা। খেসারত দিন।" দাঁতে দাঁতে চেপে ফতুদা বলল।

"একটু বেশি হচ্ছে না কি? এমনিতেই ধরো জামা প্যান্ট ভাড়া চার টাকা, যুগলের দোকানে দশ, বল কেনার জন্য পাঁচ টাকা, ডুগি তবলার পেছনে সাড়ে সাত—মোট সাড়ে ছাব্বিশ। যাকগে, তিরিশটা টাকা রাখ। আর হ্যাঁ, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে মুশকিল।"

সবাই একসঙ্গেই বলে উঠল, "মধুখুড়ো জিন্দাবাদ, মধুখুড়ো নট আউট।"

ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার

স্টেশনে এসে দীপ্তপ্রদীপের মনে হল ফুলপিসিমার কথাটা শুনলেই ভালো হত। বেরোবার আগে পইপই করে বলেছিল—"দীপু, সন্ধের সময় রওনা না দিলেই নয়? এখন বেরোচ্ছিস, কাজটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। এখন তো কোনো বাসও পাবি না। ট্রেন আছে ছটা নাগাদ। লালগোলা প্যাসেঞ্জার। তার তো টাইমের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। গতকালের গাড়ি আজকে আসে আর আজকের গাড়ি আসে আগামীকাল। বিশেষ করে ছটার ট্রেনটা রোজই ভীষণ লেট করে। আজকের রাতটা থেকে কাল ভোর ভোর গেলে কি খুব অসুবিধা হবে?"

ফুলপিসিমার কথায় কান না দিয়ে দীপ্তপ্রদীপ বলেছিল—"কী যে বল পিসিমা, কত রাত আর হবে পৌঁছতে, বড়ো জোর বারোটা। কলকাতা শহরে বারোটা আর এমনকি রাত। আমি যখন জামশেদপুরে পোস্টেড ছিলাম প্রতি শনিবারে ইস্পাত এক্সপ্রেসে বাড়ি ফিরতাম। ট্রেনটা প্রায় দিনই ভীষণ লেট করত, একেকদিন হাওড়ায় এসে পৌঁছতেই রাত্তির বারোটা বেজে যেত। তারপর ট্যাক্সি ধরে বাড়ি আসতে একটা।"

"অত রাত্তিরে আসতিস ভয় করত না? একটার সময় তো রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে যায়। চোর-ডাকাতের ভয় না থাকুক, ভুত-প্রেতের ভয় তো থাকে মানুষের। কলকাতায় তো শুনেছি, কাগজেও পড়েছিলাম দু-একবার, মাঝরাত্তিরে রেসকোর্সের কাছে গাড়ি থামিয়ে সুন্দরী মেয়ে গাড়িতে উঠে ন্যাশানাল লাইব্রেরি না কোথায় যেন হঠাৎ নেমে আচমকা উধাও হয়ে যায়। তোর কখনও এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি? শুনিসওনি কখনও?"

দীপ্তপ্রদীপ হাসতে হাসতে বলেছিল—"কী যে বল ফুলপিসিমা, কোনো সুন্দরী মেয়ের দেখা পাওয়া আজ অবধি আমাদের কপালে জোটেনি। ঘটনাটা একেবারে শুনিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। তবে আমার কখনও এই অভিজ্ঞতা হয়নি।"

ফুলপিসিমা বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিল—"তার মানে তুই ভূত-প্রেত অপদেবতা এসব মানিস না একেবারে। তবে অত সাহস ভালো নয়। তুই না মানলে কি ভূত-প্রেতের

অস্তিত্ব উঠে যাবে দেশ থেকে? ভূত-প্রেত আগেও ছিল, এখনও আছে। আমাদের গ্রামেই তো প্রায়ই কাউকে না কাউকে ভূতে ভর করে। ওঝা-গুনিন না করলে ঘাড় থেকে ভূত নামেই না।"

"তোমরা সেকেলে লোক, ভূত-ফুতে বিশ্বাস কর। আমি করি না। আমার ভয় শুধু মানুষভূতকে। ভূত বলে কিছু আছে নাকি?"

একরকম ফুলপিসিমার সঙ্গে ঝগড়া করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল দীপ্তপ্রদীপ। স্টেশনে এসে গাড়ির সময় লেখার বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে দেখল এক ঘণ্টা লেট। তার মানে এখান থেকে ছাড়তে ছাড়তে সন্ধে সাতটা, মানে কলকাতায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত বারোটার আগে নয়। মনে মনে বলল—ও কিছু নয়, বারোটা একটার সময় অনেক দিনই ফিরেছে। হাতেও এমন কিছু ভারী মালপত্তর নেই। শিয়ালদায় নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিলেই হবে।

স্টেশনে লোকজন প্রায় নেই বললেই হয়। একটা ফাঁকা বেঞ্চি দেখে ব্যাগটা পাশে রেখে হাত পা ছড়িয়ে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেওয়া যাক।

ট্রেন আসতে আসতে সোওয়া সাতটা হয়ে গেল। মোটামুটি ফাঁকাই বলা যায়। জানলার দিকে একটা সিট নিয়ে ব্যাগটা বাঙ্কের ওপরে রেখে গুছিয়ে বসতে না বসতে লম্বা একটা হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। কৃষ্ণনগর স্টেশনে ট্রেনটা যখন পৌঁছল হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দীপ্তপ্রদীপ দেখল সাড়ে দশটা। মনে মনে হিসেব করে নিল শিয়ালদায় পৌঁছাতে যদি আড়াই ঘণ্টাও লাগে তা হলেও খুব বেশি হলে একটা। শিডিউলের মধ্যেই আছে ভেবে মনকে আশ্বস্ত করল। একটু খিদে খিদে পাচ্ছিল। প্ল্যাটফর্ম থেকে দু'খানা ঠান্ডা শিঙাড়া আর এক ভাঁড় চা খেয়ে বাঙ্ক থেকে ব্যাগটা নামিয়ে একটা বই বের করে পড়তে শুরু করল। কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ বুঝতে পারল একটা বড়ো স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সোওয়া এগারোটা। কামরার মধ্যে যাত্রী বিশেষ নেই। তিনচারজন ভেন্ডারশ্রেণির লোক, যারা শিয়ালদা মার্কেটে যায় জিনিস কিনতে, বড়ো বড়ো ঝুড়ি নিয়ে মাটিতে গোল হয়ে বসে আছে। দীপ্তপ্রদীপের বেঞ্চে একজন এবং সামনের বেঞ্চটাতে একজন ছাড়া গোটা কম্পার্টমেন্টে আর লোক নেই। যাক, তবু তো একদম একা একা যেতে হবে না এই ভেবে মনটা খুশিখুশি হয়ে উঠল। দীপ্তপ্রদীপ আবার বই পড়ায় মন দিল।

পড়তে পড়তে বেশ তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। আচমকা খেয়াল হল একটা অন্ধকার জায়গায় ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। এটা কোনো স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নয়। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। মাঝেমাঝে কয়েকটা জোনাকির আলো ছাড়া কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। অনেক দূরে দু-একটা বিন্দুর মতো আলো দেখা যাচ্ছে। বোধহয় চাষিটাসিদের কুঁড়ে ঘর থেকে আসছে। কামরার ভেতরে দৃষ্টি ফেলে দেখল গোটা কামরাটা ফাঁকা। একটাও লোক নেই। এতগুলো লোক কখন যে নেমে গেল, কোথায় গেল, কিছুই বুঝতে পারল না। অন্তত জায়গাটা কোথায় সেটা জানতে পারলেও একটু আশ্বস্ত হওয়া যেত। উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল কেউ কোথাও গুটিসুটি মেরে বসে আছে কি না। না, কেউ নেই, গোটা কামরাটা ফাঁকা। ধু-ধু করছে। শুধু একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে।

এই প্রথম গাটা একটু ছমছম করে উঠল দীপ্তপ্রদীপের। বেরোবার সময় পিসিমার বলা কথাগুলো মনে পড়ল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য ভাবল একটু হাঁটাচলা করা যাক, সেইসঙ্গে দরজাটাও বন্ধ করে দেওয়া যাক। বলা তো যায় না, রাত তো কম হল না। দরজার কাছে গিয়ে দেখল দুটো দরজাই হাট করে খোলা। বন্ধ করতে গিয়ে দেখল দুটো দরজার ছিটকিনিই ভাঙা। বাইরে বেশ জোরে হাওয়া বইছে। যতবার দরজার পাল্লাটা বন্ধ করতে যায় হাওয়ার বেগে ততবার খুলে যায়। পরের খোপটায় গিয়ে দেখল সেটারও দরজা দুটোর একই হাল। এইবার রীতিমতো ভয়ভয় করতে লাগল। এতক্ষণ যেটা ভাববে না বলে ঠিক করে রেখেছিল সেটাই চোখের সামনে ভেসে উঠল। অবিকল সেই ছবি, কাঁঠালগাছের ডাল থেকে দিবাকরের দেহটা ঝুলছে। পরনে লুঙ্গি, খালি গা, জিভটা অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে। ইঁদারার দড়িটা গলায় আঁট হয়ে বসে আছে। জোরে পা চালিয়ে এসে সিটে বসে পড়ল দীপ্তপ্রদীপ। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ব্যাগের মধ্যে জলের বোতল আছে, বার করে যে খাবে সে শক্তিও নেই। শরীরের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাহস কে যেন ব্লটিংপেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে। কোনো রকমে শক্তি সঞ্চয় করে জলের বোতলটা বার করল। একদম তলানিতে এসে ঠেকেছে। কখন যে খেয়ে ফেলেছে খেয়ালই নেই। যেটুকু ছিল একফোঁটা গলায় ঢেলে বাকিটা হাতে ঢেলে চোখে এবং ঘাড়ে দিল। একটু আরাম হল। পাশে রাখা বইটা তুলে নিয়ে চোখ রাখল।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। দীপ্তপ্রদীপের ফুলপিসিমা লালগোলার কাছে পিরতলা নামে একটা গ্রামে থাকেন। বহু দিন বিধবা হয়েছেন। বাগান-পুকুর সহ বিঘেখানেক জায়গা নিয়ে স্বামীর ভিটে। মস্ত বড়ো বাড়ি, অনাদরে অবহেলায় অযত্নে পোড়োবাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের ছেলেপুলে নেই বলে দীপুই তাঁর প্রাণ, উত্তরাধিকারীও বটে। দিবাকর নামে একটা ছেলে অনেকদিন থেকে ওনার কাছে ছিল, বলতে গেলে ছোটো বয়স থেকে। নিজের হাতে বিয়ে দিয়েছেন। একতলাটা পুরো ওদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে নিজে দোতলায় থাকেন। সেই ছেলে গত সোমবারে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পিসিমার ফোন পেয়েই দীপুর পিরতলায় যাওয়া এবং ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে সাতদিন পর আজ বাড়ি ফেরা।

"একটু বসতে পারি?"

চমকে উঠল দীপ্তপ্রদীপ। একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বছর তিরিশের একটা ছেলে। পরনে তেলচিটে চেক লুঙ্গি, গালে তিন চার দিনের না কামানো দাড়ি, বগলে একটা ময়লা পুঁটুলি। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল দীপ্তপ্রদীপ। কথা বলতে চেষ্টা করল, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না।

লোকটা এবারে গলাখাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল—"এখানটায় একটু বসব স্যার?"

"অ্যাঁ...হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ বসুন...অ্যাঁ, কে আপনি? কী নাম? কোত্থেকে এলেন?"

"আজ্ঞে আমি পঞ্চপ্রদীপ স্যার, এতক্ষণ পাশের কামরায় বসে ছিলাম। একদম ফাঁকা হয়ে গেল বলে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। তাই আপনার কাছে চলে এলাম। দু'জনে থাকলে একটু সাহস হয় কিনা, মানে যাকে হলে একটু আধটু কথা, মানে বাক্যালাপ করা যায়। তা ছাড়া ঐ কামরাটায় যা মশা না স্যার, কী বলব, একেবারে দাগড়া করে দিয়েছে।"

"বাড়ি কোথায় আপনার? এত রাতে কোত্থেকে আসা হচ্ছে? কী নাম বললেন যেন?"

"আজ্ঞে আমি পিরতলায় থাকি, আপনার, মানে আর কি, আপনার ফুলপিসিমার বাড়ির খুব কাছেই। আপনাকে আমি চিনি স্যার। আর আমার নাম পঞ্চপ্রদীপ।"

দীপ্তপ্রদীপের সিট থেকে মাটিতে পড়ে যাবার মতো অবস্থা প্রায়। শিড়দাঁড়া বেয়ে শীতল রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেন। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা হঠাৎ চলতে শুরু করল। লোকটাও দীপ্তপ্রদীপের মুখোমুখি সিটটাতে বসে পড়েছে।

"কথায় কথায় অত স্যার স্যার করছেন কেন? আমি কি আপনার স্কুলের বিজ্ঞানের টিচার নাকি? তা আপনি আমাকে চিনলেন কী করে, আমার নাম জানলেন কী করে, একেবারে ডাকনাম পর্যন্ত? আর হ্যাঁ, অত স্যার বলার দরকার নেই। আপনাকে আমি চিনি না, জানি না, কোনোদিন দেখিনি পর্যন্ত। আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই আপনার। চুপচাপ বসে থাকুন। আর হ্যাঁ, একটা স্টেশন এল, দেখুন তো কোন স্টেশন।"

"ব্যারাকপুর, স্যা....থুড়ি, ভুল হয়ে গেছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব, অনেকক্ষণ থেকে মাথার মধ্যে বিজগুরি কাটছে যদি কিছু মনে না করেন, মানে যদি অপরাধ না নেন।"

"আরে বাবা, অত ভ্যান্তারা করার কী আছে কী? বলেই ফেলুন না খোলসা করে।"

"বলছিলাম কি, মানে রাগ করবেন না তো, আপনি দিপুবাবু, ভূত-টুত নন তো? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।"

"তামাসা করার আর লোক পেলেন না? চুপ করে বসুন তো, জ্বালাবেন না দয়া করে।"

দীপ্তপ্রদীপ লোকটার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আবার বইটা তুলে নিয়ে মুখ আড়াল করল। মন থেকে ভয়টা কিছুতেই যাচ্ছে না। বইয়ের একটা অক্ষরও মাথার মধ্যে ঢুকছে না।

লোকটা হঠাৎ অবাক করার মতো একটা কথা বলে ফেলল। দীপ্তপ্রদীপকে চুপ করে যেতে দেখে গলার স্বরটা নামিয়ে নিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বলল, "বাঃ! আপনি তো দারুণ একটা বই পড়ছেন মশাই, ফেসেস অফ দি ভিজিটর্স। কেভিন র‍্যান্ডল অ্যান্ড রস এস্টেস-এর লেখা না? ওঃ অসাধারণ একটা লেখা! বলতে গেলে আমাদের নিয়ে লেখা, স্যার। মানে.....।"

"অ্যাঁ, কী বললেন? আপনাদের নিয়ে লেখা মানে?"

"না মানে বলছিলাম কি, দমদম আসছে, কিছু খাবেন? অনেকক্ষণ তো কিছু খাননি। দু'কাপ চা আনি।"

ট্রেন স্টেশনে থামতে লোকটা জানলা দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল এবং চোখের নিমেষে হাতটা লম্বা হয়ে গিয়ে পনেরো ফুট দূরের স্টল থেকে দু'কাপ চা নিয়ে বলল, "নিন, একটু গরম চা খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করুন। যা ধকল গেল সারা দিন।"

দীপ্তপ্রদীপ বিস্ফারিত চোখে দেখল সামনের লোকটা অবিকল দিবাকরের মতো দেখতে হয়ে গেছে। গলায় একটা গোল লাল দাগ। সারা শরীরে ভাল্লুকের দেহের মতো বড়ো বড়ো লোম, এমনকি হাতের তালুতেও। দীপ্তপ্রদীপের শরীরটা বেঞ্চে লুটিয়ে পড়ল।

"বাবু, উঠিয়ে, শিয়ালদা আ গিয়া। এক বাজ গিয়া। বহুত আরামসে নিদ হুয়া মালুম হোতা হ্যায়।"

দীপ্তপ্রদীপ দেখল সামনে লাল জামা পরা দু'জন রেলের কুলি। চোখদুটো কচলে নিয়ে ব্যাগটা নিয়ে ট্রেন থেকে নামল।

মনটা বেশ ফুরফুরে লাগল। পকেট থেকে চিরুনি বার করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে একটা গান ধরল গুনগুন করে।

অবিনাশবাবুর বাড়ি

পুলিন ডাক্তার বললেন—"অবিনাশবাবুর খবরটা একবার নেওয়া দরকার। যে মানুষ হাজার ঝড়জলেও মর্নিংওয়াক বাদ দেয় না, সে আজ তিন দিন হল....।"

ডাক্তারকে থামিয়ে দিয়ে অতীন বিশ্বাস রসিয়ে রসিয়ে বলতে শুরু করল—"দেখুন, আবার হয়তো অসুখে বিসুখে পড়েছে। যা হাড়কেপ্পন, ডাক্তার-ওষুধের পেছনে তো একটা কানাকড়িও খরচা করবে না। না হলে খোঁজ নিয়ে দেখুন হয়তো কোথাও বেড়াতে ফেড়াতে গেছে। গাঁটের পয়সা খরচ করে যাবে না এটা ঠিক। তবে ফোকটে সুযোগ এলে কোনো তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে ভিড়ে টিড়ে যেতে পারে। কয়েকটা দিনের খাওয়া খরচ, আলো জ্বালাবার খরচটা তো বাঁচবে। ওর মতো কিপটে এ তল্লাটে আমি দুটো দেখিনি।"

পুলিন ডাক্তার মুখে একটু উদ্বেগের ভাব ফুটিয়ে বললেন—"সে যা করছে তার বাড়িতে বসে করছে। ওর কিপটেমিতে আমাদের কারোর বা সমাজের কোনো ক্ষতি তো হচ্ছে না। সুতরাং এ সব আগডুম বাগডুম ভেবে লাভ কী? তার চে ওর বাড়িতে গিয়ে খবরটা কেউ নিলে ভালো হয়। সত্যিই যদি অসুখবিসুখ বা আপদ বিপদ কিছু হয় আমরা নিশ্চয় কাল যাব। কে যেন ওর বাড়ির কাছে থাকে বলেছিল—হ্যাঁ, বিভুই বোধ হয়। তাই না বিভু?"

বিভু মণ্ডলের বাজারের মধ্যে একটা ছোটো মুদিখানা-কাম-মনোহারী দোকান আছে। মাঝেমাঝে এটা আবার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হয়ে যায়। বিভুর বাড়ির বাগানের দু-চারটে নারকেল, পেয়ারা, আম, বাতাবিলেবু, ধুন্দুলের ছোবড়া, ওর বউয়ের দেওয়া বড়ি, আচার আমসত্ত্ব এসবও সময়ে অসময়ে পাওয়া যায়। কখনো বা বাড়ির হাঁস মুরগির ডিমও চলে যায়। দিশি ডিমের দামটাও একটু বেশি। বিভু অবশ্য বেশিরভাগ সময়ে বাজার থেকে পোল্ট্রির ডিম কিনে এনে একটু গোলাপি রঙে চুবিয়ে দিশি মুরগির ডিম বলে বিক্রি করে। যারা জানে তারা কিছু না বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

ডাক্তারের কথা শুনে বিভু গদগদ হয়ে বলল, "হ্যাঁ, কাকাবাবু, আমি যাওয়ার পথে

খোঁজটা নিয়ে যাব। মনে হয়, বাড়িতেই আছেন ক'দিন ধরে। ওর ছেলেদুটোকেও তো রাস্তাঘাটে দেখছি না ক'দিন।"

ললিত হালদার কাপড়ের খুঁট দিয়ে চশমাটা মুছে চোখে না লাগিয়ে বলল—"তুমি চেনো নাকি ওর ছেলেদের? ছেলেদুটো শুনেছি...বাপের পোড়া কপাল হলে যা হয়।"

বিভু যেন এরকম একটা লুজ বলই খুঁজছিল। চটপট বলল—"আর বলবেন না ললিতদা। ছেলে তো নয়। জ্যান্ত কুষ্মাণ্ড। অল্প বয়সে মা-মরা হলে যা হয় আর কি। বাবাটাও জন্মদুঃখী। অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে সংসারের হাল ধরেছিল। তারও কপাল মন্দ। এত বড়ো বিষয় সম্পত্তি বাগান পুকুর সামলানোই এখন দায় হয়ে উঠছে। ছেলেদুটোও হয়েছে, মানে আর কি, বংশের কুলাঙ্গার। লেখাপড়াও গোল্লায় গেল। ক্লাস ফোর ফাইভ অবধি টেনে ঘসটে অসৎ সঙ্গে মিশতে শুরু করল।"

"কী করে এখন? বাবার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করে? অবিনাশ তো শুনেছি আর বে থা...।"

ললিত হালদারকে থামিয়ে দিয়ে বিভু বাঁ হাতটাকে ওর মুখের সামনে তুলে বলল, "করবে আর কী। যা না বিষয় সম্পত্তি তার আবার দেখাশোনা। শুধু দেখতেই বড়ো। ও নুড়ো জ্বালতেও লাগবে না।"

"তার মানে? তেমন কিছু নেই বলছ।"

"না, সে রকম কিছু বলছি না। পৈতৃক বিষয় তো অবিনাশদার কম ছিল না। বসত ভিটেটাই তো বারো কাঠা জমির ওপর। এই বারো কাঠার চোদ্দ আনাই ভেঙে পড়ে আছে। বসবাসের অযোগ্য। সামনের দিকে দুটো তলা মিলিয়ে খান চার-পাঁচ ঘর নিয়ে ওরা থাকে। একটা ওর বাবার আমলের সর্বক্ষণের কাজের লোক আছে। বাজার-হাট-ধোপা-নাপিত, ঠাকুর ইত্যাদি বলতে সব ওই গিরিদাস না হরিদাস কী যেন নাম।"

পুলিনডাক্তার বুকপকেট থেকে ঘড়িটা বার করে চোখ বুলিয়ে বললেন, "তোমাকে মুখ খুলতে দিলে তো শেষই কর না। ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে থাকো। ছেলেদুটো কী করে তা তো বললে না। বয়স কত?"

নৃসিংহ উকিল বিচক্ষণ লোক। কম কথা বলেন। শোনেন অনেক বেশি। শহরে বেশ সুনাম প্রতিপত্তি আছে। এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন সব কথাবার্তা। বিভু কিছু বলতে শুরু করার আগেই উকিলমশাই বললেন—"ছেলেদুটোর কতই বা বয়েস।

আঠারো উনিশ হবে। যমজ ছেলেদুটোর জন্ম দিয়েই মা আর তাদের মুখ দেখতে পারেনি। এর কাছে তার কাছে ঠেলা খেয়ে ধাক্কা খেয়ে এখন এই এত বড়ো হয়েছে। অ্যাদ্দিন তো ভালোই ছিল। বছর খানেক হল ছেলেদুটো মনে হচ্ছে বিপথগামী হয়ে গেছে। আমাদের গ্রামের বাইরে ওই রামনগর, বরেন্দ্রনগর ওসব জায়গায় কিছু উটকো সমাজবিরোধী এসে আড্ডা জমিয়েছে। পুলিশের নজরে হয় পড়েনি, না হয় পুলিশ দেখেও না দেখার ভান করে আছে। বলছিলাম কি ডাক্তারবাবু, আপনাকে তো সবাই মান্য করে। ওই পথে গেলে থানার বড়োবাবুর কানে একবার কথাটা পেড়ে রাখবেন। বলা যায় না, আমাদের এদিকে আসতেই বা কতক্ষণ। অবিনাশের ছেলেদুটোকে আমি অনেকদিন দেখেছি ওই পাড়ার দিকে যেতে আসতে।"

পুলিনডাক্তার মুখ দিয়ে একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ শব্দ বার করে বললেন, "তাই নাকি। এ খবরতো জানতাম না। দেখে তো বোঝার উপায় নেই। মাঝে একদিন বলছিল ওরা দুভাই-এ নাকি কোনো সার্কাসের দলে কাজ পেয়েছে। এখন ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে। ওদের একজন তো, আমি জানি, একটু আধটু ম্যাজিকও জানে। এখানে ওখানে হুটহাট দেখিয়ে হাততালিও কুড়োয়।"

গোকুল পরামাণিক পাঁচবাড়ি ক্ষৌরকর্ম করে বেড়ায়। অকারণ দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল। পুলিন ডাক্তার বুঝতে পেরে বললেন—'বিভু, তুমি তা হলে অবিনাশবাবুর খবরটা নিয়ে কাল সকালের আসরে এসো। কাল রোববার আছে। সেরকম দরকার হলে আমরা কয়েকজন যাব ওঁর বাড়িতে। আজকের মতো আসর এখানেই শেষ। তোমাদের কত দেরি করিয়ে দিলাম, তাই না?"

দুই

বিভু মণ্ডলপরের দিন আগেভাগে এসে বসে আছে। আর বোধ হয় চেপে রাখতে পারছে না। কাল থেকে কাউকে বলতেও পারেনি। মাথার ওপর পিটুলি গাছটার ডালে অনেকগুলো পাখি কিচমিচ করছিল। বিশে হালদার ওর নৌকোটা খুলে মাঝ নদীতে লগি পুঁতে বেঁধে রাখল। এবার বাঁশের চাঁইগুলো এক এক করে তুলে দেখবে কী কী মাছ পড়েছে। ভোরের আলো ফোটার আগেই এক এক করে পুলিন ডাক্তার, ললিত হালদার, নৃসিংহ উকিল এসে হাজির।

পুলিন ডাক্তারের সঙ্গে একটা জোয়ান ছেলেও এসেছে। উনিশ কুড়ি বছর বয়স হবে। ব্যায়ামকরা পেটানো শরীর, কিন্তু বেশ বুদ্ধিদীপ্ত, সপ্রতিভ। ছেলেটার পিঠে ডান হাত দিয়ে হালকা চাপড় মেরে পুলিন ডাক্তার বললেন—"আমার ভাগ্নে, অগ্নীশ। দমদম ক্যান্টনমেন্টে থাকে। বি. কম. পাশ করে এখন সি. এ. পড়ছে।"

তারপর বিভুর দিকে তাকিয়ে বললন—"কই হে বিভু, খোঁজখবর পেলে কিছু? নাকি বুকনিই স্যার?"

বিভু কান এঁটো করা হাসিটা দেবার আগেই জিভ দিয়ে ঠোঁটদুটোকে চেটে নিয়ে বলল—"কী যে বলেন কাকাবাবু, এটুকু আর করতে পারব না। অবিনাশবাবুর অবস্থা খুব খারাপ। চেহারা আদ্দেক হয়ে গেছে। চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। আমাকে দেখেই জাপটে ধরে বললেন—'আমাকে বাঁচা। আমার পেছনে ভূত তাড়া করেছে। আমি আর বাঁচব না।' কাকাবাবু, আপনাকে অনেক করে যেতে বলেছে। বলেছে আপনি না গেলে উনি মারা যাবেন। ছেলেগুলোরও সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

পুলিন ডাক্তার কিছু বললেন না। গম্ভীর হয়ে রইলেন। নৃসিংহ উকিল জিজ্ঞেস করলেন—"ছেলেদুটোকে কেমন দেখলি? বাড়িতে ছিল?"

বিভুর চোখদুটো চকচক করে উঠল। নগদ কুড়ি টাকা পেয়েছে ছেলেদের কাছ থেকে। তা ছাড়া ফিরে আসার সময় দুখানা বোম্বাই সাইজের নারকেল, উঃ ভাবা যায়, কম করে আট টাকা। ভাগ্যিস শর্টকাট হবে বলে বাগানের ঝোপঝাড় ভেঙে আসছিল। একেই বলে কপাল, থুড়ি লাক।

বিভু লোভচকচকে ভাবটা সামলাবার জন্যে ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে দুবার ভিজিয়ে নিয়ে বলল—"দুই ভাই-ই বাড়িতে ছিল। বাবার জন্য চিন্তায় ওদেরও ঘুম নেই। ওরা, মানে আর কি, খুব স্বস্তিতে নেই। ওদের বাড়ির পেছনের দিকের ঘরগুলোতে নাকি, মানে আর কি, ক'দিন ধরে হঠাৎ হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে, গান শোনা যায়, ধূপ-ধুনোর গন্ধ আসে। তা, মানে আর কি, ওরাও খুব একটা পরোয়া করেনি প্রথম প্রথম। এই পরশু দিন, মানে আর কি....।"

অতীন বিশ্বাস রগচটা লোক। সারা জীবন ধানকল আর পাটের আড়তদারি করেছেন। অনেক লোক চরিয়েছেন। বিভুকে একটা কড়া ধমক দিয়ে বললেন—"কী তখন থেকে মানে আর কি, মানে আর কি করছ। ছেলেমানুষি কোরো না তো। বয়সের তো গাছ

পাথর নেই। এখনও দুটো কথা গুছিয়ে বলতে পার না। তাড়াতাড়ি প্রেসি করে বলো কী হয়েছে।"

লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে বিভু মাথাটা নিচু করে ফেলল। তারপর জড়তা কাটিয়ে বলল—"না, মানে আর কি, পরশুদিন থেকে ওদের শোবার ঘরেও তেনারা যাতায়াত শুরু করে দিয়েছেন। দিব্যি কথা বলছে হাসছে, খেলছে।"

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন—"তেনারা মানে কারা? কী পাগলের মতো বকছিস।"

"ওই যে কাকাবাবু যাদের লিকলিকে হাত-পা, চোখ দুটো গর্তে, দাঁতগুলো উঁচু উঁচু। যাদের সব সময় দেখা যায় না। যারা নাকিসুরে কথা বলে। যারা....।"

"হয়েছে, হয়েছে, এবার থামো।"

পুলিন ডাক্তারকে একটু চিন্তিত দেখাল। বুকপকেট থেকে ঘড়িটা বার করে একবার চোখ বুলিয়ে ললিত হালদার আর নৃসিংহ উকিলের মাঝখানে গিয়ে বসলেন। ফিসফিস করে কী বললেন সেটা ললিত হালদার আর উকিলবাবু ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না।

পুলিন ডাক্তার সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"অবিনাশবাবুর বাড়িতে যাই ঘটুক না কেন আমাদের সেটা দেখা কর্তব্য। মনে হচ্ছে একটা মারাত্মক নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। যাই হোক, আপনারা সবাই এখন যান। বাজার হাট বা অন্যান্য কাজকর্ম যার যা করার আছে সেরে নিন। সন্ধে ছ'টা নাগাদ সবাই এখানে মিট করবেন। আমরা অবিনাশবাবুর বাড়িতে যাব! আর হ্যাঁ, বিভু তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বাড়িতেই থেকো। আর দুলের দোকানে আমার নাম করে সবার জন্য লিকার চা আর পটল বিস্কুট বলে দাও। আজকেও দেরি করিয়ে দিলাম।"

চা খাওয়া শেষ করে ললিত হালদার বলল—"ডাক্তারদা, তা হলে আমরা যাই। সেনগুপ্ত সাহেবকে নিয়ে আমি আর উকিলবাবু ছ'টার আগেই ওখানে পৌঁছে যাব। পাঁচু আর দিবাকরকেও আপনার নির্দেশ পৌঁছে দেব। চলি।"

"হ্যাঁ এসো। সাবধানে যেয়ো।" অগ্নীশের কাঁধে হাত রেখে এগোলেন পুলিন ডাক্তার।

তিন

ছ'টার সময় পার্ক থেকে রওনা দিয়ে অবিনাশের বাড়ি আসতে আরও মিনিট বারো লাগল। সদর দরজায় কড়া নাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুলে যে দাঁড়াল তাকে অবিনাশের ছেলে বলে ভাবতে কোনো কষ্ট হয় না। পরনে ফুলপ্যান্ট আর সাদা টি শার্ট। বুকের ওপর বড়ো ছবিটা যে ঋত্বিক রোশনের সেটা দিবাকর বলে না দিলে পুলিন ডাক্তার বুঝতে পারতেন না।

পুলিন ডাক্তার বললেন, "তুমি অবিনাশবাবুর ছেলে?"

"বুঝতেই তো পারছেন। এই ভূতের বাসায় ছেলে ছাড়া আর কোন জানোয়ারটা থাকবে?"

পুলিন ডাক্তার ততক্ষণে ঘরের ভেতরে পা দিয়ে দিয়েছেন। বললেন—"তোমার বাবাকে বলো যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

দরজা খোলার শব্দ এবং ডাক্তারের গলার আওয়াজে অবিনাশবাবু ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছেন। অবিনাশবাবু ছেলেদের বললেন—"দ্যাখ কারা এসেছেন। গাঁয়ের গণ্যমান্য লোক সব। বসতে দে ভালো করে। চা জলখাবারের ব্যবস্থা—আচ্ছা ওটা নয় পরে হবে, ওনারা খাবেন কিনা তাতো জানি না।"

ডাক্তার বললেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা কিচ্ছু খাব না। চাও খাব না। এখন বলুন অপনার সমস্যাটা কী। ও, তার আগে আপনার ছেলেদের নামটা তো জানা দরকার। কী নাম তোমাদের?"

"আমার ভালো নাম স্টিপানচিস, ডাক নাম টোস্ট আর ছোটকুর ভালো নাম সুরবেক, আর ডাক নাম ঘুগনি।"

ডাক্তারের চোখ কপালে উঠে গেল। পাঁচু, বিশে-দুলে আর দিবাকর এ ওকে ধাক্কা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। পরমুহূর্তে পুলিন ডাক্তার কটমট করে পিছনে তাকাতেই সবাই চুপ।

অগ্নীশ বলল—"যে বছর কলকাতায় বিশ্ব টেবিল টেনিসের আসর বসেছিল, তোমাদের কি সেই বছরেই জন্ম?"

"হ্যা"।

ডাক্তার বললেন—"তোমার বাবার রসবোধ আছে মানতে হবে। এখন বলো তোমাদের বাড়িতে কিসের উপদ্রব হয়েছে? বিভু বলছিল।"

"ওই যা হয় সব পোড়ো বাড়িতে। ফাঁকা রাখলেই কেস কিচাইন। রাত আটটা বাজলেই ভুতের নেত্য শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠে। অথচ কাউকে দেখা যায় না। হঠাৎ দেখলেন ছাদের কার্নিস থেকে একটা বাঁদরের লেজ বা ঠ্যাং ঝুলছে। কখনও দেখলেন জানলা দিয়ে একটা কালো বেড়াল ঢুকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

টোস্ট একটু থামতেই ঘুগ্‌নি বলল—"দেখুন না বাবাকে কত দিন ধরে বলছি এই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে অন্য কোথাও থাকতে। খদ্দেরও আমাদের দেখা আছে। ভালো দাম পেত। তা বাবা কি আমাদের কথা শুনবে।"

ললিত হালদার ও উকিলবাবু দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই ডাক্তারের সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল। ললিত হালদার হাতের ইশারায় কিছু একটা জিজ্ঞেস করতেই ডাক্তার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

অতীন বিশ্বাসের রাগের পারদ অনেকক্ষণ ধরে চড়ছিল। এবারে বললেন, "তা বাড়ি বিক্রি করতে চাইলেই কি সঙ্গে সঙ্গে লোকে কিনে নেবে? এত বড়ো বাড়ি, তার ওপরে ভাঙা, পুরোনো, এটা কেনা কি যার তার কম্মো?"

ঘুগনি তালুতে জিভ ঠেকিয়ে বলল—"ওস-সব আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। কত বড়ো বড়ো গাড়ি গ্যারেজ হয়ে যাচ্ছে, তা এইট হানড্রেড তো কোন ছাড়্। মোট কথা এই ভূতের বাসায় আমরা আর থাকব না। বিশ্বাস না হয় তো দু-এক ঘণ্টা বডি ফেলে থাকুন। দেখিয়ে দিচ্ছি খেল—ঝক্কাস—এ দিল মাঙে মোর।"

ছেলেদের মুখের ভাষায় অবিনাশবাবু অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন—"ওদের কথায় কিছু মনে করবেন না। জন্ম থেকে মা-মরা হলে যা হয়।"

চার

দোতলায় একটা বেশ বড়ো ঘরের চৌকিতে পাশাপাশি বসে আছেন পুলিন ডাক্তার, উকিলবাবু, ললিত হালদার আর অতীন বিশ্বাস। একটা কাঠের চেয়ারে বসে অগ্নীশ। বাকিরা একতলায় বসে আছে। অবিনাশবাবু মাটিতে একটা মাদুরের ওপর বসে। টোস্ট আর ঘুগনিকে কাছাকাছি কোথাও দেখা গেল না।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যেতেই একটা চাপা অন্ধকার সবাইকে গ্রাস করে নিল। সেকেন্ডের মধ্যে অবিনাশবাবুর আর্ত চিৎকার—"বাঁচাও।" নীচেও

একটা শোরগোল শোনা গেল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে বারান্দাতে একটা জোরালো আগুন দপ করে জ্বলে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেল।

পুলিন ডাক্তার ততক্ষণে টর্চ বার করে জ্বেলে ফেলেছেন। বারান্দার কোনা থেকে এতক্ষণে টোস্টের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—"বাবা, আমি আর এ বাড়িতে থাকব না, এ বাড়ি অপদেবতার বাসা হয়েছে। কালই বিক্রি করে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে একটু চাপা অথচ নাকি গলায় কে বলে উঠল, "ঠিকই তো বলেছে টোস্ট। ঘুগনিরও তো একই মত। দাও বাড়ি বিক্রি করে।"

আলো এসে যেতেই দেখা গেল টোস্ট ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। পুলিন ডাক্তার বললেন, "অবিনাশবাবু, টোস্ট আর ঘুগনি ঠিক কথাই বলেছে। বাড়িটা বিক্রি করেই দিন।"

সঙ্গে সঙ্গে নাকি গলায়, "কী মজা, কী মজা, ডাক্তার ঠিক.....।"

কথাটা বন্ধ হয়ে যেতেই দেখা গেল অগ্নীশ তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে টোস্টের ঘাড় চেপে ধরে দেওয়ালের সঙ্গে ঠুসে ধরেছে। পাঁচু আর বিশে ঘুগনিকে পাঁজাকোলা করে এনে মেঝেয় আছড়ে ফেলল। থানার বড়োবাবু মিস্টার সেনগুপ্ত ততক্ষণে ওপরে এসে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, বড়ো টাইমলি খবরটা পাঠিয়েছিলেন। একটু দেরি হলেই বড়ো একটা দুর্ঘটনা কেউ এড়াতে পারত না।"

অবিনাশবাবুকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে পুলিন ডাক্তার বললেন—"যখন শুনলাম আপনার বাড়িতে নানা রকম কাণ্ড ঘটছে, যেটাকে অনেকে অলৌকিক বলে গুরুত্ব আরোপ করে, তখন ব্যাপারটা খতিয়ে ভেবে দেখলাম। আপনাদের এই পাড়াতে আমি সম্প্রতি লক্ষ করেছি পুরোনো পুরোনো বাড়িগুলো মালিককে ভয় দেখিয়ে জলের দামে বিক্রি করতে বাধ্য করে সেখানে বহুতল বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আর এই সব কাজের মূল পাণ্ডা হল টোস্ট আর ঘুগনির মতো ইয়ং ছেলেরা যাদের আপনারা প্রোমোটার বলে চেনেন। উকিলবাবুর কাছে যখন শুনলাম যে আপনার ছেলেরা এ রকম কিছু সমাজবিরোধীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তখন আমি গোপনে ললিতবাবু আর নৃসিংহবাবুকে দিয়ে থানার বড়োবাবু মিস্টার সেনগুপ্তর কাছে খবরটা পাঠাই এবং দ্রুত অ্যাকশন নিতে বলি। আপনাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে বাড়িটা খুব সস্তায় প্রোমোটারদের কাছে বিক্রি করিয়ে মোট টাকা বখরা নেবে ভেবেছিল আপনার ছেলেরা। আমার দুঃখ হচ্ছে যে আপনার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি এই ভূত প্রেত অলৌকিকত্ব এ সবে বিশ্বাস করেন।"

টেবিলে রাখা জগ থেকে খানিকটা জল খেয়ে নিলেন ডাক্তার। তারপর বললেন—"যখন আমার খেয়াল হল যে টোস্ট আর ঘুগনি সার্কাসের দলে কাজ করে তখন বুঝে গেলাম যে ওদের পক্ষে নানা রকম জাগলারি, হরবোলা বা বহুরূপীর অভিনয় করে ভয় দেখানোটা সহজ। তাছাড়া যখন জানলাম ওদের একজন একটু আধটু ম্যাজিক বা ট্রিক্স জানে তখন ইন্টারেস্ট পেয়ে গেলাম। এই যে আমার ভাগ্নে অগ্নীশ, ও একজন উঁচু দরের ম্যাজিশিয়ান। ফোন করে ওকে আনালাম। বাকিটা ওর কাছে শুনুন।"

অগ্নীশ বলল—"আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন ইংরাজিতে ভেন্ট্রিলোকুইজিম (Ventriloquism বলে একটা কথা আছে। ভেন্ট্রিলোকুইজিম হল কথা বলার একটা আর্ট যার সাহায্যে বক্তা এমনভাবে কথা বলে যেটা শুনে মনে হয় সেটা অনেক দূর থেকে অন্য কোনো সোর্স থেকে আসছে। ফলে একজন লোক একসঙ্গে স্বাভাবিক কথা বলার পর ভেন্ট্রিলোকুইজিমের সাহায্যে অন্য কেউ কথা বলছে এমন ভান করে। দক্ষতার সঙ্গে করলে পাশের লোকও বুঝতে পারবে না যে একই লোক দু'রকম কথা বলছে। টোস্ট একজন দক্ষ ভেন্ট্রিলোকুইজিমের মতো কাজ করেছে। বারান্দায় আগুন জ্বলে ওঠার মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা আসাধারণত্ব নেই। স্রেফ বিজ্ঞানের ব্যাপার। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ওপর গ্লিসারিন ছিটিয়ে দিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আগুন জ্বলতে পারে।"

দুলে ফস করে বলে উঠল—"ঘুগনি যেই মেন সুইচটা অফ করেছে অমনি বড়োবাবু ক্যাঁক করে ওর ঘাড় চেপে ধরেছেন।"

থানার বড়োবাবু মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন—"অবিনাশবাবু, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, লোককে ভয় দেখানো আর প্রতারণার অভিযোগে আপনার দুই ছেলেকে আমি গ্রেফতার করলাম। আপনি একটু বাদে থানায় আসবেন।"

পুলিন ডাক্তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলো, এবার উঠি। না হলে কাল সকালের আড্ডায় লেট মার্ক পড়ে যাবে।"

ঘোড়ার চাল

"এই রইল কিস্তি। এইবার রাজা সামলাও হে শৈলেশ্বর।"

আচমকা কিস্তির কথা কানে আসতেই শৈলেশ্বর চমকে গেলেন। নিজের ওপরেই রাগ হল। একবারও খেয়াল করেননি। এ রকম তো হবার কথা নয়। যে লোক কিনা একশো বারের মধ্যে একশোবারই তার কাছে মাত হয় সে যে এ রকম একটা জব্বর কিস্তি দেবে আগে ভাবেননি। আসলে ঘোড়াটা যে ওভাবে কিস্তি দিয়ে রাজা-মন্ত্রী একসঙ্গে পাকড়াও করতে পারে সেটা তিনি ভেবেছিলেন, কিন্তু ঘোড়াটাকে যে বড়ে দিয়ে মারা যাবে না, মারলেই নৌকোর কিস্তি পড়ে যাবে, সেটা তিনি ভাবেননি।

কী আর করবেন শৈলেশ্বর। মন্ত্রী দিতেই হল। আক্কেলসেলামি। মন্ত্রী গেলে কী আর খেলা হয়। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। নিজের মনেই বলে উঠলেন, "নাও, ফের থেকে সাজাও।"

এতক্ষণে গিরিগোবর্ধন মুখ খুললেন। শৈলেশ্বরের কাঁচুমাচু মুখ লক্ষ করে বললেন—"তোমার আজ হল কি? এভাবে মা....?"

"থাক থাক, ঢের হয়েছে। তোমার হিম্মত বোঝা গেছে। আবার সাজাও। মাত করো তো দেখি।"

"সেই কথাই তো বলছি। তোমার আজ হয়েছেটা কী? খুব দুশ্চিন্তায় আছ বলে মনে হচ্ছে। এত সহজে তো তোমাকে মাত করা যায় না।"

"আর বোলো না। মেজাজ খারাপ হবে না। চোদ্দপুরুষে বাপ-ঠাকুদ্দা যা অ্যালাউ করেনি তাই করব আমি। নো, নেভার। যা হয় হবে। পৈতৃক ভিটে বলে কথা। নষ্টামি করার জায়গা নয় এটা।"

"কী হয়েছে খুলে বলবে তো। এভাবে নিজের মনে গজরালে বুঝব কী করে? কিসের নষ্টামি, কারা করছে বলবে তো?"

একটা বড়ে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শৈলেশ্বর বললেন, "আরে দ্যাখো না। দুধের বাচ্চারা সব, এখনও জিভের আড় ভাঙেনি, বাপ বলতে দাদা বলে, আমাকে

বলে কিনা বাগানে ফিস্টি করার পারমিশন দিতে। আচ্ছা তুমিই বলতো গিরিগোবর্ধন, বাপ পিতেমোর বসত ভিটে, এখানে কি নষ্টামি করতে দেওয়া যায়?"

"আহা, এটাকে তুমি নষ্টামি বলছ কেন? একটু ফিস্টিই তো করবে। তাতে তোমার আপত্তির কী আছে তাই বুঝছি না।"

খেঁকিয়ে উঠলেন শৈলেশ্বর, "আর বুঝে কাজ নেই। বুঝবেই বা কী করে। তুমিও তো এক গোত্তরের। বিয়ে থা করলে না। সারাটা জীবন বাউন্ডুলেপনা করে কাটালে। পৈতৃক ভিটের মর্ম তুমি কি বুঝবে?"

"তা না হয় বুঝলাম না। কিন্তু তোমার এই ফিস্টি করায় আপত্তির ব্যাপারটা? সেটাও কি বুঝলাম ভায়া?"

গিরিগোবর্ধনের ঠাণ্ডামার্কা জবাবে শৈলেশ্বরের মেজাজ আরও তিরিক্ষি হয়ে গেল। আপন মনে আবার বিড়বিড় করতে লাগলেন, "আর ওদেরই বা দোষটা কোথায়। নিজের ছেলেই যদি এর মধ্যে যোগ দেয় তা হলে তো ওরা সাপের পাঁচ পা দেখবেই। তবে আমিও সর্বেশ্বর বাঁড়ুজ্জের ছেলে। কীভাবে গোখরোর বাচ্চা জব্দ করতে হয় আমার জানা আছে। আবার বলে কিনা বাগানে ফিস্টি করার অনুমতি দেওয়া ছাড়াও একশো টাকা চাঁদা দিতে হবে।"

উসকে দেওয়ার জন্য গিরিগোবর্ধন বললেন, "তা দিয়ে দিলেই পারতে। একশোটা টাকা তো তোমার কাছে নস্যি। তা ছাড়া তোমার ছেলেই যখন এর মধ্যে...।"

"তুমি থামো তো বাপু। পইতে পুড়িয়ে ভগবান হয়েছ? তোমাকে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে কে বলেছে?"

মুচকি হেসে গিরিগোবর্ধন বললেন, "ব্যাপারটা ভেবে দেখো একবার শৈলেশ্বর। তোমার বাগানটা যা জংলা হয়ে পড়ে আছে দিনের বেলাতেও ওখানে কেউ ঢুকতে সাহস পায় না। তা ছাড়া তোমাদের ওই কাছারিঘর—ওটা তো প্রায় কুড়ি বছর ব্যবহার হয়নি। ছেলেদের ছেড়ে দিলে ওরা একটি ক্লাবঘর করতে পারবে। এমনিতে তো ভূতের বাসা বলে এর মধ্যেই দুর্নাম রটে গেছে। তোমার চাকরবাকররা তো সন্ধের পর কেউ ওখানে যায় না। সে খবর রাখো?"

"তোমার মুণ্ডু। ক্লাব করার ব্যাপারটা তোমার মাথা থেকেই বেরিয়েছে বুঝি? আমার ছেলে নাদু যখন প্রস্তাবটা দিয়েছিল তখনই বুঝেছিলাম যে, এ মতলব নিশ্চয় তোমার মতো কোনো পাকা বাউন্ডুলের মাথা থেকে বেরিয়েছে।"

"অ্যাই দ্যাকো দিকি। আমি নিরীহ মানুষ। আমাকে আবার এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন? আমি এসবের, মানে ক্লাব করার ব্যাপার-ট্যাপারগুলো বিন্দুবিসর্গ জানি না। মনে এল, তাই বললাম।"

আচমকা একটা দমকা বাতাস আসতেই জানলা দরজার পাল্লাগুলো দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। দাবার বোর্ডটা উড়ে টেবিলের তলায় চলে গেল। গুটিগুলো সারা মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে লাগল। শশব্যস্ত দু'জনে দরজা জানালা বন্ধ করায় মন দিলেন। ঝমঝম করে বৃষ্টি এসে গেল।

গিরিগোবর্ধন হঠাৎ মুখটা কাঁচুমাচু করে বললেন, "শৈলেশ্বর, আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি বাড়ি যাব কী করে!"

"তোমার আবার ভয় কিসের। একলা মানুষ। ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয় থাকে না কি?"

"না গো, ওই যে একটু আগে তেনাদের কথা আলোচনা করছিলাম না। সন্ধেবেলায় তেনাদের নাম মুখে আনা ঠিক হয়নি। অপদেবতা বলে কথা। একটু সামলে চলতে হয়। কখন যে আড়াল থেকে ঘাড় মটকে দেবে। তোমাদের কাছারিঘরের পাঁচিলঘেঁষা পথ দিয়েই তো আমাকে বাড়ি ফিরতে হয়। তার ওপর আজ হল গে ভাদ্দর মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী। নষ্টচন্দ্রের রাত। কাল আর তোমার সঙ্গে দাবা খেলতে পারব না। কোনোদিনই পারব না।"

"কী আবোল তাবোল বকছ বলতো। ভূত বলে কিছু আছে না কি? যত্তোসব আজগুবি চিন্তা।"

"বল কী হে, শৈলেশ্বর। এ যে দেখছি তেনাদের মুখে রাম নাম। তুমি বলছ আজগুবি চিন্তা। তেনাদের নিয়ে রসিকতা।"

"তা ছাড়া আবার কী! ভূত বলে কিছু আছে নাকি? ভূত দেখেছ কখনও?"

"দেখিনি আবার। তোমার মনে নেই ভায়া। সেই যে যুদ্ধের আগের বছর আমাদের বন্ধু গোবিন্দ রেলে কাটা পড়ে মারা যাবার পর ওর বউটাকে ভূতে ধরল। আর বউটা কেমন আলাভোলো হয়ে গেল। কত ওঝা ঝাড়ফুঁক, সব বিফলে গেল। মনে নেই?"

"ও সব একটু আধটু হয়েই থাকে। তা বলে ভূতের ভয়ে অমন সুন্দর পাঁচ কাঠার বাগানটা আমি ছেড়ে দেব? আর ভূত যদি থাকেই তা হলে ক্লাব ঘর আর ফিস্টি

করলেই তারা চলে যাবে? না, না ওদের দেওয়া হবে না। দরকার হলে আমি ওঝা ডাকব। ঝাড়ফুঁক করাব। বাড়ি বন্ধন করাব।"

"কিন্তু তোমার নিজের ছেলে নাদুও যে এর মধ্যে আছে। ওকে কী করে ফেরাবে? তাছাড়া ওতো একটা সৎ কাজই করছে। বাপঠাকুদ্দার ভিটেকে ভূতের কবল থেকে রক্ষা করছে....।"

গিরিগোবর্ধন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ছাদের ওপর ধুপধাপ কড়কড় আওয়াজ শুনে চুপ করে গেলেন। মুখখানাকে যতদূর সম্ভব ফ্যাকাশে করে সরে এলেন শৈলেশ্বরের দিকে। অস্পষ্টভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল...ভূ.....ভূ।"

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে, রান্নাঘরে এবং বাথরুমে একসঙ্গে অনেকগুলো ঝুমুরের আওয়াজ হতেই ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে গেলেন। চেঁচিয়ে কাজের লোক ন্যাপলাকে ডাকতে যাবেন, অমনি লোডশেডিং হয়ে গেল।

গিরিগোবর্ধন পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিল—"ভূত এসেছে, ভূত এসেছে। ও শৈলেশ্বর, ও নাদু, ও ন্যাপলা, আমার ঘাড় ভেঙে দিল রে।"

শৈলেশ্বর টর্চ জ্বালাতেই, গিরিগোবর্ধন চুপ করে গেলেন। সিঁড়ির মুখে ন্যাপলার গলা পাওয়া গেল—"বাবু, শিগগির নিচে চলুন। ছোটোবাবু কী রকম কচ্চেন।"

"কী করছে? কী হয়েছে নাদুর? অ্যাকসিডেন্ট?"

"ফিট হয়ে গেছে। একটু আগে কাছারিঘরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে আছড়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে।"

ন্যাপলাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরে পা দিতেই কারেন্ট এসে গেল। শৈলেশ্বর হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়ে বল্লেন—"কী হয়েছে বাবা? কী কষ্ট হচ্ছে?"

বাবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল নাদু।

গিরিগোবর্ধন বললেন, "এক্ষুনি বেন্দাবন ওঝাকে খবর পাঠাও। ওর গায়ে হাওয়া লেগেছে। বললাম না আজ নষ্টচন্দ্রের রাত। তেনাদের নিয়ে রং-তামাশা কোরো না। শেষকালে সম্পত্তি রাখতে গিয়ে কি নিজের ছেলেকে খোয়াবে?"

শৈলেশ্বর কোনো কথা না বলে ন্যাপলার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করতেই ন্যাপলা ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে ঘুরে এসে বলল, "বড়োবাবু, বেন্দাবন ওঝা বাড়িতে নেই। এই গাঁয়ে একজন নতুন ওঝা এসেছেন। তাকে নিয়ে এলাম।"

আপাদমস্তক গেরুয়া আলখাল্লায় ঢাকা থাকলেও বয়স যে বাইশ তেইশের বেশি নয় সেটা আন্দাজ করতে শৈলেশ্বরের এক লহমার বেশি লাগল না।

"কী নাম তোমার? কোথায় থাক? কতদিন ধরে ওঝাগিরি করছ? কটা ভূত তাড়ানোর কেস করেছ?'

তিরিশ সেকেন্ড মতো নিয়ে ওঝাটা বলল, "ভুবন এদিন এনা।"

"বাঃ নামটাতো বেশ আধুনিক। ভুবন, তা বলো দেখি বাবা, কত নেবে ঝাড়ফুঁক করতে। এ সব ভূত প্রেতের উপদ্রব তো আমার বাড়িতে কোনোকালে ছিল না।"

শৈলেশ্বরের কথা শেষ না হতেই নাদু একটু নড়ে চড়ে উঠল। মুখে আর গ্যাঁজলা নেই। চোখ দু'টো বোজা। গোঁ গোঁ করে কী একটা বলল।

শৈলেশ্বর ওঝার দিকে তাকাতেই ওঝা বলল, "ওর ঘাড়ে অপদেবতা ভর করছে।" শুনলেন না বলল, "এটা আর কাছা দিদা অটাখাকে।"

"তার মানে?" শৈলেশ্বরের চোখ কপালে উঠল।

নাদু পা দুটো টান টান করে বাপের দিকে একবার তাকাল।

ওঝা বলল, "মানেটা সাংকেতিক। ভূতেদের ভাষা। পাশের গ্রামের হরিহর মুখুজ্জের আত্মা এখন কাছারিঘরে বাসা বেঁধেছে। আপনার ছেলে নাদুবাবু ওখানে যেতেই ওর ঘাড়ে ভর করেছে।"

"এখন কী উপায়?" শৈলেশ্বরের গলায় এতক্ষণে উদ্বেগের আভাস পাওয়া গেল।

"উপায় একটাই। বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার করে আপনার ছেলে এবং তার বন্ধুদের কথামতো ওদের ফিস্টি করতে দিন। আর কাছারিঘরটা ক্লাব করার জন্য দিয়ে দিন। সঙ্গে একশো টাকা চাঁদা।"

শৈলেশ্বর চিন্তিত হলেন। নাদুকে সোজা হয়ে সটান দাঁড়াতে দেখে পরক্ষণেই চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, "তা তুমি এই কথা জানলে কী করে বাবা? সত্যি কথাটা খুলে বলো দেখি। শৈলেশ্বর বাঁড়ুজ্জেকে এত সহজে বোকা বানানো কম কথা নয়। তুমি তো দুধের ছোকরা হে।'

একফাঁকে নাদু কখন ঘর ছেড়ে পালিয়েছে শৈলেশ্বর খেয়াল করেননি।

বাইরে গিরিগোবর্ধনের চাপা গলা শুনতে পাওয়া গেল, "হতচ্ছাড়া নির্বোধ। দিলি তো পাকা গুটি কাঁচিয়ে। আর একটা মিনিট মুখে গ্যাঁজলা তুলে থাকতে পারলি না।

তোর বাপকে প্রায় কবজা করে এনেছিলাম আর কি। এখন নে, আমও গেল, ছালাও গেল।"

নাদু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল 'কী করব। বাবা যে সব ধরে ফেলছিল প্রায়। তা ছাড়া আলখাল্লার নীচ দিয়ে ভুতোর পা দেখা যাচ্ছিল। তখনই বললাম আমার কর্ডের প্যান্টটা না পরতে। ওর গোঁফখানাও যে ঝুলছিল। উঠে না এলে নির্ঘাত বাবার চড় খেতাম।'

"হতচ্ছাড়া ভুবন। আমার সঙ্গে চালাকি। ওই ইস্কুলে আমি পড়িনি ভেবেছিস। এই সিলেবাস আমার গুলে খাওয়া আছে। ক্লাবঘর করবি? কোথায় গেলি নাদু? এদিকে আয় ব্যাটা। বাপের সঙ্গে ইয়ার্কি। আর কোথায় সেই পালের গোদা গিরিগোবর্ধন? বলে কি না ভূতেদের ভাষা। সাংকেতিক না গুষ্টির পিণ্ডি। বল ব্যাটা ভুবন, এই সাংকেতিক ভাষার মানে কী?"

"আজ্ঞে আমার নাম ভুবন নয়। 'ভু' মানে ভূতনাথ, 'বন' মানে বরেন্দ্র নগর, মানে কোথায় থাকি। 'এদিন' মানে একদিনও নয়। 'এনা' মানে একটাও না। এটা আর কাছা দিদা অটাখাকে' মানে একশো টাকা আর কাছারি দিয়ে দাও। অত টাকা খাবে কে।"

শৈলেশ্বর একটানে ভুবনের দাড়ি গোঁফ খুলে দিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে বল্লেন, 'তুই ভুতো। বেড়ে মেক-আপ দিয়েছিস তো। ঠিক আছে। কর তোরা ফিস্টি আর ক্লাবঘর। কাল নিয়ে নিস একশো টাকা। আর হ্যাঁ, গিরিগোবর্ধন, আজ সন্ধের খেলাটা বাতিল হয়ে গেল বুঝলে। ওটা রেকর্ডে রাখবে না কিন্তু, হ্যাঁ।"

বিধু সামন্তের ভূত

মাচানতলার শিবমন্দিরটার কাছে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন সামন্তমশাই। সন্ধে হব-হব, শীত-শেষের বিকেল, এমনিতেই বেলা তাড়াতাড়ি গড়িয়ে আসে। হারু পালিতের বাঁশঝাড়ের ফাঁকে লাল টকটকে সূর্যটাকে একটু আগেও দেখতে পেয়েছিলেন। হঠাৎই যেন চার পাশে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে তুষের চাদরের খুঁট দিয়ে ভালো করে মুছে চোখে দিলেন। না, এ রকম তো হওয়ার কথা নয়। ভুল দেখছেন না কি? চশমাটা আবার খুলে চোখ দুটো ডলে নিলেন। ভালো করে খেয়াল করলেন। ভুল তো নয়, ঠিকই দেখছেন। গাটা ছমছম করে উঠল। কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর ভর সন্ধে, তায় মঙ্গলবার। এ-সময় একা-একা এদিকটায় আসা ঠিক হয়নি। হারু পালিতদের বাঁশঝাড়টার বেশ বদনাম আছে। নানা লোকে নানা কথা বলে আসছে। কতজনে নাকি কতকিছু দেখেছে এখানে সন্ধেবেলা। অবশ্য ভুল করেও এসব কথা কোনোদিন গায়ে মাখেননি সামন্তমশাই। যতবার পাড়ার পাঁচজনে বলতে এসেছে, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। নিজের চোখে যখন দেখেননি তখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না।

মাঘমাসের শীতেও নেপু সামন্তের গা দিয়ে ঘাম বেরোতে লাগল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ। চাদরটাকে আলগা করে দিয়ে চারদিকে একবার ভালো করে তাকালেন। কোথাও জনমিনিষ্যির চিহ্ন দেখতে পেলেন না। নিজের অজান্তেই চোখ চলে গেল মন্দিরের চুড়োটার দিকে। দু'চারখানা লকলকে বাঁশ মন্দিরের গায়ে হেলে পড়েছে, যেন গা জড়িয়ে ধরে মন্দিরটাকে আদর করছে। আবছা আলো-অন্ধকারে নেপু সামন্ত পরিষ্কার দেখতে পেলেন, মন্দিরের চুড়োর মাঝখানের ত্রিশুলটাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে একজন লোক। সারা গায়ে চাদর জড়ানো, মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। চমকে উঠলেন সামন্তমশাই। কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে হাওয়া খেলে গেল। বাঁশঝাড়টা বেশ দুলে উঠল। মনে সাহস সঞ্চয় করে সামনে এগোবার চেষ্টা করলেন। পা দুটো যেন মাটিতে গর্ত করে কেউ পুঁতে দিয়েছে। ভীষণ ভারী লাগল। অনেক চেষ্টা করেও তুলতে পারলেন না। হঠাৎ সামন্তমশাইয়ের মনে হল, কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, "মাঁছ দুঁটো

ধঁরলি কেঁন রেঁ ব্যাঁটা নেঁপু? কঁত দিঁন ধঁরে খাঁব বঁলে আঁশা কঁরে আঁছি। আঁমার নিজের হাঁতে বঁড় কঁরা মাঁছ।

অবিকল বাবার গলা বলে মনে হল নেপুর। হাতের ঝোলাটাকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগালেন উলটো দিকে।

নেপু সামন্তকে চেনে না এ-গাঁয়ে এমন মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। সত্যি কথা বলতে কী, এই মাচানতলা গ্রামে যারাই বিশ-পঁচিশ বছর ধরে আছে তারাই ওঁকে হাড়েহাড়ে চেনে। হদ্দ কেপ্পন। ভয়ে কেউ নাম মুখে আনে না। নাম করলে নাকি হাঁড়ি ফাটে। নেপু সামন্তের বাবা বিধু সামন্ত ছিলেন পাড়ার শিব মন্দিরের কেয়ার-টেকার। বাপ-ঠাকুর্দার আমলের একটা মাটির ভিটে, লাগোয়া একটা বাগান আর ওই একচিলতে একটু পুকুর। নিজের লোক বলতে বিধুর এই একটামাত্র মা-মরা ছেলে। পুকুরের টুকটাক মাছ আর বাগানের এটা-ওটা সবজি আর ফলমূল দিয়ে কোনোরকমে দিন চলে যাচ্ছিল। বড়ো হয়ে নেপু যখন গ্রামের পোস্টাপিসে ছোটোবাবুর চাকরি পেলেন তখন ছেলের বিয়ে দিলেন বিধু। ভাবলেন ছেলেটা বোধ হয় সংসারী হয়ে বুড়ো বাপটাকে এবার খেতে-পরতে দেবে। সে-আশায় ছাই পড়ল। নেপু যে দিনে-দিনে এরকম হাড়কেপ্পন হয়ে উঠবেন, কে জানত।

তা, বিয়ের পর থেকে বছরে দশ মাস নিজের ছেলে-বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে কোনো রকমে দুটো মুড়ি-বাতাসা খেয়ে দিন কাটছিল নেপুর। দু'মাস অন্তর সাতদিনের জন্য স্ত্রীকে এনে রাখেন। বাড়ি ঘরদোর পরিষ্কার, জামাকাপড় কাচা এগুলো হয়ে গেলেই আবার স্ত্রীকে রেখে আসেন বাপের বাড়ি। কতদিন কত লোক এসে বলেছে, "সামন্তমশাই, অত পয়সাকড়ি জমিয়ে কী হবে? লোককে দান-ধ্যান না করেন ক্ষতি নেই, নিজে তো ভোগ করতে পারেন। বুড়ো বাবাটা মন্দিরের চাতালে শুয়ে-বসে কষ্ট পাচ্ছে। আপনার ছেলে জানতে পারল না বাপের ভিটে কেমন দেখতে। এবার সকলকে নিয়ে একসঙ্গে থাকুন। কটা দিনই বা বাঁচবেন বিধুকাকা। অভাবের তাড়নায় আর মনের দুঃখে শেষ বয়সে বুড়ো না একটা কিছু অঘটন ঘটিয়ে ফেলেন।"

এসব কথা নেপু সামন্ত জীবনে অনেকবার শুনেছেন। মুখে চোখে যতটা সম্ভব দুঃখ ফুটিয়ে তুলে নেপু বলেছেন, "কী করব বলুন। ইচ্ছে তো সবারই হয়। সঙ্গতি কোথায় বলুন। নিজের পেটটাই চালাতে পারছি না, তা বাপ, ছেলে, বউকে দেখব কোত্থেকে?

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে-ছুটতে বারবার কথাগুলো নেপুর মনের মধ্যে ঝটকা

মারতে লাগল। তখন পাড়ার লোকের কথা শুনে বুড়ো বাপটাকে কাছে এনে রাখলেই পারতাম। না হয় মাসে সাতটা টাকা বেশি খরচা হত। কিন্তু এমন অঘটনটা হয়তো ঘটত না।

নেপুর চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল গত মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর কথা। মন্দিরের চুড়োয় ত্রিশূলটা থেকে ওর বাবার দেহটা ঝুলছে। গলায় চাদরটা দড়ির মতো বাঁধা। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জিভটা বুকের কাছে এসে ঠেকেছে।

হঠাৎ নেপুর সারা শরীরটা গুলিয়ে উঠলো। বমি ঠেলে আসছে। হাতের থলেটা আরও শক্ত করে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিলেন।

তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো ক্রোশটাক পথ দৌড়ে এসে তামলিবাঁধের কাছে পোস্টাপিসের চাতালে আছড়ে পড়লেন নেপু। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। প্রায় বেহুঁশ। মিনিট দুয়েক পর নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসলেন। হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠল, "কাঁজটা ভাঁল কঁরলি নাঁ নেঁপু। মাঁছ দুঁটো রেঁখে আঁয়। আঁমি ভেঁজে খাঁব।"

চমকে উঠে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলেন নেপু, কোথাও কেউ নেই। সন্ধের পর গ্রামের রাস্তায় কেউ থাকে না। একটানা ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে। আকাশে তারার মতো ঝাঁকে-ঝাঁকে জোনাকি পিটপিট করছে। দড়াম করে জানালার পাল্লা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এল। এ-সময়ে তো অফিসঘরে কারও থাকার কথা নয়। বিকেলে বেরোবার সময় ভালো করে দরজা-জানলা বন্ধ করে গেছেন। পকেট হাতড়ে চাবির থোকাটা বের করে দরজার দিকে এগোতেই চোখ কপালে উঠল নেপুর। কড়ায় তালা যেমন, তেমনই লাগানো আছে। হাত দিয়ে ঠেলে দেখলেন বন্ধ। জানলাগুলোর দিকে লক্ষ করে হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে দেখলেন। না, সব ক'টাই ভেতর থেকে বন্ধ। টানা ঝিঁঝিঁর ডাকের মধ্যেও নেপু স্পষ্ট শুনতে পেলেন, ঘরের ভেতর থেকে ধপধপ আওয়াজ। ঠিক যেন কেউ চিঠির ওপরে মোহর লাগাচ্ছে।

দরজার পাল্লায় কান লাগিয়ে ভালো করে শোনার চেষ্টা করতে যাবেন, রাস্তা থেকে কে বলে উঠল, "এই যে নেপুদা, রাতের বেলাতেও কি অফিস করবে নাকি?"

ঘাড় ঘোরাতেই নেপুর ভয়টা কেটে গেল। এটা তো খোনা গলার আওয়াজ নয়। তেনাদের গলা বলে মনে হচ্ছে না। সত্যিকারের মানুষের গলা। নিজের বাঁ হাতের

চেটোয় একটা চিমটি কেটে দেখলেন, না বেশ ব্যথা লাগছে। একটু এগিয়ে ভালো করে দেখে বললেন, "আরে, বলাই নাকি! সন্ধেবেলায় চললে কোথায়?"

বলাই একটু অবাক হয়ে নেপুকে আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর হাতের ঝোলাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই একটু মাচানতলার দিকে যাচ্ছি। ওখানে কেতো আর নাড়ু দাঁড়িয়ে থাকবে। কাল আমরা পিকনিক করব হারু পালিতের বাঁশবাগানে। তা তোমার ঝোলায় অত ভারী কী নিয়ে যাচ্ছ? পাথরটাথর নাকি?"

একগাল হেসে নেপু বলল, "ও কিছু না, অফিসে খুব কাজ জমে গেছে। কিছু খাতাপত্তর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। যা, যা তুই এখন যা। তবে হ্যাঁ, মাচানতলার শিবমন্দিরটার দিকে যাসনে। সাবধান! একটু আগেই দেখেছি তেনাদের।"

'ওসব ভয় আমাদের নেই! ও হ্যাঁ, নেপুদা, কাল তো আমরা পিকনিক করছি। বুঝতেই পারছ, বেকার ছেলে পয়সাকড়ি বেশি নেই। তা তোমার পুকুর থেকে দুটো বড়ো মাছ ধরব? তোমার তো খাবার লোক বলতে কেউ নেই। তুমি তো জীবনে আঁশ ছোঁওনি।" বলাই হাসতে হাসতে বলল।

নেপু দু'বার ঢোক গিলে বললেন, "কী যে বলিস বাবা। মাছ কি আর আছে পুকুরে। সব ওই চারাপোনা। থাকলে কি তোদের দিতাম না? পিকনিক করবি, এ তো আনন্দের কথা।"

"দেবে না তাই বলো। তোমার হাত দিয়ে জলই গলে না তা মাছ তো দূরের কথা। আচ্ছা, চলি।"

বলাই চলে যেতেই নেপু নিজের মনে একচোট হেসে নিলেন। তারপর চারদিক ভালো করে দেখে থলের ভেতর নাড়াচাড়া করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, মনে মনে বললেন, "খাওয়াচ্ছি মাছ। মাছ দেব না ছাই দেব।"

পেছন থেকে কে আবার বলল, "আঁমি মাঁছ ভাঁজা খাঁব। মাঁছের ঝোঁল খাঁব, ঝাঁল খাঁব। টক খাঁব, ল্যাঁজা খাঁব। মুঁড়িঘঁণ্ট খাঁব।

চমকে উঠে থলেটাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে চাদরের মধ্যে লুকিয়ে এক দৌড়ে বিশু ঘটকদের পুকুরের পাড় দিয়ে এক লাফে সোজা নিজের বাড়ির উঠোনে। আবার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। ঘরের দরজা আধখানা খোলা। ভেতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। উঠোন, দাওয়া সবকিছু ঝকঝকে তকতকে করে নিকোনো।

নেপুর স্পষ্ট মনে পড়ল, নিজের হাতে ঘরদোর ভালো করে তালাবন্ধ করে

বেরিয়েছিলেন। ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন উনুনের সামনে গিন্নি বসে আছে। লালপাড় সাদা শাড়ি। উনুনের ওপরে কড়াই চাপানো। ছ্যাঁক ছোঁক আওয়াজ হচ্ছে। ইলিশমাছ ভাজার গন্ধে সারা উঠোন, ঘর ম ম করছে। চোখ দুটো কচলে নিয়ে তাকালেন। উনুন থেকে আগুন বেরোচ্ছে না তো! তবে কি...? না, তাই বা কী করে হবে। সকালে নিজে গিয়ে গিন্নি আর ছেলেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছেন। ফিরে আসার তো কথা নয়! অনেক দূরের পথ।

সাহস করে ঘরে ঢুকতেই ভীষণ জোরে ঝোড়ো হাওয়া দিতে শুরু করল। জানলাগুলো একবার হাট করে খুলেই আবার দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। বিছানার চাদরটা শাঁই করে উড়ে উঠোনে বেরিয়ে গেল। নেপুর মনে হল একসঙ্গে অনেক ছেলে কানের কাছে গান করছেঃ

মাঁছ খাঁব, মাঁছ খাঁব
ল্যাঁজা খাঁব, মুঁড়ো খাঁব
চেঁটে খাঁব, চুঁষে খাঁব
নেঁপুটার মাঁথা খাঁব।

দ্রুত হাতে হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে দিতেই ঘরটা আলোয় ভরে উঠলো। গানটাও সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল।

নেপু ভালো করে তাকালেন ঘরের মধ্যে। দরজাটায় এর মধ্যে খিল দিল কে? মেঝেতে তাকিয়ে দেখলেন হাঁড়ি কড়া, উনুন এসব কিছুই নেই। ইলিশমাছ ভাজার গন্ধটা নাকে লেগে আছে। রান্নাঘর থেকে গিন্নির গলা শোনা গেল, "হাত পা ধুয়ে নাও, ইলিশমাছ ভাজা দিয়ে দুটো ভাত খেয়ে নেবে।"

রান্নাঘরের দিকে তাকাতেই জানলা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলেন বিশু ঘটকদের পুকুরপাড় দিয়ে হেঁটে চলেছে একটা লোক। শরীরটা পুরো হাড়ের। এককুচো মাংস নেই। হাড়ের হাত-পাগুলো ল্যাগব্যাগ করছে। ঠকঠক-ঠকঠক আওয়াজ হচ্ছে ক্রমাগত। নিজের চোখ দুটোকে অবাক করে দিয়ে নেপু দেখতে পেলেন, হাড়ের শরীরের কাঁধ থেকে পিঠের ওপর ঝুলছে বিকেলবেলা নিজের পুকুর থেকে ধরা দশ সের ওজনের দু'খানা রুইমাছ।

"অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ" চিৎকার করে নেপু দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়লেন। হ্যারিকেনটা পায়ে লেগে কাত হয়ে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি খেয়ে দপ করে নিভে গেল।

মাঘমাসের হিমঝরা রাতে দশটার সময়েও নেপু সামন্তের উঠোন, ঘর লোকে লোকারণ্য। পাড়ার স্কুলের হেডমাস্টার কানাই বাঁড়ুজ্যে নেপুর মাথার কাছে বসে হাতপাখা নাড়ছেন। ওঁর স্ত্রী চোখে জলের ঝাপটা মারছেন।

নেপু আস্তে আস্তে চোখ মেললেন। গোঙানির মতো অস্ফুটভাবে বলতে লাগলেন, "মেঁছো ভূঁত আঁসছে। আঁমাকে খাঁবে। ওঁ বঁলাই, মাঁছ দুঁটো থঁলের ভেতর রাঁখা আঁছে। নিঁয়ে যাঁও।"

আস্তে-আস্তে নেপু উঠে বসলেন। বাঁড়ুজ্যেমশাই হাসতে হাসতে বললেন, "সে কী সামন্তমশাই।। শেষকালে আপনাকেও ভূতের ভয়ে ধরল? আপনিই না একদিন বলতেন ভূত বলে কিছু নেই। সব মানুষের কল্পনা। মানুষই মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এসব করে।"

নেপু ফ্যালফ্যালে চোখে চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথাটা নীচু করে নিলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "বলতাম তো, বাঁড়ুজ্যেমশাই। কিন্তু কতক্ষণ আর সাহস ধরে রাখব বলুন। সন্ধে থেকে একটার পর একটা যা দেখলাম তাতে কী করে ভূত না মেনে থাকতে পারি!"

নেপুর মুখে আদ্যোপান্ত সব শুনে বাঁড়ুজ্যেমশাই আর হাসি চাপতে পারলেন না। হোঃ হোঃ করে দু'বার হেসে বললেন, "তা আপনিই বা ভরসন্ধেবেলা মাচানতলায় শিব মন্দিরের কাছে গিয়েছিলেন কেন?

নেপু দু'বার ঢোক গিলে আমতা-আমতা করে বললেন, "আর বলবেন না। কালকেই কানে এসেছিল কাতু, বলারা ফিস্টি করবে বলে পুকুরের বড়ো মাছ দুটো চুরি করবে। ভাবলাম, অমন সাধের বড়ো-বড়ো দুটো মাছ, বেচলে তিনশোটা টাকা আসবে। তাই বদ্যিনাথ মালোকে দিয়ে মাছ দু'খানা তুলিয়ে রেখেছিলাম কালকের হাটে বেচে দেব বলে, তা আর কপালে...।"

বাঁড়ুজ্যেমশাই এবার বেশ গম্ভীরভাবে বললেন, "ভালোই হয়েছে। আপনার তো অনেক মাছ। না হয় ছেলেরা দুটো মাছ খেলই একদিন। দিলে আপনার কি কমে যেত? আপনি দেননি বলেই তো ছেলেরা নানাভাবে আপনাকে মেছোভূতের ভয় দেখাচ্ছিল। কই রে কাতু, বলা, নাড়ু—আয়, সামনে আয়। সামন্তমশাইকে একবার দেখা তোদের সরঞ্জামগুলো। এই দেখুন সামন্তমশাই, আপনার মেছোভূতদের কাণ্ড!"

চোখের সামনে একখানা আস্ত কঙ্কাল, একটা টেপরেকর্ডার, দড়ি, লালপাড় সাদা শাড়ি সব দেখে নেপু সামন্ত এবারে সত্যিই হেসে ফেললেন। বাঁড়ুজ্যেমশাই রেকর্ডারটা চালাতেই গমগম করে শোনা গেল ঃ

মাঁছ খাঁব, মাঁছ খাঁব
ল্যাঁজা খাঁব, মুঁড়ো খাঁব
চেঁটে খাঁব, চুঁষে খাঁব
নেঁপুটার মাঁথা খাঁব।

ঘরভর্তি লোকের হাসিতে রাত বারোটাতেও পাড়া জেগে উঠল। নেপুও হাসতে-হাসতে বললেন, "কাতু, বালা, নাড়ু, মাছদুটো তোমরাই নিয়ে যাও। ভালো করে খাবে, আনন্দ করবে।"

বলাই বলল, "নেপুদা, আমাদের মাফ করে দিও। অন্যায় করে ফেলেছি। তবে হ্যাঁ, একটা কথা, কালকের ফিস্টিতে কিন্তু আমাদের ক্লাবের তরফে তোমার নেমন্তন্ন রইল। অবশ্যই যাবে কিন্তু।"

উইল রহস্য

চার দিন একটানা চলার পর বৃষ্টিটা আজ থেমেছে। একে রবিবার, তার ওপর আকাশটা একদম ঝকঝকে, সাবান দিয়ে কাচা। পল্টুর মনে আজ ভরপুর খুশি। কালকেই সিক্সথ্ সেমেস্টার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বিকেলে ভিলাই থেকে মামাতো ভাই সান্তু এসেছে। পল্টুর থেকে বছর দুয়েকের বড়ো। এসেছে একটা চাকরির ইনটারভিউ দিতে। শান্তনুদাও মাস দুয়েক ছিল না। ব্যাঙ্গালোর গিয়েছিল একটা ম্যানেজমেন্ট কোর্স করতে। শান্তনুদা না থাকায় এবং পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য রহস্য-টহস্যর সঙ্গে পুরোপুরি আড়ি চলছিল গত দু'মাস। অরিন্দমদা মাঝে মাঝে ফোন করতেন, আসতেন, ছড়া শুনিয়ে যেতেন। অবশ্য গত পনেরো-কুড়ি দিন কোনো খবর নেই। বোধ হয় পুজোসংখ্যার লেখার চাপ চলছে। তবে এবার শান্তনুদা ফিরে এসেছে খবর পেয়ে গেছে, নিশ্চয় আসবে।

পল্টু আর সান্তু সকাল সাতটা নাগাদ বাইরের ঘরের সোফায় বসে আজকের 'দি টেলিগ্রাফ' এর 'গ্রাফিতি'টা নিয়ে রাশিফল দেখছিল, শান্তনুদা ঘরে ঢুকে বলল—"গ্রাফোলজি কাকে বলে জানিস?"

ওরা দু'জনে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কথাটা ওরা কোনোদিন শুনেছে বলে মনে হল না।

শান্তনুদা টেবিলের ওপর রাখা স্ক্রিবলিং প্যাডটা থেকে দুটো পাতা ছিঁড়ে দু'জনের হাতে দিয়ে বলল—"এক কাজ কর। তোরা আলাদা আলাদাভাবে এই কাগজদুটোতে চার-পাঁচ লাইন করে কিছু লেখ। যা খুশি, তোদের যা মনে আসে। লিখে সই করবি।"

পল্টু বলল—"তোমাদের ব্যাঙ্গালোরের ক্লাসে এইসব শিখিয়েছে নাকি? কী হবে এসব লিখে, রহস্য-টহস্য নাকি?"

"আরে বাবা লেখ না। পয়সা খরচা হচ্ছে নাকি লিখতে গেলে?"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওরা চার-পাঁচ লাইন করে লিখে দিল। শান্তনুদা কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল—"সান্তু, তুই ভীষণ কিপটে। আর তুই বেশিরভাগ সময়েই ঝুটঝামেলা বা লোকজন থেকে আলাদা থাকতে ভালোবাসিস। আর তোর বন্ধুটা ঠিক উলটো।

সব সময় সবকিছুর মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। সব কিছু খুব ডিটেল্‌সে পর্যবেক্ষণ করে।"

পল্টু বলল—"এই জন্যই লিখতে বললে। আগে বললেই পারতে। এটা তো জানি, "হ্যান্ডরাইটিং অ্যানালিসিস।"

"দ্যাট্‌স গ্রাফোলজি। সান্তু লিখেছে কাগজের একদম বাঁদিকের ওপরের কর্নার থেকে, আর ছোটো ছোটো করে। অত বড়ো কাগজটার চারভাগের তিনভাগ ফাঁকা পড়ে রইল। তার মানে ও কাগজ একটুও নষ্ট করতে চায় না। আর পল্টু, তুই লিখেছিস ওপরে আর বাঁদিকে মার্জিন দিয়ে প্রতিটি শব্দ সুন্দর ও পরিষ্কার করে। তার মানে পল্টু কোনো কিছু এড়িয়ে যায় না, সব কিছুর মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। অবশ্য এগুলো মানুষের এক একটা বৈশিষ্ট্য। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।"

কথার মাঝখানে হঠাৎ চুপিসারে অরিন্দমদা ঢুকে পড়েছে। এসেই বলে—"শান্তনুবাবু, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। এমন আউটিং-এর সুযোগ আর এরকম হাসিখুশি ওয়েদার আর পাবেন ভেবেছেন? পল্টু, তুমিও...আর একে তো ঠিক....."

"আমার মামাতো দাদা-কাম-বন্ধু, ভিলাইতে থাকে। কাল বিকেলে এসেছে।"

"ভেরি গুড। তুমিও চলো। ভালোই হল, মনটা খচখচ করছিল তিনজনে যেতে হবে বলে। কী নাম বললে, শান্ত? বেশ নাম, দুর্দান্ত।"

"শান্ত নয়, অরিন্দমদা, সান্তু।"

"ওই হল। নামে কিবা আসে যায়, কাজে পরিচয় পাই। কোথায় থাকো? ভিলাই? এসো, হাত মিলাই।"

শান্তনুদা বলল—"বেশ মুডে আছেন মনে হচ্ছে, পুজোর লেখাটেখা শেষ?"

"একটা রহস্যকাহিনি লেখা বাকি। প্লট পাচ্ছি না। আপনিও দু'মাস ছিলেন না, পল্টুবাবুরও পরীক্ষা চলছিল। একদম ড্রাই। দিননা একটা প্লট। কে জানে, কোনো ফিল্ম ডাইরেক্টরের নজরে পড়ে যেতে পারে।"

"কোথায় যাবার জন্যে তাড়াহুড়ো করছেন? প্লট কিনতে যাবেন? রাজারহাটে প্লট বিক্রি হচ্ছে। মিনিমাম তিন কাঠা।"

অরিন্দমবাবু হাসিতে ফেটে পড়ে বললেন—"খাসা বলেছেন। ওই পথ দিয়েই যাব। বসিরহাট। আমার এক বন্ধু দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর মাসখানেক হল দেশে ফিরেছে। লেকটাউন এলাকায় বিশাল ফ্ল্যাট কিনেছে। ওর এক মাসি থাকতেন বসিরহাটে। একা

থাকতেন, ছেলেপুলে নেই। মাসপাঁচেক আগে মারা গেছেন। মাসির যেহেতু নিকট আত্মীয় বলতে কেবল এই বোনপো, মানে আমার বন্ধুটি....।"

"তাই মাসি সব সম্পত্তি এই বোনপোর নামে উইল করে দিয়ে গেছেন। তা, কত লাখের সম্পত্তি? আট-দশ? প্রবেটের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে?"

"সব জলের মতো বলে দিলেন, মশাই। এত সহজ প্রশ্নপত্র হলে তো বাঁ হাতে পরীক্ষা দিতাম। আমার বন্ধুটির ভাগ্যে মাত্র দু-তিন লাখ টাকার সম্পত্তি—মানে বসিরহাটে মাসির বাগানবাড়ি, পুকুর আর ব্যাঙ্কে কিছু টাকা যেটা নাকি পেতে এখনও পাঁচ বছর। আমার বন্ধুর সন্দেহ যে মাসির উইলটা কেউ মাসিকে দিয়ে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে লিখিয়েছে।"

"এরকম সন্দেহের কারণ?"

"আমি অত ডিটেল্‌সে জানি না। আমাদের নেমন্তন্ন করেছে চিংড়িমাছ খাওয়ার জন্য। ওখানে গিয়েই কথা হবে। আমার সঙ্গেই ওর প্রায় দশ বছর বাদে দেখা হবে।"

"দেখুন, কোনো রহস্য-ফহস্য হলে কিন্তু আমি নেই। তবে চিংড়ির গন্ধটা পেতে শুরু করেছি।"

"আহা, চলোই না কেন।" পল্টু ও সান্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুই

বসিরহাট পৌঁছতে এগারোটা হয়ে গেল। তাও অরিন্দমবাবুর গাড়ি চালানোর হাত ভালো বলে। ওনার বন্ধু সুগত দত্ত, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, বারাসাত মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন হলুদ রঙের নতুন সান্ত্রো নিয়ে। পল্টুদের টাটা সুমো ছিল বলে এবং সকলের সঙ্গে পরিচিত হবেন বলে উনি পল্টুদের গাড়িতে চলে এলেন। ওনার গাড়িতে দু-জন লোক কতকগুলো বড়ো বড়ো হটবক্স, আইসবক্স, পিচবোর্ডের কার্টুন এসব নিয়ে বসে আছে। বোধ হয় কাজের লোক। প্রাথমিক আলাপ পরিচয় পর্বটা গাড়িতেই হয়ে গেল। ভদ্রলোক প্রায় দশ বছর বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরে একটা কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করার কথা ভাবছেন। একটা সাইবার কাফেও খোলার প্ল্যান আছে। পল্টু নিজের সাবজেক্ট পেয়ে সারা রাস্তা গল্পে কাটিয়ে দিল।

প্রায় বিঘেখানেক জমির ওপর একটা দোতলা বড়োসড়ো বাড়ি। একটা মাঝারি

সাইজের পুকুর আর লাগোয়া বাগান, চতুর্দিকে অযত্ন অবহেলার চিহ্ন বয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চা জলখাবার খাওয়া শেষ হলে সুগতবাবু বললেন "শান্তনুবাবু আপনার কথা অরিন্দমের কাছে অনেক শুনেছি। আপনি যে একজন নামকরা রহস্যসন্ধানী তাও জেনেছি। আমার একটা ধন্ধ আছে। সেটা নিয়ে যদি একটু ভাবেন তো আমার কৌতূহল অবসান হয়।"

"উইলের ব্যাপার তো? অরিন্দমবাবু একটু আভাস দিয়েছেন। আপনার কি মনে হয় এর মধ্যেও একটা রহস্য লুকিয়ে আছে?" শান্তনুদা নির্বিকারভাবে বলল।

সুগতবাবু একটু লজ্জিত হয়ে বললেন—"না মানে, টাকা পয়সা বিষয় সম্পত্তিটা বড়ো কথা নয়। আমার মাসিকে তো আমি ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি। উনি বালবিধবা। সন্তানাদি ছিল না বলে এবং অল্প বয়সে আমি বাবা-মাকে হারাই বলে মাসির কাছে আমি ছিলাম তার ছেলের মতো। আমি ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। আমার আপশোশ তাঁর জীবনের শেষটা আমি দেখতে পারলাম না।"

"কবে মারা গেছেন আপনার মাসি?"

"গত ফেব্রুয়ারিতে। মানে পাঁচ মাস আগে।"

"কী হয়েছিল?"

"এমনিতে চুরাশি বছর বয়স হয়েছিল। বছর কুড়ি আগে মানে এইট্টি ওয়ানে ওনার একবার হার্ট অ্যাটাক হয়। তখনও অনেক সুস্থ সবল ছিলেন। সেরে ওঠার পরে উনি একজন অ্যাটর্নি ডেকে একটা উইল করান। সেই উইলে তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী করে যান আমাকে। তাঁর সই করা সেই উইলের কপি আমার কাছে আছে। তারপরে নাইনটি টুতে আমি বিদেশে চলে যাই। সেই অ্যাটর্নি যাঁকে আমি কাকা বলি, আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। মাসি মারা যাওয়ার মাসদুই আগে উনি আমাকে ই-মেল পাঠালেন যে মাসির আবার একটা বড়ো ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। কলকাতার একটা নার্সিং হোমে তাঁর চিকিৎসা চলছে। নার্সিং হোমটা অ্যাটর্নিকাকার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তারের। এও জানালেন যে আমি যেন উদ্বিগ্ন হয়ে দেশে ফিরে না আসি। টাকাপয়সার কোনো সমস্যা নেই। কোনো চিন্তা না করতে। এও লিখেছিলেন যে হার্ট প্রব্লেম ছাড়াও মাসির কিডনিও ঠিকমতো কাজ করছিল না।"

সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনছিল। মাঝখানে একজন কাজের লোক এসে

সুগতবাবুকে জিগ্যেস করে গেল যে চিংড়ি মাছের মালাইকারি রাঁধবে না অন্য কিছু।

অরিন্দমবাবু বললেন, "তারপর কী হল?"

"এর কয়েকদিন পরে, মাসি মারা যাওয়ার সপ্তাহখানেক আগে, অ্যাটর্নিকাকা জানলেন যে মাসি এখন বেশ ভালো আছেন। হাঁটা-চলা করতে পারছেন। কিন্তু নার্সিং হোমে আর থাকতে চাইছেন না। নিজের হাতে বন্ড সই করে, কোনো ডাক্তার দায়ী নয় লিখে নার্সিং হোম থেকে রিলিজ নিয়ে নিয়েছিলেন।"

"তারপর কোথায় ছিলেন?" শান্তনুদা জিজ্ঞেস করল।

"অ্যাটর্নিকাকা লিখেছিলেন যে শেষ সাতদিন উনি অ্যাটর্নিকাকার বাড়িতেই ছিলেন। বেশ সুস্থ ছিলেন। হঠাৎই একদিন ঘুমের মধ্যে হার্ট ফেল করেন। তখনও উনি আমাকে আসতে বারণ করেছিলেন। মারা যাওয়ার দুদিন পরে আমাকে জানালেন যে মাসি মৃত্যুর আগের দিন উইল বদলে দিয়েছেন এবং অ্যাটর্নিকাকাকে সেই উইলের এগ্‌জিকিউটর করে গেছেন।"

শান্তনুদা একটু বিস্ময় প্রকাশ না করে বলল—"রিভাইজড উইলটা নিশ্চয় আপনি দেখেছেন? কী ছিল সেই উইলে?"

"মাসির যাবতীয় ব্যাংক ব্যালান্স, কলকাতায় দুটো বাড়ি, পঞ্চাশ ভরি সোনার গহনা, প্রচুর শেয়ার, সব মিলিয়ে বিশ-বাইশ লাখ টাকার অ্যাসেট উনি নার্সিং হোমের মালিক ডাক্তারের নামে দিয়ে গেছেন এবং এই বাড়ি-পুকুর-বাগান আর কিছু টাকা আমার নামে দিয়ে গেছেন। এই উইলটারও এগ্‌জিকিউটার করে গেছেন অ্যাটর্নিকাকাকে।"

"ডাক্তারকে দেওয়ার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়? অ্যাটর্নি ভদ্রলোককে দিলেও না হয় একটা মানে থাকত যে উনি শেষ বয়সে মাসির দেখাশোনা করেছেন। ডাক্তারকে কি উনি অনেকদিন ধরে জানতেন?"

"আমার জানা নেই। আমি তাঁকে দেখা দূরে থাক, মাসি বা অ্যাটর্নিকাকার কাছে কোনো দিন তাঁর নামও শুনিনি।"

শান্তনুদা বলল—"আপনি এখন কী চাইছেন, মানে কী ভাবছেন?"

সুগতবাবু একটা বিরক্তির সঙ্গে বললেন—"দেখুন, দশবছর বিদেশে থেকে টাকাপয়সা আমিও কিছু কম জমাইনি। তার ওপর, শুনেছেন বোধ হয়, আমার কেউ নেই, বিয়ে থা করিনি। আমার সন্দেহ হচ্ছে ডাক্তারের পরামর্শে অ্যাটর্নিকাকা কোনোভাবে ইচ্ছের বিরুদ্ধে মাসিকে দিয়ে উইলটাতে সই করিয়ে নিয়েছেন। আমি অবশ্য এসব

নিয়ে ওনাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, এমনকি আমার সন্দেহটা বুঝতেও দিইনি। কী জানেন, এটা ভেবে দুঃখ পাচ্ছি যে আমি যেহেতু মাসির শেষ সময়টার ওঁর কাছে থাকিনি, সেহেতু উনি রাগে বা অভিমানে বঞ্চিত করে গেছেন।"

"উইলটা তো আপনি দেখেছেন বললেন। কে লিখেছেন উইলটা, মাসি নিজে না অন্য কেউ, না টাইপ করা?"

"বাংলায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা। বোধ হয় অ্যাটর্নিকাকার কোনো মুহুরি লিখেছেন। তবে সই মাসির এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

বাড়ির ভেতর থেকে একজন কাজের লোক এসে একটা ইঙ্গিত করতেই সুগতবাবু বললেন—"চলুন রান্না হয়ে গেছে। খেয়ে, দেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা গ্রাম দেখব। কী প্রীতমবাবু, সান্তুবাবু, তোমাদের গ্রাম দেখতে ভালো লাগে না?"

দুজনেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। শান্তনুদা বলল—"ভেবেছিলাম, আজকের দিনটায় অন্তত গুরুগম্ভীর চিন্তাভাবনা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু কথায় বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ভালো একটা প্রশ্নপত্র হাতে ধরিয়ে দিলেন।"

অরিন্দমবাবু অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—

"ওই আসে, ওই গন্ধ ভরা চিংড়ি মাছের মালাই,
রহস্যময় উইল নিয়ে করুন মগজ ঝালাই।"

সকলের উচ্চ হাসিতে ঘর ভরে গেল।

বিকেলে ফেরার পথে শান্তনুদা সুগতবাবুকে বলল—"আপনি যদি আমাকে উইলের ফাইলটা একবার দেন, তো আমি একটু মাথা ঘামাতে পারি। সত্যি বলতে আপনি একটু নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন।"

"অবশ্যই দেব। কাল সকাল দশটা নাগাদ যাচ্ছি।"

তিন

অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে ফাইলটা দেখার পর শান্তনুদা বলল—"দ্বিতীয় উইলটা বিলকুল জাল। এ উইল আপনার মাসি করেননি। করতে পারেন না। আমি এখনই নব্বইভাগ নিশ্চিত। বাকি দশভাগ কাল বলব। আমাকে একবার নার্সিংহোমটায় যেতে হবে এবং এই দ্বিতীয় উইলের চোদ্দআনা উত্তরাধিকারী ডাক্তার হিমাংশু ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"আর অ্যাটর্নিকাকার সঙ্গে দেখা করবেন না?" সুগতবাবু জিগ্যেস করলেন। তাঁর চোখে মুখে বিস্ময় আর উদ্বেগ।

শান্তনুদা বলল—"দরকার হবে না। আসল অপরাধীকে আমি খুঁজে নিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি কালকে আপনার কাছ থেকে সব শুনে আমি অনেকটা আন্দাজ করেছিলাম। ফাইলটা দেখার পরে সন্দেহটা সত্যে পরিণত হল। আজ দুপুরে আমি একবার নার্সিংহোমে যাবে। আপনিও চলুন না। সে রকম বুঝলে পরিচয় দেবেন না।"

পরদিন সকালে অরিন্দমবাবু জানালেন যে উনি আধঘণ্টার মধ্যে আসছেন। শান্তনুদা পল্টুকে বলল—"তার মানে অরিন্দমবাবু ধরেই নিয়েছেন যে উইলরহেস্যর জট আজ খুলছেই। তুই একটা কাজ কর, আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আর আমার টেবিলের ওপরে একটু হলদেটে খুব পুরোনো একটা খবরের কাগজ আছে নিয়ে আয়।"

দশটার কিছু আগে পরে সুগতবাবু আর অরিন্দমবাবু এসে গেলেন। পল্টু ও সান্তু খুব উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। চায়ের কাপটা শেষ করে শান্তনুদা সুগতবাবুকে জিজ্ঞেস করল—"দেশে ফিরে অ্যাটর্নিকাকার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ওনার চেহারা বা কথাবার্তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?"

"সে রকম কিছু না। শুধু বারবার আক্ষেপ করছিলেন শেষ বয়সে মাসির এই মত পরিবর্তনটা উনি মেনে নিতে পারেননি। যেহেতু উনি আমার বাবার সহপাঠী ছিলেন সেই হিসাবে বন্ধুর ছেলের প্রতি উনি একটু সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সেইজন্য নাকি উনি মাসিকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। এমনকি মাসি যখন ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরে বাবা বাছা বলে বন্ড লিখে রিলিজ ফর্মে সই করেন তখনও নাকি অ্যাটর্নিকাকা অনেক বারণ করেছিলেন নার্সিং হোম থেকে রিলিজ না নিতে। উনি ধরেই নিয়েছিলেন যে বাড়িতে চলে এলে মাসিকে বাঁচানো মুশকিল। আসলে নিয়তি যখন টানে মানুষের তখন কিছু করার থাকে না।"

"আপনার বাবা যখন মারা যান আপনার তখন বয়স কত ছিল?"

"দশ বছর।"

"আপনার এখন বিয়াল্লিশ। মানে বত্রিশ বছর আগে। বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স এখন হত পঁচাত্তরের আশেপাশে।"

"রাইট।"

"আপনার বাবা তো ডাক্তার ছিলেন, তাই না? কোথায় পড়তেন? মেডিক্যাল কলেজে?"

"ঠিক। মাসি আমার মা-র থেকে এগারো বছরের বড়ো ছিলেন। আমার বাবা-মাকে মাসি ভীষণ স্নেহ করতেন।"

"আচ্ছা সুগতবাবু, ডক্টর হিমাংশু ব্যানার্জীকে আপনি কখনও দেখেছেন, বা তাঁর নার্সিং হোমে কখনও গিয়েছেন?"

"না। কখনও যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। আর এখন যাওয়ার প্রবৃত্তিও নেই। মনে হয় ঐ ডাক্তার ব্যানার্জীই মাসিকে বশ করে জোর করে উইলে সই করিয়েছেন।"

শান্তনুদা এবারে যথেষ্ট গম্ভীর হয়ে বলল—"আপনার মাসি দ্বিতীয় উইলে সই করেননি। অন্য কেউ করেছে।"

"মিস্টার মজুমদার, প্রথম উইলের সইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় উইলের সই হুবহু মিলে যাচ্ছে। এমনকি, ফাইলে দেখেছেন নিশ্চয়, নার্সিং হোমে উনি যে রিলিজ দিয়ে চলে এসেছিলেন, সেই ফর্মের সইটা অবধি দ্বিতীয় উইলের সইয়ের সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে।"

"ডাক্তারের কৃতিত্বটা তো এইখানেই। ডাক্তার ব্যানার্জী জানতেন একজন উইলকারীকে যদি শারীরিক এবং মানসিক দুই দিক থেকেই একশোভাগ সুস্থ বলে প্রমাণ করা না যায় তবে সেই উইলকারী সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় উইলে সই করেছে এটা আইনের চোখে সন্দেহাতীতভাবে এস্টাব্লিশ করা শক্ত। সেজন্য মাসিকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ প্রমাণ করার জন্য তাঁর নামে রিলিজ ফর্ম সই করিয়ে তাঁকে নার্সিংহোম থেকে বাড়িতে আনিয়ে নতুন উইল সই করানো হয়। আইনের চোখে আর কোনো বাধা রইল না। আর কেউ কখনও বলতে পারবে না যে অসুস্থ লোকের স্বাক্ষর করা উইল; 'আন্ডার ডিওরেস' করা হয়েছে, সুতরাং গ্রাহ্য নয়। অসাধারণ গেম প্ল্যান। তবে আমি নিশ্চিত যে দ্বিতীয় উইলের লেখা ও সই এবং নার্সিং হোমের রিলিজ ফর্মের লেখা ও সই একই ব্যক্তির এবং সেই ব্যক্তি মাসির অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন।"

সুগতবাবু হতভম্বের মতো বসে আছেন। ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। সকলেই একটা ঘোরের মধ্যে আছে দেখে শান্তনুদা আবার শুরু করল—"বুঝতে পারছি

সুগতবাবু, আপনার মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। যে কোনো সাধারণ মানুষেরই এটা হতে বাধ্য। কিন্তু গ্রাফোলজি যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁদের পক্ষে এটা ডিটেক্ট করা খুব একটা কঠিন নয়। একটা জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি। ভালো করে দেখুন...।"

শান্তনুদা টেবিলের ওপর থেকে ম্যাগনিফাইনিং গ্লাসটা তুলে সুগতবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—"এই দেখুন, এটা এইট্টি ওয়ানের উইলের কপি, আর এটা এই বছরের বদলানো উইল। দুটোতেই 'লাবণ্যপ্রভা সরকার'-এর সই খুব স্পষ্ট। কিন্তু একবারও কী আপনাদের মনে সন্দেহের উদয় হল না যে চৌষট্টি বছর বয়সে করা একজনের সই তাঁর চুরাশি বছর বয়সেও, দুবার হার্ট অ্যাটাক এবং কিডনি ফেলিয়োরের পরেও, অবিকল একরকম হয় কী করে। তাছাড়া দ্বিতীয় উইলে মাসির স্বাক্ষরটা দেখে কি একজন সুস্থ, সবল নীরোগ অপেক্ষাকৃত কমবয়সী লোকের স্বাক্ষর বলে মনে হচ্ছে না? মোর ওভার, আপনার মাসির মেডিকেল রেকর্ডে এক জায়গায় আমি দেখেছি শেষের দিকে উনি পারকিনসন রোগেরও শিকার হয়েছিলেন। আর এই দেখুন, নার্সিংহোমের রিলিজ ফর্ম, যেটার হাতের লেখা এবং সই দুটোই ডাক্তার ব্যানার্জীর, আপনার মাসি এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি শুধু জানতেন তাঁর রোগমুক্তি হয়েছে বলে তাঁকে নার্সিংহোম থেকে রিলিজ করা হয়েছে। দ্বিতীয় উইলের বিন্দুবিসর্গও তাঁর জানা ছিল না।"

সুগতবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছেন। মুখমণ্ডলে একটা রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে। অরিন্দমবাবু, পল্টু, সান্তু কারোর মুখে কথা নেই। কয়েক সেকেন্ড পরে সুগতবাবুর মুখ থেকে অস্পষ্ট কটা কথা বেরিয়ে এলো—"ব্লাডি ডাক্তার হিমাংশু ব্যানার্জী, স্কাউন্ড্রেল, আমি তোমাকে দেখে নেব।"

"স্কাউন্ড্রেল বললে কম বলা হবে। উনি একজন মার্ডারার। একজন চুরাশি বছরের অসুস্থ রোগী, যাঁর দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, কিডনি ফেল করছে, ব্লাড প্রেসার ফেল করছে তাঁকে স্রেফ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নার্সিংহোম থেকে সরিয়ে বিনা চিকিৎসায় বাড়িতে ফেলে রেখে দ্রুত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়াকে মার্ডার ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। হি ইজ এ মার্ডারার।"

"এখানেই শেষ নয় সুগতবাবু। প্রমাণ আরও আছে। এই খবরের কাগজটা দেখুন। নাইটিন এইট্টি সিক্সের। চতুর্থ পাতার নীচের দিকে একটা খবর আছে হিমাংশু ব্যানার্জী

নামে একজন অসৎ ব্যক্তি উকিল সেজে এক ধনী বিধবার বিপুল সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন। এ জন্য তাঁর এক বছর জেলও হয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল বিহারের মুজফ্‌ফরপুরে। এই ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে অপরাধীর ছবিটা দেখুন, সুগতবাবু, চাপদাড়িটা সরিয়ে দিলে আপনার চেনাচেনা লাগলেও লাগতে পারে।''

সকলে হুমড়ি খেয়ে ছবিটার দিকে নজর দিল।

শান্তনুদা সুযোগ বুঝে বলল—''গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এক রাউন্ড চা হয়ে যাক।''

চার

চা খাওয়া শেষ। সকলের চোখেমুখে অগাধ বিস্ময়। সুগতবাবুই নীরবতা ভাঙলেন। বললেন—''ডাক্তার ব্যানার্জী শুধু জালিয়াতিই করেননি, উনি আমার মাসিকে খুন করেছেন আমি আজই ওনার নামে এফ. আই. আর. করে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বার করব।''

শান্তনুদা ফাইল ওলটাতে ওলটাতে বলল—''পণ্ডশ্রম হবে। স্রেফ পণ্ডশ্রম। পুলিশের বাবাও ডাক্তার ব্যানার্জীকে ধরতে পারবে না। ভারতের রাষ্ট্রপতিও নয়।''

''কেন, কেন? ডাক্তার ব্যানার্জী কি ভারতবর্ষে নেই?'' সুগতবাবুর চোখে মুখে উদ্বেগ।

''না, ডাক্তার হিমাংশু ব্যানার্জী বলে কেউ নেই। কোনোকালে ছিল না, এখনও তাই।''

সুগতবাবু এবারে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললেন—''কী বলছেন আপনি মিস্টার মজুমদার। তাহলে উইলের সই জাল, নার্সিং হোমের রিলিজ ফর্ম জাল, মাসিকে পরোক্ষে মার্ডার করা—সেগুলো কোন্ ডাক্তার ব্যানার্জীর কাজ?''

ঠোঁটের কোণে সেই চিরাচরিত বিজয়ীর হাসিটা ফুটিয়ে এনে শান্তনুদা বলল—''আপনার পিতৃতুল্য অ্যাটর্নিকাকা শ্রী পুর্ণেন্দুশেখর বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করুন। কী উত্তর পাবেন জানি না।''

নিখোঁজ হিরের রহস্য

সোমুকাকাকে দেখে যে রকম চিন্তিত মনে হল, আগে কখনও সেরকম দেখা যায়নি। শহরের ব্যস্ততম সলিসিটার, সমস্ত বড়ো-বড়ো বিজনেস গ্রুপ যাঁর ক্লায়েন্ট তাঁকে চিন্তিত দেখে শান্তনুদা পর্যন্ত অবাক। কোনো খবর না দিয়ে সাতসকালে আচমকা সোমুকাকাকে আসতে দেখে শান্তনুদা বলল—কী ব্যাপার? আড্ডাবাজ লোক এরকম ব্লটিংপেপারের মতো চুপসে গেলে ভালো লাগে? কী হয়েছে খুলে বলুন তো।

সোমুকাকা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এমন ভাব করে হাতের ব্যাগটা আর মোবাইল ফোনটা টেবিলে রেখে সোফায় পিঠ এলিয়ে দিয়ে বললেন, ব্যাপারটা সত্যিই ভেরি ভেরি সিরিয়াস। আমার ছাব্বিশ বছরের প্রফেসনাল কেরিয়ারে এরকম হিউমিলিয়েশনের মুখে আগে কখনও পড়িনি। মানসম্মান সব কিছু নিয়েই টানাটানি। এখন তুমিই আমার পরিত্রাতা।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে সোমুকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই বলতে শান্তনুদা ও পল্টু ছাড়াও একটু আগে অরিন্দমবাবুও এসে গেছেন। বসিরহাটের কাছে একজনের বাগানবাড়িতে মাছ ধরতে যাবার প্ল্যান আছে। সোমুকাকার আচমকা আবির্ভাব এবং আবির্ভূত হওয়ামাত্র 'সিরিয়াস প্রব্লেমে' শান্তনুদা এতটাই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল যে অরিন্দমবাবুর সঙ্গে সোমুকাকার আলাপ করাতেও ভুলে গিয়েছিল। খেয়াল হতেই বলল—সরি সোমুকাকা, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিইনি। ইনি অরিন্দম দাশগুপ্ত, পেশায় অধ্যাপক, নেশায় শিশু সাহিত্যিক। বেশ নাম করেছেন। অনেকগুলো বইও আছে। আমাদের বন্ধু বলতে পারেন। আর অরিন্দম, ইনি সমরজিৎ ঘোষ, বিখ্যাত সলিসিটর। নাম শুনেছ নিশ্চয়।

শান্তনুদা পল্টুর দিকে একটা ইশারা করে সোমুকাকার পাশে গিয়ে বসে বলল—বলুন, আপনার সিরিয়াস প্রব্লেমটা কী। কিসের হিউমিলিয়েশন বলছিলেন।

—দেখো, ভালো করে মন দিয়ে শোনো। এই বৃদ্ধবয়সে চুরির অপবাদ গায়ে লাগলে কারোর ভালো লাগে। আজ অব্দি কেউ একটা কালির ফোঁটা ছেটাতে পারল না, তা না এক কোটি টাকা দামের হিরে চুরির কলঙ্ক। এখন তুমি ছাড়া কেউ আমাকে মুক্তি দিতে পারবে না।

—আপনি কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। কার হিরে, কিসের চুরি, কোথাকার কলঙ্ক, কে ছিটোল—সবটাই হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে সোমুকাকা। একটু পরিষ্কার করে বললে আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

সোমুকাকা ঘরের চারদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলেন। অরিন্দমবাবুর চেহারাটা আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—তুমি অদ্রীশ সেনের নাম শুনেছ? একসময় কলকাতার সেরা ধনীদের একজন ছিলেন। এখন অবশ্য অবস্থা পড়তির দিকে। বয়স হয়ে গেছে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও আছে। ওনার একসময়.....।

—ডুয়ার্সে চা বাগান ছিল না? আলিপুরদুয়ারে আর শিলিগুড়িতে বড়ো বড়ো দু'খানা এস্টেট ছিল। তাছাড়া দার্জিলিংয়ের কাছে একটা প্রাসাদোপম গ্রীষ্মাবাসও করেছিলেন। তখনকার দিনে প্রায় কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি। সাহেবরাও প্রচুর খাতির করত। স্যার-ট্যার পাবার কথাও শুনেছিলাম।

—আপনি দেখছি অনেক কিছু জানেন। কীভাবে জানলেন, মানে.....।

—আসলে আমিও তো নর্থবেঙ্গালের ছেলে। বর্ন অ্যান্ড ব্রট-আপ বলতে পারেন। ছোটোবেলায় বাবার কাছে শুনতাম। এখন অবশ্য অনেক বছর হল কোনো খবর পাই না। আমি নর্থবেঙ্গালের পাট চুকিয়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছি তা প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর হবে।

সোমুকাকা একটু উৎসাহিত হলেন। বললেন, এই অদ্রীশ সেন ভদ্রলোক জীবনে প্রচুর পয়সা উপার্জন করার সুবাদে প্রচণ্ড ফাস্ট লাইফ লিড করতেন। আকণ্ঠ ভোগ বিলাসে ডুবে থাকার জন্য শেষজীবনে সব সম্পত্তিই এক এক করে খোয়াতে শুরু করলেন। সেই বিশাল এস্টেট দুটোও আর নেই, চা বাগানও কবেই বিক্রি করে দিয়েছিলেন। দার্জিলিংয়ের বাড়িটা আছে। আঠারো বছর বিদেশে কাটিয়ে আসার পর এখন যোধপুর পার্কে একটা বড়োসড়ো বাড়ি কিনে বছর দশেক আছেন। দার্জিলিংয়ের বাড়িটা বিক্রি করতে চাইছেন। সেই ব্যাপারে ভ্যালুয়েশন ইত্যাদি খোঁজখবর করার জন্য আমাকে ডেকেছিলেন।

শান্তনুদা বলল—ভদ্রলোকের কেউ নেই? মানে ছেলেপুলে বা কোনো বংশধর?

—সে সব কথায় পরে আসছি। আগে আমার সমস্যার কথা শোনো, মানে যে জন্য তোমার কাছে আসা। গতকাল সকালে উনি আমাকে ওনার বাড়িতে ডেকেছিলেন। ওনার কাছে একটা মূল্যবান গোলকোন্ডা হিরে ছিল। বত্রিশ ক্যারেটের। এখনকার

বাজারে এক কোটির কাছাকাছি। অবশ্য এটা ওনার অনুমান। আমাকে যা বলেছিলেন, তাই বলছি। বছর তিরিশ আগে কোথাকার এক রাজা যেন, নামটা বলেছিলেন, এখন মনে পড়ছে না, ওনাকে উপহার দিয়েছিলেন বন্ধুত্বের স্মারক হিসাবে। সেই হিরেটার বর্তমান বাজারদর যাচাই করার জন্য একজন বিখ্যাত হিরে-ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ওনার এক বিশ্বস্ত বন্ধুর মারফত। গতকাল সকালে সেই হিরে-ব্যবসায়ী একজন সহকারীকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। আমি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অদ্রীশবাবুর বিশ্বস্ত বন্ধু,.... যিনি হিরে-ব্যবসায়ীকে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন, এবং ওনার ম্যানেজার কাম প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস্টার হ্যারল্ড বক্‌সি বলে একটি বছরতিরিশের ছেলে। ও হ্যাঁ, এছাড়াও ওনার বাড়িতে হাজির ছিলেন ওনার গুরুদেব মহারাজ অতুলকীর্তি।

সোমুকাকা একটু থামলেন। টেবিলে চা দিয়ে গেছে খানিক আগেই। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললেন—একতলার ড্রইংরুমে হিরেটা দেখানো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘরের একটা কর্নারে একটা সুদৃশ্য টুলের ওপর কাচের বাক্সে হিরেটা রাখা ছিল। ঘরের জানলা-দরজা সব আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মেন গেটও বন্ধ এবং তিন-চারজন উর্দিপরা পাহারাদার সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখছিল গেট এবং চারপাশের পাঁচিলের দিকে। দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা ভল্ট থেকে হিরেটা যখন বের করে কাচের বাক্সে রাখা হল, তখন কী বলব শান্তনু, ঘরের দেয়ালে সিলিঙে সোফায় আলমারিতে বিচিত্র রঙের দ্যুতি খেলে গেল। কী অপূর্ব সেই দীপ্তি, শান্তনু, বলে বোঝাতে পারব না। প্রাথমিক অভ্যর্থনা, পরিচয়বিনিময় এবং চা-পর্বের পরে কাচের বাক্স থেকে হিরেটা বার করে একটা রুপোর থালায় রেখে ওপরে সুদৃশ্য লাল ভেলভেটের রুমাল ঢাকা দিয়ে সোফার সামনে সেন্টারটেবিলে রাখা হল। অদ্রীশ সেন একটা হুইলচেয়ারে বসেছিলেন।

—কেন? হুইলচেয়ার কেন? উনি কি হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড?

—হ্যাঁ, শান্তনু। প্রথমেই তোমাকে বলেছিলাম না ওনার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে। উনি হাঁটতে পারেন না। আমি অবশ্য কিছু জিজ্ঞাসা করিনি এ বিষয়ে। যাই হোক, ভল্ট থেকে হিরেটা বার করে কাচের বাক্সে রাখা এবং কাচের বাক্স থেকে রুপোর থালায় করে টেবিলে রাখা এই কাজটা করেছিলেন ওনার সেক্রেটারি মিস্টার হ্যারল্ড বক্‌সি। অদ্রীশ সেন নিজের হাতে ভেলভেটের রুমালটা তুলে হিরেটা দু আঙুলে ধরে

সবাইকে দেখালেন। সত্যি কথা বলতে, বুঝলেন অরিন্দমবাবু, এত বড়ো হিরে আমি কোনোদিন দেখিনি। উপস্থিত প্রত্যেকে হিরেটা হাতে করে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর অদ্রীশ সেন আবার সেটাকে রুপোর প্লেটে রেখে ভেলভেটের রুমাল ঢাকা দিয়ে টেবিলে রেখে দিলেন আগের মতো। কথাবার্তা হয়ে যাবার পরে সেই হিরে ব্যবসায়ী দু'জন ওটার জন্যে পঁচাত্তর লাখ দাম অফার করলেন। অদ্রীশ সেন তাতে রাজি না হওয়ায় ভদ্রলোক দু'জন ওনাকে ভেবে দেখার অনুরোধ জানিয়ে পরে আসার কথা বললেন। এর ফাঁকে ওই সেক্রেটারি ছেলেটা, কী যেন নাম, ও বক্‌সি, হ্যারল্ড বক্‌সি, ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে গেছেন। অদ্রীশ সেন আমাকে সবিনয়ে অনুরোধ করলেন হিরেটা ভল্টে রেখে দেবার জন্য। আর তখনই ঘটল সেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা।

সবাই উৎকর্ণ হয়ে সোমুকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এর পরে কী বলেন শোনার জন্য।

সোমুকাকা বললেন—আমি ভল্টের কাছে গিয়ে চাবি দিয়ে ভল্টটা খুললাম। তারপর রুমালটা থুলেই দেখি প্লেটটা ফাঁকা। হিরে উধাও।

সবাই একসঙ্গে 'অ্যাঁ' বলে চিৎকার করে উঠল। শান্তনুদা বলল—কী বলছেন আপনি, স্ট্রেঞ্জ। পল্টু নোট লেখা থামিয়ে শান্তনুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অরিন্দমবাবু বললেন তারপর কী হল।

—কী আর হবে। আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন তো। অত দামি একটা জিনিস সকলের চোখের সামনে কর্পূরের মতো উবে গেল। নিজের ওপরেই এত রাগ হচ্ছিল। সেক্রেটারি ছেলেটাই বা এই সময় কেন চলে গেল, আর আমিই বা মরতে কেন ওটা রাখার দায়িত্বটা নিতে গেলাম। ও হ্যাঁ, একটা ইমপর্টান্ট কথা তোমাদের বলা হয়নি। হিরেটা টেবিলে রাখার কয়েক সেকেন্ড আগে বছর পঁয়ত্রিশের একটা সুদর্শন ছেলে, যাকে বলে হ্যান্ডসাম, স্মার্ট, ইয়ং চ্যাপ, ঘরে ঢুকতেই অদ্রীশ সেন বললেন—এসো এ্যালবার্ট, বোসো। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন আমার একমাত্র ছেলে। অ্যালবার্ট লিংডো সেন। ছ'বছর বয়সে আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল। সাতাশ বছর পরে আমার সন্ধান করে পরশুদিন এসেছে। এখন ওর বয়স তেত্রিশ। এই সাতাশ বছরে ওর কোনো খবর আমি পাইনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর, আমি ধরেই নিয়েছিলাম

ও আর বেঁচে নেই। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, যে আমার একমাত্র ছেলেকে আমি মৃত্যুর আগে ফিরে পেলাম।

শান্তনুদা বলল—অদ্রীশ সেনের ছেলে অ্যালবার্ট 'লিংডো' হল কেমন করে? তাছাড়া ছ'বছর বয়সে হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে উনি সাতাশ বছর পরে চিনতে পারলেন কী করে? ওই যে ওনার হারিয়ে যাওয়া ছেলে সেটা উনি বুঝলেন কীভাবে?

সোমুকাকা বললেন—এটা তো যে কোনো লোকের স্বাভাবিক প্রশ্ন। আমার মনেও তো ওই প্রশ্ন এসেছিল। উনি নিজের থেকেই বললেন যে উনি সব প্রমাণ নিয়েই তবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে অ্যালবার্ট ওনারই ছেলে। আর 'লিংডো' পদবি কেন সেটা আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, হিরেটা তো উধাও হয়ে গেল। আমরা সবাই তখন ঘরের মধ্যে বসে, সেক্রেটারি ছাড়া। অ্যালবার্ট, ওনার সেই বিশ্বস্ত বন্ধু, এমনকি গুরুদেব অতুলকীর্তি মহারাজ পর্যন্ত ছিলেন।

পল্টু বলল—তারপর কী হল সোমুকাকা? আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করল? পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি?

—হয়নি আবার। আমার তো প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। অদ্রীশ সেন রাগে ঠকঠক করে কাঁপছেন আর আমার মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন। সবাইকে ধমকের সুরে বললেন—কেউ ঘর ছেড়ে যাবেন না প্লিজ। পুলিশকে আসতে দিন। নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যেই কেউ হিরেটাকে লুকিয়ে রেখেছেন। কেউ ছেলেমানুষী করবেন না প্লিজ। এত দামি একটা জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করার অর্থই হল নিজের বিপদ ডেকে আনা। হ্যারল্ড, তুমি এখুনি লোকাল থানায় ফোন করো। দরকার হলে সি. পি. কে ধরে লাইনটা আমাকে দাও।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন—সমরজিৎবাবু, যদি মজা করার জন্যেও হিরেটা লুকিয়ে থাকেন তো দিয়ে দিন। পুলিশে রিপোর্ট হয়ে গেলে কিছু করার থাকবে না।

অরিন্দমবাবু বললেন, এ তো বড়ো রহস্যময় ব্যাপার। শান্তনু মজুমদারের আইডিয়াল কেস। কী বল প্রীতম? আমাদেরও একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চার হয়ে যাবে। তবে মাছ ধরার প্ল্যানটা যে বানচাল হতে চলেছে বেশ বোঝা গেল। তাই না শান্তনুবাবু?

—সার্টেনলি নট। প্ল্যান যা ছিল তাই হবে। বসিরহাট যাচ্ছিই। তবে দুটো অ্যাসপেক্ট চেঞ্জ হয়েছে। এক, যাব ভায়া যোধপুর পার্ক-গড়িয়াহাট-বাইপাস। আর দুই হল

সোমুকাকা আমাদের কোম্পানি দেবেন। ব্যস, রেডি হয়ে নিন। পল্টু, তুই লালবাজারে ডি. সি. (সাউথ) কে ধর তো।

পল্টু বলল—তুমি সোমুকাকাকে মাছ ধরতে নিয়ে যাচ্ছ গাড়িতে ডিটেইলস্ কথাবার্তা বলার জন্য, তাই না শান্তনুদা?

শান্তনুদা কিছু না বলে কাঁধটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে সোমুকাকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—পুলিশ কি আপনাকে সন্দেহ করছে?

দুই

অদ্রীশ সেনকে দেখে বোঝায় উপায় নেই যে জীবনের উৎকৃষ্ট সময়টাতে উনি প্রচণ্ড ভোগ-বিলাসের মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন। বয়স যে পঁয়ষট্টি ছাড়িয়ে গেছে বোঝার উপায় নেই। পরিধানে গলা থেকে পা পর্যন্ত গেরুয়া আলখাল্লা। কর্মচারীর সংখ্যা দশ-বারো ছাড়িয়ে যাবে মনে হয়। ম্যানেজার হ্যারল্ড বক্সি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে ড্রইং রুমে বসাল। সোমুকাকা আগের থেকে খবরটা দিয়ে রেখেছিলেন বলে অদ্রীশ সেনের মধ্যে কোনো ব্যস্ততা বা অবাক হওয়ার ভাব নেই।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে শান্তনুদা অদ্রীশ সেনকে জিজ্ঞেস করল—হিরে উধাও হওয়ার ব্যাপারে আপনি কাউকে সন্দেহ করছেন?

—সন্দেহ করাটাই তো আমার পক্ষে অপরাধ। কাল যাঁরা উপস্থিত ছিলেন হিরেটা উধাও হওয়ার সময়, তাঁরা সকলেই এত সম্মাননীয় এবং বিশ্বাসভাজন যে কাউকে সন্দেহ করাটা তাঁর কাছে অত্যন্ত অসম্মানের। এই যেমন সমরজিৎবাবুর কথাই ধরুন না কেন। উনি টেবিল থেকে রুমালঢাকা প্লেটটা তোলবার আগে পর্যন্ত আমি রুমালের ওপর দিয়ে ফিল করেছি যে হিরেটা ছিল। কী রহস্যময় ব্যাপার বলুন তো। ম্যাজিকও হার মেনে যাবে।

—আচ্ছা অদ্রীশবাবু, আপনি হিরেটা হাতে নেওয়ার আগে শেষবার ওটা কে স্পর্শ করেছিলেন?

—গুরুদেব অতুলকীর্তি মহারাজ। হিরেটা ভল্ট থেকে যখনই বার করা হয়, তোলার সময় গুরুদেব আশীর্বাদ করে হাত ছুঁয়ে দেন। কাল কী যে হল!

শান্তনুদা সন্ধানী চোখে ঘরের চারদিক নিরীক্ষণ করে চলেছে। ঘরের দেয়ালে একটা

চার পাঁচ বছরের ছেলের অনেকগুলো ছবি। নানা ভঙ্গিমায়। কখনও ক্রিকেটব্যাট হাতে, কখনও স্কুলের পোশাকে, কখনও মা-র সঙ্গে। ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকটা দামি শো-কেস। তাতে বই ছাড়া অনেক রকমের কিউরিও। কয়েকটা জিনিস লাল ভেলভেটের রুমাল দিয়ে ঢাকা। শান্তনুদার খেয়াল হল যখন চা-বিস্কুট এসেছিল তখনও ট্রেটা লাল ভেলভেটের রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল। হয়তো এ বাড়ির রীতি। একটু পরে শান্তনুদা নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা যে দু'জন হিরে-ব্যবসায়ী এসেছিলেন তাঁদের সন্দেহ করছেন না? বা আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু রুদ্রশেখর তরফদারকে?

অদ্রীশ সেন একটু বিরক্ত হলেন বলে মনে হল। প্রকাশ না করে ঠান্ডা গম্ভীর গলায় বললেন—ওঁদের সন্দেহ করার কোনো প্রশ্নই নেই। প্রথম কথা ওনারা ব্যবসায়ী। জিনিস পরখ করে বেড়ানোটাই ওনাদের কাজ। বদনাম হলে ওনাদের ব্যবসার ক্ষতি হবে। দ্বিতীয়ত, ওঁরা বসেছিলেন অনেক দূরে। একবার হাতে নিয়ে দেখা ছাড়া হিরেটার কাছাকাছিও ওঁরা আসেননি। তাছাড়া ওঁরা দেখার পরে আরও তিন চারজন লোক দেখেছেন। আর আমার বন্ধু রুদ্রশেখরের কথা বলেছেন? ওঁকে সন্দেহ করাটা মহাপাপ। ওঁর মতো একশোভাগ সৎ লোক আমি জীবনে একটাও দেখিনি। যাই হোক আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে ভীষণ খুশি হলাম। পুলিশ তদন্তে নেমেছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি। তবে আমি চাই একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। সত্য উদ্‌ঘাটন হোক। সমরজিৎবাবুর কাছে আপনার কথা শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাই এবং আপনাদের আসতে বলি। পুলিশ তার নিজের পথে কাজ করছে করুক। তবে আপনি সত্য সন্ধান করুণ। হিরেটা উদ্ধার না হলে, বুঝতেই পারছেন, পরিবারের অকল্যাণ হবে। তা ছাড়া কত বছর পরে আমার হারানো ছেলেকে খুঁজে পেলাম। ওঃ কী নিশ্চিন্তই যে হয়েছিলাম না যেদিন গুরুদেব এসে ওর খবরটা দিলেন। গুরুদেবকে অশেষ ধন্যবাদ। উনি না থাকলে অ্যালবার্টকে পেতামই না। আমার এই সম্পত্তি ভোগ করত কে? সব লুটেপুটে খেত লোভী স্বার্থপরের দলগুলো।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব অদ্রীশবাবু। আপনার ছেলে, অথচ নাম আর পদবিটা ওরকম সাহেবিমার্কা হয়ে গেল কী করে?

এটা আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা দিক। তবে আপনাকে বলতে বাধা নেই।

কর্মসূত্রে আমি কয়েক বছর শিলঙে ছিলাম। তখন আমার তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়স। আমার প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। শিলঙে

থাকাকালীন আমি এক বিধবা খাসিয়া রমণীকে বিবাহ করেছিলাম। অ্যালবার্ট সেই স্ত্রীর আগের বিবাহসম্ভূত গর্ভজাত ছেলে। আমার সঙ্গে অ্যালবার্টের কোনো রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও আইনগতভাবে ও আমার পুত্র। খাসিয়া সমাজের রীতি অনুযায়ী মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং সন্তানেরা মায়ের পদবি ব্যবহার করে। তবে আমি আইনগতভাবে অ্যালবার্টকে আমার পুত্র বলে স্বীকার করেছি এবং আমার মৃত্যুর পর ও আমার সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করবে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস। অ্যালবার্টের যখন পাঁচ ছ'বছর বয়স তখন একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও ওর খোঁজ পাইনি। শেষে কয়েকদিন আগে মহারাজ আমাকে ছেলের সন্ধান দেন। পাহাড়ি অঞ্চলের একটা ধনী পরিবার ওকে বড়ো করেছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে। আমি সে সময় দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার জন্যে আমার খোঁজ তারা পায়নি। তারপর ঘটনাচক্রে মহারাজের সঙ্গে ওর দেখা হয়। মহারাজ ওর অতীত ইতিহাস জেনে আমার কাছে নিয়ে আসেন। ও হ্যাঁ, একটা কথা না বললে ফাঁক থেকে যাবে। অ্যালবার্ট নিখোঁজ হওয়ার কিছুদিন পরে ওর মা, মানে আমার স্ত্রী মারা যায়।

সবাই বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। শান্তনুদা হঠাৎ 'এক্সকিউজ মি' বলে উঠে দরজার কাছে একটা সোফায় বসে মোবাইল ফোন থেকে দুটো ফোন করল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলল—আচ্ছা অদ্রীশবাবু, মহারাজের সঙ্গে কবে থেকে পরিচয়?

—বেশিদিনের নয়। বছর খানেক হবে।

—আর হ্যারল্ড বক্‌সি কবে থেকে কাজ করছে আপনার কাছে?

—ওকে তো মহারাজই ঠিক করে দিয়েছেন। বেশ ভালো ছেলে। শিক্ষিত এবং বিনয়ী। ডিপেন্ড করা যায়।

কথার মাঝখানে আর এক রাউন্ড চা এসে গেল। চা খেতে খেতে শান্তনুদা জিজ্ঞেস করল—আপনি হুইলচেয়ারে থাকেন কেন? কোনো শারীরিক....?

বছর দুয়েক আগে একটা মোটর অ্যাক্‌সিডেন্টে আমার দু পায়ের ফিমার বোন ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। সেই থেকে আমি হাঁটা-চলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি।

শান্তনুদা বলল—মহারাজকে দেখছি না, চলে গেছেন নাকি? অদ্রীশ সেন ক্ষণিকের জন্য চমকে গেলেন। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বললেন—ও, আপনাকে বলা হয়নি। মহারাজের আজ ওনার এক শিষ্যের বাড়িতে যাওয়ার কথা, গৌহাটিতে। হ্যারল্ডকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন।

—আর হ্যারল্ড? তিনি কোথায়?

—আজ সকালে বলল, ওর এক নিকট আত্মীয় গুরুতর অসুস্থ। দেখতে যাবে। দু-তিন দিনের ছুটি চাইল।

—এ সময় ছুটি দেওয়াটা কি বিচক্ষণতার কাজ হল মিস্টার সেন? অত দামি একটা জিনিস নিখোঁজ হল। পুলিশি তদন্ত চলছে। আপনি কি ওকে সন্দেহের বাইরে রেখে দিয়েছেন?

—অফকোর্স। হিরেটা নিখোঁজ হওয়ার সময় তো ও ঘরেই ছিল না। তা ছাড়া হিরেটা তো সমরজিৎবাবু নিজে হাতে করে তুলে ভল্টে রাখছিলেন। উনি আমাদের দিকে পিছন করে ভল্ট খুলছিলেন। মানে.....।

—মানে খুব সহজ। আপনি বলতে চাইছেন যে আপনাদের দিকে পিছন ফিরে হিরেটা রাখার সময় সমরজিৎবাবু ওটা লুকিয়ে ফেলেছেন।

—আমি আর কী বলব। পুলিশে রিপোর্ট হয়েছে। কাল পুলিশ এসেছিল। সবাইকে বডিলি সার্চ করা হয়েছে। কারোর কাছেই পাওয়া যায়নি। কপাল ভালো পুলিশ কাল প্রেসকে জানায়নি। না হলে আজ সবকটা কাগজের হেডলাইন হত। তবে আমার আশঙ্কা আগামীকাল আর কাগজগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

—পুলিশ যখন সবাইকে সার্চ করেও হিরেটা পায়নি, তখন কি এটা মনে করা স্বাভাবিক নয় যে ওটা এ বাড়িতেই আছে?

—থাকলে তো ভালোই। সত্যকে খুঁজে বের করার জন্যই তো সমরজিৎ বাবুকে বলে আপনাকে আনলাম। আপনি পারেন তো খুঁজে দিন। যা পারিশ্রমিক চাইবেন দিতে আপত্তি নেই।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। অ্যালবার্টকে দেখছি না। ওকে একবার ডাকান তো।

তিন

গেটের বাইরে মোটরগাড়ির শব্দ হতেই শান্তনুদা উঠে দরজার দিকে এগোল। পল্টু, অরিন্দমবাবু আর সোমুকাকার কৌতূহলী দৃষ্টি বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত হল। ঘরের মধ্যে ঢুকলেন লোকাল থানার ও. সি.। সঙ্গে সাদা পোশাকে আরও তিনজন ভদ্রলোক। সোমুকাকা চুপিচুপি বললেন, ওই বয়স্ক ভদ্রলোক হলেন রুদ্রশেখর তরফদার, আর বাকি দুজন ইয়ংম্যান হলেন হিরে-ব্যবসায়ী, যারা কাল এসেছিলেন।

সাদা পোশাকে কয়েকজন পুলিশও এসেছে বলে মনে হল। ও.সি. মিস্টার নন্দী হাতের ইশারায় তাদের ঘরের বাইরে অপেক্ষা করার জন্য ইঙ্গিত করলেন। ও.সি. বললেন, মিস্টার মজুমদার, আপনিই শুরু করুন। আপনিই তো চিফ আর্কিটেক্ট।

শান্তনুদা অদ্রীশ সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখুন মিস্টার সেন, হিরেটা আপনার। মূল্যবান একটা জিনিস সকলের চোখের সামনে উধাও হয়ে গেলে কাউকে না কাউকে সন্দেহ করতেই হয়। কিন্তু একজন স্বনামধন্য সলিসিটর, কলকাতা তথা পূর্ব ভারত জুড়ে যাঁর খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি, তাঁকে এ কাজে সন্দেহ করতে আপনার বিবেকবুদ্ধিতে আটকাল না? শুনুন মিস্টার সেন, হিরেটা এ বাড়িতেই কোথাও না কোথাও আছে। সুতরাং ওটা নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। তার আগে বলুন তো হিরেটা আপনি কীভাবে পেয়েছিলেন।

—আমি যখন বিলেতে ছিলাম, তখন এক রাজা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে।

—তার পরদিনই আপনি ভারতে পালিয়ে আসেন অন্য একজনের পাসপোর্ট জাল করে।

—বাজে কথা। একদম বাজে কথা।

—ঠিক আছে। আপনার মনে আছে আপনি ভারতে চলে আসার দুদিন আগে লন্ডনের এক মস্ত বড়ো হিরের দোকান থেকে বত্রিশ ক্যারেটের একটা বেলজিয়াম হিরে চুরি যায়? আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আছে যে আপনি যেটাকে উপহার পাওয়া গোলকোন্ডা হিরে বলে চালাতে চাইছেন সেটা আসলে ওই চুরি যাওয়া হিরেটা। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আপনি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। আমাদের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর এবং ইন্টারপোল অনেক দিন ধরে আপনার ওপর নজর রাখছে। লোকের চোখে ধুলো দিয়ে হিরেটা পাচার করার জন্য আপনার প্ল্যান ছিল। ছেলেকে হিরেটা দিয়ে দেওয়া লোক দেখানোর জন্য। আপনার এই পরিকল্পনার কথা আপনি মহারাজকে বলেছিলেন কারণ মহারাজ আপনার অতীত জীবনের অনেক ঘটনা ঠিকঠাক বলে দিয়ে আপনার বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। আসলে যাকে আপনি মহারাজ বলে মাথায় তুলে রেখেছেন সেই অতুলকীর্তি মহারাজ হলেন একটা আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের পাণ্ডা। পুলিশ গতকাল বাদুড়িয়ার কাছে তাঁর আশ্রম থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে। আপনি যদিও খব ভালো করে জানতেন যে পৃথিবীতে কেউ আপনার হারানো

ছেলে ফেরত দিতে পারবে না, তবুও আপনি মহারাজের কথার প্রতিবাদ করেননি পাছে আপনার কুকীর্তি উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। কারণ যে বাচ্চাটাকে আপনি গাড়ির চাকার তলায় পিষে মেরে গভীর জঙ্গলে বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন সে যে কোনোদিন এসে সন্তান হিসেবে আপনার সম্পত্তির দখলদার হতে পারবে না সেটা আপনি নিশ্চিত জানতেন। মহারাজের লোভ ছিল আপনার হিরেটার ওপর। সেজন্য নিজের দলের একটা ছেলেকে আপনার হারানো ছেলে সাজিয়ে পাঠিয়েছিলেন সম্পত্তি আর হিরেটার মালিক হওয়ার জন্য। অ্যালবার্টকে একটু আগে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।

অদ্রীশ সেনের চোখমুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে। রাগে মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। অনেক চেষ্টায় কথা বলতে গিয়ে একদম ভেঙে পড়লেন। সোমুকাকা, পল্টু আর অরিন্দমবাবু হতভম্বপ্রায়। এই প্রথম বোধ হয় শান্তনুদার কোনো তদন্ত সম্বন্ধে পল্টু কিছুই জানে না।

শান্তনুদা বলল—মিস্টার সেন, আপনি ভেবেছিলেন পায়ের অ্যাক্‌সিডেন্টের কথা প্রচার করে এবং আলখাল্লা পরে আর হুইলচেয়ারে বসে থেকে জনসমক্ষে প্রতিবন্ধী হিসেবে এস্টাব্লিশ করতে পারলে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখা যায় এবং অনেক সহানুভূতি আদায় করা যায়। আপনার ওপরে পুলিশের সন্দেহ অনেকদিনের। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় পুলিশ কিছু করতে পারছিল না। সম্প্রতি একটা বড়ো কিডন্যাপিংয়ের কেসের তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ একজনের মোবাইল ফোন থেকে মহারাজের টেলিফোন নম্বর পেয়েছিল। তখন থেকেই বলতে গেলে মহারাজের গতিবিধির ওপর পুলিশের নজর ছিল। মহারাজের পরামর্শ অনুযায়ী আপনি যখন হিরেটা বিক্রি করার কথা ভাবছিলেন বা প্রচার করছিলেন তখনই গোয়েন্দাবিভাগ সুযোগ পেয়ে গেল এবং দুজন দক্ষ অফিসারকে হিরেব্যবসায়ী সাজিয়ে আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু রুদ্রশেখর তরফদারের মারফত আপনার কাছে পাঠানো হয়েছিল।

অদ্রীশ সেন প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে বললেন—আমি সব অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি মিস্টার মজুমদার। একটাই অনুরোধ, আপনার অনুসন্ধানক্ষমতা আর রহস্যভেদের পারদর্শিতা দেখিয়ে হিরেটা উদ্ধার করে দিন। অন্তত মিস্টার ঘোষকে তো সন্দেহমুক্ত করুন।

শান্তনুদা জোরে একচোট হেসে নিয়ে ও.সি.-র দিকে তাকিয়ে বলল—অসাধারণ। তুলনা নেই আপনার অভিনয়ক্ষমতার। আচ্ছা মিস্টার সেন, আপনার ফিমার বোন ভাঙার ব্যাপারটা যখন বানানো তখন দয়া করে আপনার ডানপায়ের কাঠের জুতোটা

খুলে তার মধ্যে থেকে হিরেটা বার করে সবাইকে দেখান না কেন? তবে মিস্টার ঘোষকে যেন অনুরোধ করবেন না ভল্টে রাখার জন্য। ভয়ে আর লজ্জায় ভদ্রলোকের হার্টফেল করার জোগাড়। তবে আপনার হাতের কাজ যে কোনো ম্যাজিসিয়ানকে হারিয়ে দেবে। যে অসামান্য দক্ষতায় আপনি দ্বিতীয় লাল রুমালটা, মানে নিচেরটা, হিরেসুদ্ধু তুলে হাতের তেলো দিয়ে চকিতে আলখাল্লার হাতার ভেতরে চালান করে দিলেন এবং দ্বিতীয় রুমাল দিয়ে হিরেটা সরিয়ে নেবার ফাঁকে যেভাবে ওপরের রুমাল দিয়ে সেট করে দিলেন তাতে একদম সামনে লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। ম্যাজিক শাস্ত্রে এটাকে বলা হয় পামিং (Palming)। তবে একজন লোক সব বুঝতে পেরেছিল। সেটা মহারাজ অতুলকীর্তি। কারণ হিরেটার প্রতি তারও যে ভীষণ লোভ ছিল।

ও. সি-র ইঙ্গিতমতো দু'জন সহকারী অদ্রীশ সেনের কাছে পৌঁছানোর আগেই উনি আলখাল্লার নীচ থেকে কাঠের নকল পা দুটো খুলে হিরেটা হাতে নিয়ে সুস্থ মানুষের মতো শান্তনুদার কাছে এসে হিরেটা দিয়ে দিলেন। তারপর ধীর পায়ে গিয়ে সোফার এক কোণে বসলেন।

সমুকাকাকে বেশ উৎফুল্ল দেখালো। কাল থেকে চুপসে ছিলেন। অরিন্দমবাবু বললেন—কী সমরজিৎদা, চুরির কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে কেমন লাগছে?

সমুকাকা প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন—ওফ্! ফ্যান্টাস্টিক। কিন্তু শান্তনু, তুমি তো কাল এখানে ছিলে না। তাহলে তুমি কী করে হিরেসুদ্ধ রুমালটা সরানোর কথা জানলে? কেউ বলেছে?

—ম্যাজিক। তবে মহারাজ অতুলকীর্তির ভূমিকায় শান্তনু মজুমদারের অভিনয়টা খারাপ হয়নি। আর মেক-আপটা! সোমুকাকা, আপনি দু'হাত দূরে দাঁড়িয়েও বুঝতে পারেননি যে ওটা আমি।

শান্তনুদা ও.সি. মিস্টার নন্দীকে বলল—নিন, মিস্টার নন্দী, আপনারা বাকি কাজ করে ফেলুন। আমাকে মুক্তি দিন। আমাদের এখন মাছ ধরতে যেতে হবে বসিরহাটে। অবশ্য বুঝলি পল্টু, আমাদের কিন্তু মহারাজের আশ্রমের পাশ দিয়েই যেতে হবে।

হঠাৎ শান্তনুদার চোখ পড়ল অদ্রীশ সেনের দিকে। মাথাটা সোফার একপাশে হেলে গেছে। কোনো সাড়া নেই। দেহটা নিথর। ঠোঁটের দু'পাশে ফেনা লেগে আছে।

শান্তনুদা দৌড়ে গিয়ে হাতটা তুলে নিয়ে পালস্ দেখল। তারপর রেখে দিয়ে বলল—সায়ানয়েড ক্যাপসুল। কাওয়ার্ড, শেষ যুদ্ধটাই লড়ল না। পালিয়ে গেল।

ছেঁড়া পাতার রহস্য

প্রত্যেক রবিবার সকালবেলা এই সময়টায় শান্তনুদা যা করে থাকে আজও তাই করছে। আলুর দম দিয়ে ফুলকো লুচি খেতে খেতে সারা সপ্তাহের কাগজের ওয়ার্ড জাম্বল সল্‌ভ করা ওর একটা নেশা।

ব্যাট হাতে খেলতে যাচ্ছিল পল্টু। টেলিফোনটা বেজে উঠতেই ব্যাটটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে শান্তনুদার দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠল, 'নাও ধরো গিয়ে। দ্যাখো আবার কোন্ সিংঘানিয়া না হিঙ্গোরানি ফোন করল।''

''তুই ধর।'' কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলল শান্তনুদা। তারপর পল্টুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উঠে গিয়ে রিসিভারটা ধরল।

তিন মিনিটের মধ্যে পাঁচটা 'হ্যাঁ' আর দুটো 'না' ছাড়া আর মাত্র দুটো কথাই শান্তনুদার মুখ থেকে শোনা গেল। এক, ''কত বড়ো ডায়েরি?'' আর ''আধঘণ্টার মধ্যে?'' শেষ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পল্টু সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল আজ আর খেলতে যাবে না। বেশ জমাটি একটা রহস্যের আঁচ পেয়ে চুপচাপ ব্যাটটা নিয়ে শ্যাডো-প্র্যাকটিস করতে শুরু করে দিল।

আধঘণ্টার মধ্যে লাল মারুতি থেকে যিনি নামলেন তাঁর বয়স ছত্রিশের বেশি বলে আন্দাজ করা শক্ত। ফুট ছয়েক লম্বা, প্যান্টশার্ট পরা, চোখা নাক আর দাড়ি-গোঁফ কামানো ফর্সা মুখ।

''নমস্কার, আপনিই...''

''শান্তনু মজুমদার। আপনি নিশ্চয় হিমানীশ ঠাকুর? বলুন কীভাবে আপনার উপকার করতে পারি।''

''উপকার—মানে আমার সমস্যাটা যদি আগে বলে নিই তা হলে...কিন্তু ব্যাপারটা একটু প্রাইভেটলি...''

''স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন ওর সামনে। আমার ভাই। অ্যাসিস্ট্যান্টও বটে।''

''ধন্যবাদ। সমস্যাটা হলো একটা ফোলিও ব্যাগ নিয়ে। মানে আমারই ব্যাগ। গতকাল সকালবেলা ব্যাঙ্কের লকারে গিয়েছিলাম। ধর্মতলা থেকে আসার সময় ব্যাগটা হারিয়ে

যায়। বোধহয় বাসেই ফেলে এসেছিলাম। লোকাল থানায় একটা ডায়েরিও করেছিলাম। আজ সকালে দেখি এক ভদ্রলোক, আমার অপরিচিত, ব্যাগটা ফেরত দিতে এসেছেন।"

"তবে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল।"

"সমস্যার সিকিভাগও তো এখনও বলিনি স্যার। ভদ্রলোকও ব্যাগটা পেয়েছেন অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে।"

"আপনার ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?"

"সেটাই তো রহস্য। ভদ্রলোকের নাম রবীন্দ্রনাথ পূততুণ্ড। থাকেন ৪৮জি, বনমালি নস্কর রোড, কলকাতা-৬০-এ। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে তিনি জানতে পারলেন যে এক ভদ্রলোক তাঁর কাজের লোকের হাতে ব্যাগটা দিয়ে গেছেন। ব্যাগের ভেতর নাকি রবীন্দ্রনাথ পূততুণ্ডর ভিজিটিং কার্ড ছিল। সেখান থেকেই ভদ্রলোক ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন।"

শান্তনুদা কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান। আস্তে আস্তে বলুন। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মিস্টার পূততুণ্ড আপনার ঠিকানা পেলেন কোথেকে?"

"সেও এক অদ্ভুত যোগাযোগ। রবীন্দ্রবাবুর কাজের লোক ভেবেছিল ওটা সত্যি সত্যিই তার মনিবের ব্যাগ। তাই সে সরল বিশ্বাসে ব্যাগটাকে ঘরে তুলে রেখেছিল। তাছাড়া ভদ্রলোকের হাতে ওর মনিবের ভিজিটিং কার্ড দেখে ওর মনে আর কোনো সন্দেহই দেখা দেয়নি। এদিকে ব্যাগের ভেতরে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আমার ঠিকানা লেখা ভিজিটিং কার্ড দেখে রবীন্দ্রবাবু আমার কাছে চলে আসেন।"

"কী কী ছিল ব্যাগের ভেতর? সব ঠিকঠাক পেয়েছেন তো?"

"অবিশ্বাস্য! কিছু দামি গয়না ছাড়াও হাজার তিনেক ক্যাশ ছিল। সব ঠিকঠাক আছে। নেই শুধু একটা সামান্য তুচ্ছ জিনিস, যেটার জন্য আপনার কাছে আসা। পুলিশকে আমি অবশ্য কাল বিকেলেই জানিয়ে দিয়েছি যে ব্যাগটা পাওয়া গেছে।"

"আপনার তুচ্ছ জিনিসটা কী জানতে পারি মিস্টার ঠাকুর?"

"বলতেও সঙ্কোচ হচ্ছে। আমার ব্যাগের ভেতর একটা পকেট ডায়েরি থাকে। তার শেষ পাতাটা মানে ৩১ ডিসেম্বরের পাতাটা শুধু অদৃশ্য। আমার মনে হচ্ছে ওটার মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ লেগে আছে। আমি অবশ্য পুলিশকে এ ব্যাপারটা বলিনি। আপনি যদি এই ছেঁড়া পাতার রহস্য সমাধান করতে পারেন তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার যথাযোগ্য পারিশ্রমিক....."

"কিন্তু পকেট ডায়েরির একটা সাদা পাতার জন্য আপনি এতটা আপসেট হচ্ছেন কেন আমি বুঝতে পারছি না, মিস্টার ঠাকুর।"

"না, একেবারে সাদা পাতা নয়। শেষ পাতাটায় আমার বাবার এক বন্ধুর ঠিকানা লেখা ছিল। খুব জরুরি, অথচ আমার মনেও নেই। তাছাড়া এই ব্যাগ ফেরত পাওয়ার রহস্যটাও সমাধান করা দরকার। আপনি প্লিজ চেষ্টা করে দেখুন। আমার বিশ্বাস আপনি পারবেন।"

"কথা দিতে পারছি না। আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। পরে যোগাযোগ করবেন। বাই দা ওয়ে, মিস্টার পূততুণ্ডর কাছে যে ভদ্রলোক আপনার ব্যাগটা দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ঠিকানাটা আছে আপনার কাছে?"

"সরি মিস্টার মজুমদার, ওটা নোট করতে একদম ভুলে গেছি।"

"ঠিক আছে, অসুবিধা নেই।"

"আমি তাহলে আজ আসি। ঠিকানা রেখে গেলাম। প্রয়োজনে ফোন করবেন।"

ভদ্রলোক চলে যেতেই পল্টু বিড়বিড় করে টেবিলে রাখা ভিজিটিং কার্ডটা পড়ে ফেলল—

HIMANISH THAKORE, M.A. LLB. (Tax Consultant)

314-C, Kedar Nath Mullick Lane, Calcutta-700060, Phone-77-8068

৪৮-জি, বনমালী নস্কর রোড, কলকাতা-৬০। বাড়ি খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধা হল না। একতলা বাড়ির গেটের পাশেই কাঠের নেমপ্লেটে লেখা—

RABINDRANATH PUTATUNDA. B. Mus

INSTRUCTOR, SOUTH CALCUTTA MUSIC CENTRE

রোববারের সকাল। বাড়িতে পেতে অসুবিধা হল না। বয়স পঞ্চাশের নীচে। ব্যাচিলর। বাড়িতে দ্বিতীয় লোক বলতে কর্মচারী দিলীপ। বিশ্বাসী, বহুদিন কাজ করছে।

প্রাথমিক পরিচয়ের পর শান্তনুদা বলল, "দেখুন মিস্টার পূততুণ্ড, সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো লোকের দামি গয়না, টাকা সমেত ব্যাগ যিনি ফেরত দিয়ে আসতে পারেন তার সম্বন্ধে বেশি জানতে চাওয়াটা শোভন নয়। এখন প্রশ্ন হল, আর একজনের ব্যাগ আপনার মনে করে যিনি দিয়ে গেলেন তিনি কে?"

"সম্ভবত একজন বিজনেসম্যান। আমার কাজের লোকের কাছে তিনি একটা কার্ড দিয়ে গেছেন। দাঁড়ান দেখাচ্ছি।"

পূততুণ্ড মশাই কার্ডটা এনে শান্তনুদাকে দিলেন। তাতে লেখা—

GIRIRAJ KOTHARE
(Exporter and Importer)
272, Chetla Road,
Calcutta-27

শান্তনুদার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে এপিঠ-ওপিঠ ভালো করে দেখে পল্টু ফিসফিস করে বলল, "কোনো ফোন নম্বর নেই। বিজনেসম্যান যখন ফোন নম্বর থাকাটাই স্বাভাবিক।"

শান্তনুদা একটু মুচকি হেসে কার্ডটা ওর হাত থেকে নিয়ে বলল, "ভদ্রলোককে চেনেন নাকি?"

"চেনা তো দূরের কথা, কোনোদিন নামই শুনিনি।"

"আচ্ছা মিস্টার পূততুণ্ড, একটা ব্যাগের মধ্যে দুজন লোকের ভিজিটিং কার্ড থাকাটা আপনার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি? তাছাড়া যদি কেউ ব্যাগটা কুড়িয়েই পেয়ে থাকে তবে হয় সে পুলিশে জমা দেবে, না হয় উপযুক্ত প্রমাণের বিনিময়ে সঠিক মালিককে ফিরিয়ে দেবে। এটাই স্বাভাবিক নয় কি? আপনার কি মনে হয়?"

"দেখুন, আমি গানবাজনা নিয়ে থাকি। এতকিছু তলিয়ে দেখিনি কখনও।"

"আচ্ছা, হিমানীশ ঠাকুর ভদ্রলোককে আপনার কেমন মনে হল?"

"পাঁচ মিনিটের পরিচয়ে যতটা বোঝা যায় তাতে তো ভালো বলেই মনে হল। তাছাড়া শিক্ষিত লোক, নিশ্চয় জেনুইন।"

"আপনাকে একটা কথা বলে দেওয়াই ভালো মিস্টার পূততুণ্ড। হিমানীশ ঠাকুরের ব্যাগ থেকে একটা জিনিস খোওয়া গিয়েছে বলে উনি জানিয়েছেন এবং সেটা উদ্ধার করার দায়িত্ব দিয়েছেন আমার ওপর। জিনিসটা হল ওঁর ব্যাগের ভেতর যে পকেট ডায়েরিটা ছিল তার শেষ অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বরের পাতাটা কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে। এ ব্যাপারে যদি আপনি কিছু সাহায্য করতে পারেন ভালো হয়। আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে গেলাম। প্রয়োজন হলে বিরক্ত করব। আচ্ছা আসছি।"

রাস্তায় বেরিয়ে পল্টু জিজ্ঞেস করল, "গিরিরাজ কোঠারির বাড়িতে কি এখনই যাবে না বিকেলে?"

"বিকেলে। তুই বরং একটা অটো নিয়ে বাড়ি চলে যা। আমি যাচ্ছি আধ ঘণ্টার মধ্যে।"

২৭২ নম্বর চেতলা রোডে যাঁকে পাওয়া গেল, তাঁর পদবি না বলে দিলে অবাঙালি ভাবার কোনো কারণ নেই। প্রদীপ কুমার কেডিয়া একশোয় একশো ভাগ বাঙালি। তিন-চার পুরুষ এখানেই আছেন। ওঁর কাছ থেকে গিরিরাজ কোঠারি সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেল তা হচ্ছে দুজনেই রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার লোক। বংশপরম্পরায় ছাপাশাড়ির এক্সপোর্ট বিজনেস। দুই পরিবারের মধ্যে বহুদিনের বন্ধুত্ব। কথার ফাঁকে ফাঁকে শান্তনুদা ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। তিন কামরার ফ্ল্যাট। একতলায়। সুন্দর ছিমছাম সাজানো ড্রইংরুম। এককোণে একটা পুরনো আমলের লোহার সিন্দুক। টেবিলে একটা ফটোস্ট্যান্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে শান্তনুদা জিজ্ঞেস করল, "আপনার সঙ্গে ওই ভদ্রলোকটি কে মিস্টার কেডিয়া?"

"আরে ওই তো গিরিরাজ। আমরা দুজনে জিগরি দোস্ত ছিলাম।"

"ছিলাম মানে? এখন তিনি কোথায়?"

"বছর দুয়েক আগে একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। খুব অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করত। নিজে গাড়ি চালিয়ে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে গিয়ে দেখি গোটা শরীরটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। মাথাটা থেঁতলে গিয়ে কিছু চেনার উপায় নেই। কেবলমাত্র পোশাক আর জুতোর সাহায্যে শনাক্ত করেছিলাম। গাড়ির নম্বরপ্লেটটাও অবশ্য হেল্প করেছিল।"

"আপনাদের মধ্যে রিলেশন কেমন ছিল জানতে পারি কি?"

"বরাবরই ভীষণ কর্ডিয়াল ছিল। তবে শেষের দিকে দেখতাম ও আর আমাকে আগের মতো ট্রাস্ট করতে পারছিল না। আমরা বিজনেস পার্টনার ছিলাম। কিন্তু একদিন আমি বুঝতে পারলাম ও আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছে।"

"এই সিন্দুকটা কি আপনার বাবার?"

"না, এটা আমাদের ফার্মের সম্পত্তি ছিল। গিরিরাজ মারা যাওয়ার পর ওটা আর খোলা হয়নি। সেই থেকে পড়ে আছে।"

"কারণ?"

পল্টু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সিন্দুকটা দেখছিল। কেডিয়া নিস্পৃহভাবে বলতে লাগল, "ওটাতে একটা কম্বিনেশন লক আছে। কম্বিনেশন নম্বরটা আমাদের দুজনের কাছেই নোট করে রাখা ছিল। গিরিরাজ মারা যাওয়ার কয়েক দিনে আগে আমার নম্বরটা হারিয়ে যায়। আর গিরিরাজের নম্বরটা থাকত ওর মানিব্যাগে। এমনই দুর্ভাগ্য যে ওর ডেডবডি থেকে মানিব্যাগটাও রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা, এই সিন্দুকটার মধ্যে কী আছে? এটা কি কোনোদিন খোলা হবে না?"

"জানেন তো আমরা মাড়োয়ারি ফ্যামিলির ছেলে। ওটার মধ্যে কিছু মূল্যবান জুয়েলারি আর প্রপার্টির দলিল আছে। গিরিরাজ মারা যাওয়ার পর আমি কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। কোর্টের রায় অনুযায়ী মারা যাওয়ার দু বছরের মধ্যে ওর কোনো উত্তরাধিকারী যদি ক্লেম না করে তবে আমি ওটা ভেঙে খুলতে পারি। আগামীকাল ৩১ ডিসেম্বর রাত বারোটায় দু বছর পূর্ণ হচ্ছে।"

"সবশেষে আর একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবেন না।"

"না না, মনে করার কি আছে। তদন্তের খাতিরে..."

"আপনি হিমানীশ ঠাকুর বা রবীন্দ্রনাথ পূততুণ্ড বলে কাউকে চেনেন?"

"প্রথমজনের নামই শুনিনি। দ্বিতীয় জনের নামটা শোনা শোনা। কী করে বলুন তো? গানের আর্টিস্ট কি?"

"এগজ্যাক্টলি। চেনেন নাকি?"

"মাস ছয়েক আগে একটা মিউজিক কনফারেন্সে আলাপ হয়েছিল। তবে গত দু-তিন মাসের মধ্যে আর হয়নি। খুব ভালো লোক।"

"আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি মিস্টার কেডিয়া। আপনাকে একটা কথা বলা খুব জরুরি বলে মনে হচ্ছে। একটু সাবধানে থাকবেন। মনে হচ্ছে আপনার কোনো বিপদ হতে পারে।"

"আপনি মশাই অন্তর্যামী নাকি? একেবারে আমার মনের কথাটা বলে ফেললেন। কয়েক মাস ধরে বুঝতে পারছি কেউ আমাকে দিনরাত ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।"

"নির্ভয়ে থাকুন। সেরকম কোনো ক্ষতি হবে না।"

ট্যাক্সিতে পল্টু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে পূততুণ্ড ডায়েরির পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে গয়না-টয়না সমেত ব্যাগ ফেরত দিয়ে নিজের সততা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে নির্দোষ এস্টাব্লিশ করে গিরিরাজ কোঠারির ওপর সব দোষ চাপানোর চেষ্টা করেছে। আমার মনে হয় গিরিরাজ কোঠারির নামে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে পূততুণ্ড সবাইকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে।"

"তোর বিশ্লেষণ কারেক্ট। তবে সব অনুমানের সত্যতাই নির্ভর করছে হিমানীশের ডায়েরির শেষ পাতায় কী ছিল তার ওপর। আমার মনে হয় এটাই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত যে ব্যাগ পাওয়া এবং ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে পূততুণ্ড সম্পূর্ণ সত্যি কথা বলেনি। কিন্তু কেন?"

রাত্তিরে খাবার সময় পল্টু জিজ্ঞেস করল, "এবারে নিউ ইয়ার্স ইভ সেলিব্রেশন হচ্ছে না তাহলে?"

"কেন? না হওয়ার কারণ?"

"কারণ তুমি এই কেসটার ব্যাপারে এতটাই অ্যাবসর্বড হয়ে আছ যে অন্য কিছু ভাবতে পারছ না।"

"ঠিক আছে, এখন শুয়ে পড়। আমার কিছু পড়াশোনা আছে। কাল সকালে কথা হবে। গুড নাইট।"

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শান্তনুদার কথামতো নটার মধ্যে সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেল টেলিফোনে।

লোকাল থানার ও. সি. মিস্টার রক্ষিত, সাব ইনস্পেক্টর মিস্টার বিশ্বাস এবং আরও কিছু গণ্যমান্য লোক ছাড়াও মিস্টার কেডিয়া এবং মিস্টার পূততুণ্ডকেও আসতে বলা হলো। কেবল হিমানীশ ঠাকুর জানালেন যে উনি আসতে পারবেন না, কারণ আজই রাজধানী এক্সপ্রেসে ওঁকে দিল্লি যেতে হবে। বিকেল চারটেয় ট্রেন। আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।

ড্রইংরুমের মাঝখানে বিশাল টেবিল। চারপাশে চেয়ার। ন'টার আগেই প্রায় সবাই এসে গেছেন কেবল কেডিয়া আর পূততুণ্ড ছাড়া। সাড়ে নটায় মিস্টার পূততুণ্ড এসেই দেরির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "মিস্টার কেডিয়ার বাড়ির দিক থেকে আসছিলাম সন্ধের সময়, দেখলাম বাইরের দরজায় তালা দেওয়া হয়তো কোথাও গেছেন।"

টেলিফোনটা বাজতেই শান্তনুদা রিসিভার তুলল। মিনিটখানেক কথার ফাঁকে শুধু একটা বাক্যই সবাই শুনতে পেল, "ঠিক আছে, আপনি বাড়ি ফিরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চলে আসুন। সাবধানে আসবেন। কোনো অসুবিধা হলে ফোন করবেন।"

পনেরো মিনিটের মধ্যে আবার যে ফোনটা এলো সেটা অ্যাটেন্ড করে রিসিভারটা রেখে শান্তনুদা মিস্টার রক্ষিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে। যেটা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হলো। প্রদীপ কেডিয়া সন্ধের সময় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য সল্টলেকে ওঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে পেছনের দরজা ভেঙে কেউ বাড়িতে ঢুকে সিন্দুক খুলে সর্বস্ব নিয়ে গেছে। সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, সিন্দুকটা অক্ষত আছে। অর্থাৎ কেউ ওটাকে খুলে জিনিসগুলো হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আরো একটা ব্যাপার ঘটেছে। একটা পকেট ডায়েরির ৩১ ডিসেম্বরের পাতা পাওয়া গেছে সিন্দুকের ভেতরে।"

ঘরের মধ্যে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। পূততুণ্ডকে বেশ চঞ্চল এবং নার্ভাস লাগছিল। মিস্টার রক্ষিতের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলার পর শান্তনুদা সকলকে শুনিয়েই বলল, "আপনি এঁদের সবাইকে নিয়ে এক্ষুনি কেডিয়ার বাড়িতে চলে যান। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।" শান্তনুদা টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে মিস্টার রক্ষিতের জিপ স্টার্ট নিয়ে নিল।

প্রদীপ কেডিয়ার ড্রইংরুমে বসে কথা হচ্ছিল চা খেতে খেতে। সিন্দুক এবং ডায়েরির পাতা খুঁটিয়ে দেখার পর শান্তনুদা চেয়ারে বসে বলল, "মিস্টার কেডিয়ার সঙ্গে প্রথম দিন কথা বলেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সমস্ত রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই সিন্দুক যেটা ৩১ ডিসেম্বর রাত বারোটার পর প্রদীপবাবুর অধিকারে চলে যাবে।"

সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। শান্তনুদা আবার শুরু করল, "মিস্টার পূততুণ্ড শিল্পী মানুষ। ভীষণ ধর্মভীরু। তাই উনি যখন আমাকে গিরিরাজ কোঠারির কার্ডটা দেখালেন তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম উনি কোনো তথ্য গোপন করার চেষ্টা করছেন এবং সেটা ভয়ে। আচ্ছা মিস্টার পূততুণ্ড, গিরিরাজ কোঠারিকে আপনি কোনোদিন দেখেননি। স্বভাবতই ওঁর নামটা আপনার অজানা থাকতেই পারে। কিন্তু ২৭২ নম্বর চেতলা রোডের ঠিকানাটা যে আপনার ভীষণ চেনা এবং ওখানে আপনি একাধিকবার গেছেন প্রদীপবাবুকে গান শোনাতে সেটা আপনি আমার কাছে গোপন করেছেন। দ্বিতীয়ত,

হিমানীশ ঠাকুরের পকেট ডায়েরির শেষ পাতায় একটা ঠিকানা দেখে সেটা টুকে রেখেছিলেন এই ভেবে যে ওটা কোঠারি অ্যান্ড কেডিয়ার বন্ধ সিন্দুক খোলার ব্যাপারে হেল্‌পফুল হলেও হতে পারে।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে সবাই পূততুন্ডর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। উনি কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। থামিয়ে দিয়ে শান্তনুদা বলল, "দাঁড়ান, আমি শেষ করিনি। ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রের পরে যে সিন্দুকটা পুরোপুরি প্রদীপবাবুর মালিকানায় চলে যাবে সেটা আপনিও জানতেন। কিন্তু তালার কম্বিনেশন নম্বরটা আপনার জানা ছিল না। তা সত্ত্বেও আপনি আজ সন্ধেবেলায় একটা ভুল খবর পাঠিয়ে কেডিয়াকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়ে সিন্দুক খোলার চেষ্টা করার কথা ভেবেছিলেন। অ্যাম আই কারেক্ট, মিস্টার পূততুণ্ড?"

পূততুণ্ড কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। বাইরে একটা গাড়ির শব্দ হতেই শান্তনুদা উঠে বারান্দায় গেল। সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন হিমানীশ ঠাকুর। শান্তনুদা বলল, "কী মিস্টার ঠাকুর, দিল্লি যাওয়া ক্যান্সেল করলেন নাকি? অন্য কোথাও প্রোগ্রাম ছিল?" তারপর ওঁর উত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই বলল, "আপনারা শুনে হয়তো অবাক হবেন, হিমানীশবাবুও এই সিন্দুক-রহস্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। আসলে সিন্দুকের খবরটা উনিও জানতেন এবং প্রদীপ কেডিয়াকে ফাঁকি দিয়ে সিন্দুকের সম্পত্তি হস্তগত করতে চেয়েছিলেন। কারণ, যেভাবেই হোক কম্বিনেশন নম্বরটা ওঁর জানা ছিল।"

হিমানীশ ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আপনি এসব কী বলছেন মিস্টার মজুমদার? আমার ডায়েরির শেষ পাতাটা হারিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে তদন্ত করতে বলেছিলাম, কারণ ওটা আমার কাছে অত্যন্ত...."

"জরুরি ছিল?"

"নিশ্চয়। আমার ব্যাগটা যে হারিয়ে যাবে এবং ফেরত পাওয়ার পর ডায়েরির শেষ পাতাটা যে কেউ ছিঁড়ে নেবে সেটা আমি ভাবিনি।"

"আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না মিস্টার হিমানীশ ঠাকুর, ওরফে গিরিরাজ কোঠারি।"

সকলের চোখ চকচক করে উঠল। একটা গুঞ্জন শোনা গেল।

"আপনাদের অনেকের হয়তো মনে আছে দু বছর আগে অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ১৯৯১, সমস্ত দৈনিক কাগজে একটা চাঞ্চল্যকর খবর ছিল যে কলকাতার এক মর্গ থেকে একটা মৃতদেহ চুরি গেছে। এখনও তার কিনারা হয়নি। যদি বলি গিরিরাজ কোঠারি মারা যাননি, মর্গ থেকে চুরি করা মৃতদেহের গায়ে গিরিরাজের পোশাক পরিয়ে মুখটা থেঁতলে বিকৃত করে দিয়ে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে লোকচক্ষে গিরিরাজকে মৃত সাব্যস্ত করে দিয়ে "কেডিয়া অ্যান্ড কোঠারি"র সমস্ত সম্পত্তি হাত করতে চেয়েছিলেন, তাহলে কি আপনি অস্বীকার করবেন মিস্টার ঠাকুর?

"আপনার এসব অলীক কল্পনাপ্রসূত কথার কোনো উত্তর আমি দেব না। কী প্রমাণ আছে আমার বিরুদ্ধে?"

"অযথা উত্তেজিত হবেনা না, মিস্টার কোঠারি। গত দু বছরে আপনার সমস্ত কাজকর্মের একটা ছক যদি আমি এঁকে ফেলি এবং সেটাকে প্রজেক্টরে প্রজেক্ট করি তাহলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—"

"প্রদীপ কেডিয়ার সঙ্গে বুদ্ধিতে আপনি কোনোদিনই পেরে উঠতেন না। তাই চেয়েছিলেন "কেডিয়া অ্যান্ড কোঠারি" ফার্মের সমস্ত সম্পত্তি ছলে-বলে-কৌশলে হস্তগত করবেন। নকল অ্যাকসিডেন্টে গিরিরাজ কোঠারিকে লোকসমক্ষে মৃত প্রমাণিত করার পর প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে মুখের চেহারা পাল্টে নাম নিলেন হিমানীশ ঠাকুর। তারপর এখানে এসে ফ্ল্যাট কিনলেন। আপনারা খেয়াল করলে বুঝতে পারতেন যে গিরিরাজ এবং হিমানীশ দুটো নাম সমার্থক। গিরিরাজ কোঠারির ভিজিটিং কার্ডে কোঠারি বানান ছিল KOTHARE। আর আপনার ভিজিটিং কার্ডে ঠাকুর বানান ছিল THAKORE। শুধু লেটারগুলো উল্টেপাল্টে দিলেই এটা সম্ভব হয়। সিন্দুকের তালার কম্বিনেশনটাও চমৎকারভাবে লিখে রেখেছিলেন ডায়েরির শেষ পাতায় পিন কোডের মধ্যে। আসলে পিন কোড নম্বরটাই হচ্ছে কম্বিনেশন নম্বর। আপনার উপস্থিতি যে প্রদীপ কেডিয়া আঁচ করতে পেরেছেন সেটা আপনি জানতে পেরেছিলেন। তাই নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য মিস্টার পূততুণ্ডর ঘাড়ে ডায়েরির পাতাটা চুরি করার দায় চাপাবার চেষ্টা করেছিলেন।

"আপনার পরিকল্পনা ছিল ৩১ ডিসেম্বরের আগেই সিন্দুক খুলে সব সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে রাতের প্লেনে দেশের বাইরে চলে যাবেন। সেইমতো আজ সন্ধেবেলায় যখন

প্রদীপবাবু বাড়িতে ছিলেন না তখন সিন্দুক থেকে মালপত্র বার করে সেখানে ডায়েরির ছেঁড়া পাতাটা রেখে যান যাতে পুলিশ মনে করে যে লোক ব্যাগটা আপনাকে ফেরত দিয়েছে সে-ই পাতাটা ডায়েরি থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পূততুণ্ডর ওপর সন্দেহ হওয়াটা আশ্চর্য নয়। একটু আগে প্রদীপ কেডিয়া যখন আমাকে খবর দিলেন যে উনি বাড়ি এসে দেখেছেন সিন্দুক খোলা তখনই আমি মিস্টার রক্ষিতকে এখানে পাঠিয়ে দিই আর এয়ারপোর্টে ফোন করে দিই আপনাকে গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসার জন্য। আপনি যে দুবাই যাওয়ার জন্য আজকেই প্লেনের টিকিট বুক করেছেন, এয়ার ইন্ডিয়ার অফিস থেকে আমি আগেই জেনে নিয়েছি। সরি মিস্টার কোঠারি।''

প্রদীপ কেডিয়া বিনীতভাবে বললেন, ''ঠিক আছে মিস্টার মজুমদার। ফার্মের ফিফটি পারসেন্ট পার্টনার হিসেবে অর্ধেক আমি ওর নামে ট্রান্সফার করে দেব। আমি ডিসিশন নিয়েছি আর বিজনেস করব না। বাব্বাঃ, এতদিনে ভারমুক্ত হলাম।''

''এখনও হননি মিস্টার কেডিয়া'', চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে শান্তনুদা বলল, ''আপনার তুখোড় বুদ্ধি দুটো জায়গায় আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এক ঃ নিজের সিন্দুকের কম্বিনেশন নম্বর কারোর কাছ থেকে হারিয়ে যাবে বা স্মৃতিতে থাকবে না এটা কারোর কাছেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, গোয়েন্দা বা পুলিশের কাছে তো নয়ই। দুই ঃ গিরিরাজ যে মরেনি এবং হিমানীশই যে গিরিরাজ সেটা আপনি বুঝতে পেরেছিলেন হিমানীশের আচরণ, গলার আওয়াজ এবং বিশেষ করে কথা বলার সময় ওঁর বাঁ হাঁতের আংটি নিয়ে নাড়াচাড়া করার মুদ্রাদোষ থেকে। অথচ আপনি আমাকে বলেছিলেন আপনি হিমানীশ ঠাকুরের নামই শোনেননি। তারপর আপনি যখন বললেন কেউ আপনাকে ছায়ার মতো দিনরাত্তির অনুসরণ করছে তখন আর আমার অঙ্কটা মেলাতে দেরি লাগেনি।

প্রদীপ কেডিয়াকে খুব নার্ভাস লাগছিল। বিমর্ষভাবে বললেন, ''ইউ আর ভেরি কারেক্ট মিস্টার মজুমদার। তবে আমি তো আমার শেয়ার স্যাক্রিফাইস করলাম গিরিরাজের ফেভারে। লেট হিম এনজয়।''

''বেশি চালাক সাজার চেষ্টা করবেন না মিস্টার কেডিয়া'', শান্তনুদার এরকম তেজি কণ্ঠস্বর পল্টু বেশি শোনেনি। ইস্পাত-কঠিন গলায় শান্তনুদা বলে চলেছে, ''মিস্টার

কোঠারি, সিন্দুকের ভেতর থেকে যা পেয়েছেন সেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিন। কোনো মূল্য নেই ওগুলোর। সব জাল। আপনি সিন্দুক খোলার দু ঘণ্টা আগেই যিনি সিন্দুক খুলে মালপত্র বার করে সল্টলেকের ফ্ল্যাটে রেখে এসেছেন তিনি আর কেউ নন—মহামান্য প্রদীপকুমার কেডিয়া।"

"ইউ স্কাউন্ড্রেল," বলে গিরিরাজ চেয়ার ছেড়ে কেডিয়ার দিকে উঠে আসতেই মিস্টার রক্ষিতের নির্দেশে সাদা পোশাকের পুলিশ তাদের কর্তব্য পালন করল।

শান্তনুদা পল্টুর পিঠে হাত রেখে বলল, "চল, খাবারগুলো বোধহয় ঠান্ডা হয়ে গেল।"

পল্টু হতচকিত হয়ে ঘোর-লাগা অবস্থায় জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার পূততুণ্ডর বাড়িতে গিরিরাজ কোঠারির কার্ড নিয়ে হিমানীশ ঠাকুরের ব্যাগটা তাহলে কে পৌঁছে দিয়েছিল?"

"গিরিরাজ কোঠারি ওরফে হিমানীশ ঠাকুর।"

একটি জরুরি তদন্ত

সোফায় বসে ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁ হাত দিয়ে জানলার ছোটো পর্দাটা সরিয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিল শান্তনুদা। সেই সঙ্গে নীচের রাস্তাটাও। মুখমণ্ডলে একটা বিরক্তির ছাপ এনে বলল, "খুব শিগগির ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। সকাল থেকে শুরু হয়েছে। আজকের প্রোগ্রামটা না মাটি হয়।"

পল্টু উলটোদিকের সিংগল সোফাটায় বসে একটা বই পড়ছিল। কম্পিউটারের বই, ভিসুয়াল বেসিক্স। বইটা পাশে রেখে শান্তনুদার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী প্রোগ্রাম? কোথায় যাবে? কখন? কার সঙ্গে?"

"ওরে বাবা, একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে উত্তর দেব কী করে? এ তো বাপু উকিলের জেরা। দাঁড়া দাঁড়া, এক এক করে বলছি। প্রোগ্রামটা হল, নাটক দেখতে যাব। অ্যাকাডেমিতে। সাড়ে ছটায় শো। পৌনে ছটায় বেরোব। যাব অরিন্দম দাশগুপ্তের সঙ্গে।"

"অরিন্দম দাশগুপ্ত—মানে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে এবার বুকফেয়ারে আলাপ হল? সাহিত্যিক, ভালো ছড়া গল্প লেখেন বলছিলে না? তা কখন আসার কথা ভদ্রলোকের?"

শান্তনুদা সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবিটা দু-পকেটের পাশে ধরে ঝেড়ে একটু টানটান করে নিল। তারপর হাতদুটো মাথার ওপর জোড়া করে দু-তিনবার সাইড-বেন্ড করতে করতে বলল, "আসবেন না। ভদ্রলোক ট্রামডিপোর কাছে থাকেন। কালীমন্দিরের কাছে ব্যাগের দোকানটার সামনে মিট করার কথা। তোর কী প্রোগ্রাম এখন? কম্পিউটার নিয়ে বসবি?"

নাটক দেখার কথায় পল্টুর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ওরও আজকাল নাটক দেখতে খুব আগ্রহ জন্মেছে। অবশ্য শান্তনুদার জন্যেই এটা হয়েছে। পাছে শান্তনুদা বিব্রত বোধ করে, সে জন্য মনের চঞ্চলতাকে যথাসম্ভব চেপে রেখে বলল, "নাথিং অ্যাজ সাচ। যা প্যাচপ্যাচে বর্ষা শুরু হয়েছে, কোথাও যাবার কথা ভাবলেই গায়ে জ্বর আসবে। গাড়িটা থাকলেও না হয় কথা ছিল। ভালো কথা, আমাদের গাড়িটা যেন কবে ডেলিভারি দেবে বলেছিল? পেন্টিং-এর কাজ তো গত সপ্তাহেই শেষ হয়ে যাবার কথা।"

শান্তনুদা একটু মুচকি হেসে বলল, "হয়ে গেছে। সকালে গ্যারেজ থেকে ফোন করেছিল। অরিন্দমবাবু গাড়িটা গ্যারেজ থেকে ডেলিভারি নিয়ে ট্রামডিপোয় দাঁড়াবেন বলেছেন। উনি তারাতলার কাছে এক রিলেটিভের বাড়িতে গিয়েছেন সকালে। ওখান থেকে গ্যারেজ হয়ে গাড়ি নিয়ে আসবেন। ওঁর রিলেটিভের নাটকটা দেখতে যাবার কথা। তিনটে টিকিট কাটা আছে। আসলে ভদ্রলোক গাড়ির ব্যাপারটা এত ভালো বোঝেন, আর হাতটাও এত ভালো যে ওঁকে দিয়ে একবার ট্রায়াল করিয়ে নিচ্ছি। তা তুই এখন কী করবি বললি না তো।"

"একটা ভালো সিনেমা আছে এইচ বি ও চ্যানেলে। 'ইরেজার'। ছটা থেকে। ভাবছি দেখব।"

"সোয়ারজেনেগারের? তিনবার দেখেছি। বাব্বা যা অ্যাকশন। সোয়ারজেনেরগারকেই মানায়। ঠিক আছে। তুই মুড়ি আর পাঁপরভাজা খেতে খেতে সিনেমা দেখ। আর ভালো না লাগলে বাইরে বৃষ্টি দেখতে দেখতে আর একটা মেঘদূত লিখে ফেল নব্য-কালিদাস হয়ে। আপাতত দু'কাপ চায়ের কথা বলে দে।"

দরজা দিয়ে বেরোবার আগেই ফোনটা বাজতে পল্টু রিসিভার তুলে বলল, "বলছি।" ('হ্যালো'-র বদলে এই শব্দটা ও নতুন চালু করেছে। ওদের কলেজের এক টিচারের অবদান।)

শান্তনুদার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার। গলাটা চেনাচেনা মনে হল।"

"হ্যাঁ—অরিন্দমবাবু, গুড আফটার নুন। শান্তনু বলছি....সে কী, উনি আসতে পারবেন না?...জ্বর...ভাইরাল ফিভার বোধহয়...জানি না, জিজ্ঞেস করতে হবে...মুভি দেখবে বলছিল টি.ভি তে...আসছে, ধরুন একটু...গাড়ি পেয়েছেন? ...একসেলেন্ট, কোনো প্রবলেম নেই তো? ব্রেক...ও. কে. ...এক মিনিট...."

পল্টু ঘরে ঢুকতেই শান্তনুদা রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বলল, "অরিন্দমবাবু ফোন করেছেন। ওঁর রিলেটিভ নাটক দেখতে যেতে পারছেন না, হঠাৎ জ্বর। তুই যাবি? ভালো নাটক। 'বহুরূপী'। গাড়ি নেই কিন্তু। ভেবে বল।"

"যাব। গাড়ি না থাকলেও যাব। একে তোমার সঙ্গে বেরোনো, তাঁর ওপরে বহুরূপীর নাটক। তারও ওপরে আবার—কোথায়, না অ্যাকাডেমিতে। ভাবা যায় না, ব্যাপক হয়েছে। আমি তোমাকে দু'কাপ চা খাওয়াব।"

"ঠিক আছে, অরিন্দমবাব, প্রীতম যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যা কথা আছে...পৌনে ছটায় 'লেদার

হাউস'-এর সামনে। ডোন্ট ওরি, এখনও একঘণ্টা সময় আছে। থেমে যাবে মনে হয়। ও. কে. বাই।"

সত্যিসত্যিই পল্টু তিন কাপ চা এনেছে। নিজে একটা কাপ তুলে নিয়ে ট্রে-টা এগিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার ক্যালি আছে বটে। নাও দু'কাপ চা খেয়ে এনার্জি বাড়িয়ে নাও।"

"আচ্ছা, ব্যাপকটা তো না হয় বাচনভঙ্গি থেকে বুঝে নিলাম যে একসেলেন্ট গোছের কিছু একটা হবে, কিন্তু 'ক্যালি'-টা কী বৎস? 'জ্যাক ক্যালিস?"

" ও হরি, তুমিও বোঝোনি। পাঁচিলের ভাষা।"

"কীসের? ফাজিলের?"

"পাঁচিলের। পাঁচিলে পা ঝুলিয়েই তো আড্ডা হয় আজকাল সব জায়গায়। তুমি ব্যাকডেটেড। যাকগে এখন পৌনে পাঁচ, মানে ওয়ান আওয়ার স্টিল অ্যাট আওয়ার ডিসপোজাল।"

"আওয়ার শব্দটা যমক অলঙ্কারের উদাহরণ হয়ে গেল না?"

"দেখো, ওসব অলঙ্কার-ফলঙ্কার আমি বিন্দু-বিসর্গ জানি না।...তোমার মোবাইলটা বাজছে। দাঁড়াও দিচ্ছি।"

টি.ভির ওপর থেকে মোবাইলটা নিয়ে দেখে নিয়ে বলল, "টু ফোর সেভেন ফাইভ নাইট এইট থ্রি ফোর। কার নাম্বার? ল্যান্সডাউন মিন্টো পার্ক এলাকার মনে হচ্ছে। দেখ আবার প্রোগ্রামটা না কেঁচিয়ে যায়।"

শান্তনুদার মুখ দেখে পল্টু বেশ বুঝতে পারল নাম্বারটা ওরও খুব পরিচিত নয়। মানে 'ফ্রিকোয়েন্টলি কল্‌ড'-এর মধ্যে পড়েনি।

"হ্যালো, শান্তনু মজুমদার বলছি। ওঃ হো, মিস্টার মুখার্জি। সরি, একদম বুঝতে পারিনি। বলুন কী খবর? কেমন আছেন?...ইজ ইট? ভেরি গুডকাল সকালে?—অবশ্যই যাব—না, না, গাড়ি পাঠাতে হবে না, আমার গাড়ি এসে যাবে...আবার কার্ড কেন, আপনি ফোন করেছেন দ্যাট্‌স এনাফ...আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন...আমরা জনাতিনেক যাব...ভালোই হবে, অনেকদিন থেকে ভাবছি একটা ল্যাপটপ কেনার কথা..না, না, আপনি থাকতে আর চিন্তা কী...সে দেখা যাবে'খন...আচ্ছা বাই।"

"বাব্বা! এ তো ম্যারাথন ফোন। প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস থেকে নাকি? কম্পিউটারের দোকান? কোথায় গো?"

"মুখার্জি ইনফোটেক লিমিটেড। শরৎ বোস রোডে। ওঁদের একটা ইলেকট্রনিক

গুড্‌সের দোকান ছিল। বেশ চালু। ছিল মানে এখনও আছে। কাল থেকে ওনাদের নতুন একটা ডিভিশন চালু হচ্ছে। কম্পিউটার আইটেম আর তার সঙ্গে সফ্‌টওয়ার ডেভলপমেন্ট। বিশাল প্রজেক্ট। তোর ভাষায় 'ব্যাপক' ইনভেস্টমেন্ট। কাল সকাল এগারোটায় পার্টি দিচ্ছে। ওঁর সেক্রেটারি এখনই এসে পড়বেন কার্ড নিয়ে। ফর্ম্যাল ইনভাইটেশন করতে।"

"যাচ্চলে! আসার আর কোনো সময় পেল না। একটার পর একটা বাধা...ওই বোধহয় এসে পড়লেন। আমি জামাটা গলিয়ে আসি।"

গাড়ি থামার আওয়াজ হতে শান্তনুদাও উঠে দাঁড়িয়েছে। বারান্দার দিকে এগোতেই অরিন্দম দাশগুপ্ত-র গলা..."বৃষ্টিটা ধরে যাবে ভেবেছিলাম। আপনাদের আবার ট্রামডিপো পর্যন্ত যেতে অসুবিধা হতে পারে, তার ওপর সময়ও যখন হাতে আছে, তখন চলেই এলাম। গাড়িটাও দেখে নিন। খুব ভালো কাজ করেছে। প্রীতমবাবু কোথায় গেল? যাবে তো? সে কী, আপনি এখনও তৈরি হননি দেখছি। অবশ্য সময় আছে।"

"আপনি একটু বসুন আমি চেঞ্জ করে আসছি। পল্টুও এসে যাবে। চা চলবে তো? পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

পল্টু ঘরে ঢুকেই বলল, "কেমন আছেন? চিনতে পারছেন তো? প্রীতম মিত্র। শান্তনু মজুমদার আমার দাদা হন।"

"বাঃ—এর মধ্যেই ভুলে যাব। আর তোমাদের মতো ইনটেলিজেন্ট ছেলেদের ভোলা খুব শক্ত, বুঝলে ভায়া। তোমাদের চোখ কথা বলে। তুমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়, ইলেকট্রনিক্‌স অ্যান্ড টেলি-কমিউনিকেশন, সল্টলেকে, তাই না? এবার তো বিশ্বাস করবে যে আমি এক পারসেন্টও ভুলিনি। কী জানো আমরা লেখক মানুষ। চরিত্র বিশ্লেষণ করাই আমাদের কাজ। এক একটা মুখভঙ্গি, এক একটা চাউনি, এক একটা হেঁটে যাওয়া সব আলাদা আলাদা ছাপ ফেলে যায়। জীবনই ছন্দ, ছন্দই জীবন। বইটই পড়ো? মানে বই তো পড়ো বটেই, মিন করছি বাংলা গল্প-ছড়া-উপন্যাস?"

পল্টু বুঝতে পারছিল ভদ্রলোকের জানার ইচ্ছে যে ওঁর কোনো লেখা বই ও পড়েছে কিনা। সরাসরি 'পড়িনি' বললে ভদ্রলোক দুঃখ পেতে পারেন ভেবে বলল, "না, মানে, আসলে ফোর্থ ইয়ারের সাবজেক্টগুলো এত নতুন আর খটমট, মানে অন্য বই পড়ার আর সময় হয় না। তা ছাড়া বাংলাটা..."

পল্টুকে থামিয়ে দিয়ে শান্তনুদা জামার আস্তিন গোটাতে গোটাতে বলল, "দেখ তো,

মুখার্জি সাহেবের সেক্রেটারি এলেন বোধ হয় ; গাড়ির আওয়াজ হল। কী যেন নাম বলেছিলেন ভদ্রলোকের....'' সেক্রেটারি তাই না?

''শুভ্র। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ভেতরে আসতে পারি? স্যার ফোন করেছিলেন নিশ্চয়।''

''ও হ্যাঁ। আপনাকে তো মিস্টার মুখার্জির অফিসে দেখেছিলাম। আপনি তো ওনার....!

''আজ্ঞে হ্যাঁ, মাস ছয়েক হল। কাল আমাদের...''

''আরে, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। নো হেজিটেশন। এ হল প্রীতম মিত্র, আমার কাজিন ব্রাদার, আর একে চাক্ষুষ না চিনলেও নাম শুনে থাকবেন হয়েতো। অরিন্দম দাশগুপ্ত। কবি ও গল্পকার। নামকরা শিশুসাহিত্যিক। বেশ কয়েকখানা বই আছে ওঁর লেখা।''

ভদ্রলোকের হাতে একটা ছোট্ট অ্যাটাচি। সোফায় বসে দুই হাঁটুর ওপর সেটা রেখে খুলে তার থেকে একটা সুদৃশ্য কার্ড বের করে শান্তনুদার হাতে দিয়ে বললেন, ''স্যারের সঙ্গে সব কথা হয়ে গেছে তো? আগামীকাল সকাল এগারোটায়। একটু আগে গেলে ভালো হয়। দুটো কথা বলা যাবে। আর এঁদেরও নিয়ে যাবেন কিন্তু। আপনারাও যাবেন মিস্টার দাশগুপ্ত, মিস্টার মিত্র।''

পল্টু একটু লজ্জা পেল। চাকরি বাকরি না করলে কারও নামের আগে মিস্টার শব্দটা একটু বাধো-বাধো লাগে। তবে মিস্টার না বলে মাস্টার বললে নির্ঘাত রেগে যেত।

শান্তনুদা বলল, ''থাক থাক...এতবার বলার দরকার নেই। নিশ্চয় যাব। জায়গাটা এগজ্যাকটলি কোথায় বলুন তো—ও হ্যাঁ, এই তো। কার্ডে ড্রয়িং করে দেওয়া আছে। এলগিন ক্রসিং থেকে একটু ডানদিকে। ও, এতো আপনার অফিস বিল্ডিংটাই দেখছি।''

''রাইট। ওটারই তিনতলায়। লিফ্‌ট আছে। অসুবিধা হবে না। আজ...''

''চা চলবে?''

''থ্যাংক ইউ। পরে একদিন এসে খেয়ে যাব। অনেক কাজ বাকি আছে। আমার ওপরেই পুরো পার্টিটার সব অ্যারেঞ্জমেন্টের দায়িত্ব। আসলে আমাকে ছাড়া আর কারোর হাতে দায়িত্ব দিয়ে স্যার নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। আচ্ছা চলি। কাল দেখা হচ্ছে।''

''আসুন। অফিসে তো আজ আর ফিরবেন না বোধ হয়।'' শান্তনুদা ঘড়ি পরতে পরতে বলল।

ভদ্রলোক প্রায় ওঁর গাড়ি অবধি চলে গিয়েছিলেন। শান্তনুদার কথায় একুট থেমে পিছনে ফিরে বললেন, "আজ আর অফিসে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। এখনও বারোটা নেমন্তন্ন বাকি। তারপর সোজা বাড়ি। কাল সকালে আবার সাতটার মধ্যে পৌঁছতে হবে। অফিসটাকে একটু ডেকরেট করার ইচ্ছে আছে। এটা অবশ্য কেউ জানে না। স্যারকে একটু সারপ্রাইজ দেব আর কী!"

পল্টু কিছু বলব না বলব না করেও একটা অকারণ প্রশ্ন করে বসল, "কোথায় বাড়ি আপনার? মানে কোথায় থাকেন?"

"দমদম ক্যান্টনমেন্ট।" গাড়িতে উঠে জানলা দিয়ে হাত নাড়তে নাড়তেই কথাটা ছুঁড়ে দিলেন ভদ্রলোক।

"চলুন এবার যাওয়া যাক। আকাশটা একটু ফর্সা হয়েছে মনে হচ্ছে। এই নিন চাবি। চালিয়ে দেখুন একটু। গড়বড় থাকলে ফেরার পথে দেখিয়ে নিতে হবে। কাল সকালে তো আপনাদের পার্টি।"

"আর আপনার? কোনো কাজ রাখবেন না। আমি দশটা নাগাদ আপনাকে পিক-আপ করে নেব বাড়ি থেকে। চলুন।"

নাটক দেখতে যাওয়া, নাটক দেখা এবং নাটক দেখে ফিরে আসা—পৌনে ছ'টা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত তিনজনের মধ্যে বিশেষ কথা হয়নি। শুধু যাবার সময় গাড়িতে উঠে পল্টু শান্তনুদার কনুইয়ের কাছে একটা চিমটি কেটে বলেছিল, "তখন কেন বললে যে গাড়ি নেই? তুমি তো জানতে গাড়ি অরিন্দমবাবু নিয়ে আসবেন। তা হলে?"

শান্তনুদা যেন শোনেইনি এমন ভান করে টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট চেঞ্জ করতে করতে বলল, "গাড়িটা ব্যাপক সারিয়েছে বুঝলি।"

ঠিক তখনই পিছন থেকে অরিন্দমবাবু বলে উঠলেন,

"ছোটো থেকে মন যদি থাকে লেখাপড়াতে
বড়ো হলে চারচাকা জুটে যাবে বরাতে।"

এছাড়া আর কোনো কথাবার্তা হয়নি। নাটক চলাকালীন কথা বলা কারোরই পছন্দ নয়। ফেরার সময় ট্রামডিপোয় অরিন্দমবাবুকে নামিয়ে দেবার সময় উনি শুধু বলেছিলেন, "দেখেছেন প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি। বস্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্যে কী মর্মান্তিক প্রচেষ্টা। নেমন্তন্ন কমপ্লিট করে বাড়ি যেতে কমপক্ষে এগারোটা। আবার কাউকে না জানিয়ে

অফিস সাজানোর জন্য সকাল সাতটার মধ্যে অফিসে পৌঁছাতে গেলে বাড়ির থেকে কমপক্ষে ছ'টায় বেরোতে হবে। তবে তো বস্ অন্যের থেকে বেশি ভালোবাসবে।"

খাবার টেবিলে বসার আগে দেয়ালঘড়িটায় এগারোটা ঘণ্টা পড়ল। তখনই ফোনটা আবার বেজে ওঠল। ডাইনিং স্পেসেও একটা ফোনের কানেকশন আছে। শান্তনুদা ফোনটা ধরে 'হ্যালো, মজুমদার বলছি' বলতে বলতেই ওর মুখের চেহারা পাল্টে গেল। পল্টু এই চেহারাটা ভালো চেনে। সাংঘাতিক কোনো খারাপ খবর এবং তৎক্ষণাৎ অ্যাকশন নেওয়ার বার্তা থাকে এই চেহারায়। সুতরাং উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয়। শান্তনুদা ফোন রাখার আগে শুধু বলল, "আমি আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছচ্ছি।"

ফোনটা রেখে শান্তনুদা বলল, "এখন মুহুর্মুহু ফোন আসবে। আইডেন্টিফাই না করে তুলবি না। তুই সি. এল. আইটা কানেক্ট করে দে আর এক্ষুনি অরিন্দমবাবুকে তৈরি থাকতে বল, যাবার সময় তুলে নেব।"

কথার মাঝখানে আবার ফোন। শান্তনুদা বলল, "সি. এল. আই. লাগিয়ে তারপর ধর।"

কী ভেবে নিজেই উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল এবং মিনিটখানেকের মধ্যে রেখে দিয়ে বলল, "খুব খারাপ খবর। বিশ্বজ্যোতি মুখার্জিকে একটু আগে তাঁর অফিসের মধ্যে কেউ খুন করে গেছে। প্রথমে ওঁর ছোটো ছেলে এবং ওয়ান অফ দি ডাইরেক্টরস মিস্টার দেবজ্যোতি মুখার্জি ফোন করেছিলেন। উনি ওঁর বাবার সেক্রেটারি শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে জেনেছেন। শুভ্রবাবুই পুলিশকে খবর দেন এবং পুলিশ পৌঁছেও গেছে।"

পরের ফোনটা অ্যানোনিমাস। কাঁপাকাঁপা গলায় কেউ একজন বলল, "মুখার্জি ইনফোটেকের এম. ডি. বিশ্বজ্যোতি মুখার্জি খুন হয়েছেন। পুলিশ তদন্তে নেমেছে। অবিলম্বে আপনি গোপনে তদন্ত না করলে আরও একজন খুন হতে পারে।"

পল্টু হতভম্ব ভাব কাটিয়ে ওঠার আগেই শান্তনুদা বলল, "আমি গাড়ি বার করছি। তুই ঝট করে অল্প কিছু মুখে দিয়ে তৈরি হয়ে আয়। ক্যামেরা আর পকেট টেপ-রেকর্ডারটা নিস মনে করে। রাতদুপুরে ওসব জিনিস মাথা কুটে মরলেও পাওয়া যাবে না।"

অরিন্দম দাশগুপ্তকে নিয়ে যখন মুখার্জি ইনফোটেকের অফিসে এল তখন পৌনে বারোটা। বাড়ি থেকে আসতে মাত্র বাইশ মিনিট লেগেছে। গোটা অফিসবাড়িটা পুলিশ

ঘিরে রেখেছে। থানার ও. সি., ইয়ংম্যান, শান্তনুদার পরিচিত নয়। তবে লালবাজার থেকে ডি. সি. (ক্রাইম) এসে তখনই জিপ থেকে নামলেন। বিশ্বজ্যোতি মুখার্জির বড়ো ছেলে ইন্দ্রজ্যোতি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। ডি. সি. (ক্রাইম) শান্তনুদার বেশ ঘনিষ্ঠ। দু'জনে অফিসের ভেতরে ঢুকলেন। রিসেপশনের পরেই কম্পিউটার রুম। তার পাশেই লিফ্‌ট এবং সিঁড়ি। বাঁ দিকে শুভ্রবাবুর চেম্বার, পাশে ভিজিটার্স এনক্লোজার এবং দেওয়ালের শেষপ্রান্তে মিস্টার মুখার্জি অর্থাৎ এম. ডি.-র চেম্বার। চেম্বারের ভিতর দিয়ে বিল্ডিঙের পিছনে যাবার রাস্তা। একটা ছোটো বাগানও আছে। চেম্বারের ভেতরে কার্পেটের ওপরে বিশ্বজ্যোতি মুখার্জির মৃতদেহটা পড়ে আছে। একেবারে সামনে থেকে গুলি করা হয়েছে। একটা গুলি কণ্ঠনালি ভেদ করে চলে গেছে। আর একটা কানের পাশে লেগেছে।

ডি. সি. (ক্রাইম) বললেন, "মনে হচ্ছে প্রথম গুলিটা লাগার পর ইমপ্যাক্‌টে শরীরটা ডানদিকে ঘুরে গিয়েছিল, তাই কানের পাশে লেগেছে। তবে খুনি বেশ পাকাপোক্ত লোক।"

শান্তনুদা ও. সি.-কে জিজ্ঞেস করল, "যে অস্ত্রটা দিয়ে ফায়ার করা হয়েছে সেটা বা অন্য কোনো জিনিস পাওয়া গেছে?"

"না, কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে ফিংগারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। ফোটো তোলা হয়েছে সকলের জবানবন্দি নেওয়া হবে এক্ষুনি।"

একটু পরেই বড়ো ছেলে ইন্দ্রজ্যোতি শান্তনুদাকে নিজের চেম্বারে ডেকে বললেন, "মিস্টার মজুমদার যা ঘটে গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। শুভ্রর কথা যদি সত্যি হয় তবে এখানেই শেষ নয়, আরও একটা খুন অবশ্যম্ভাবী। খুনি নাকি সেইভাবে শাসিয়ে গেছে। শুভ্র শুনেছে।"

"একটু খুলে বলুন। ঠিক বুঝতে পারছি না। শুভ্রবাবু কোত্থেকে শুনবেন? তিনি তো বাড়ি চলে গেছেন।"

"না। ও বাড়ি যায়নি। ও কালকের পার্টির জন্য অফিসটা ডেকরেট করবে বলে দশটা নাগাদ অফিসে ঢুকেছিল। তারপরেই দুর্ঘটনা ঘটে। ও আততায়ীকে দেখেনি বটে, তবে বাবার সঙ্গে আততায়ীর ঝগড়া হতে শুনেছে।"

"শুভ্রবাবু কোথায়? ডাকুন তো তাঁকে। ওঁর কাছ থেকে শুনি এগজ্যাক্‌টলি কী হয়েছিল।"

একটু পরে শুভ্রবাবু এসে বললেন, "আমি নেমন্তন্ন কমপ্লিট করে হোটেলে খাওয়াদাওয়া করে দশটা নাগাদ অফিসে আসি। তার আগে নিউমার্কেট থেকে ডেকরেশনের জিনিসপত্র কিনি। আমার কাছে অফিসের ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। অফিসে ঢুকে আমি দেখলাম এম. ডি.-র চেম্বারে আলো জ্বলছে। হয়তো যাবার সময় নেভাতে ভুল হয়েছে এই ভেবে চেম্বারের কাছে যেতেই শুনতে পেলাম মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তির উঁচু গলায় তর্কাতর্কি—

মিস্টার মুখার্জি ঃ আমি তো অনেকবার বলেছি তোমাকে চাকরিতে রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তোমার মতো বদ লোকের জন্য আমার কোম্পানিতে কোনো জায়গা নেই।

অপরিচিত লোক ঃ এতদিন আপনি আমাকে নিজের ছেলের থেকেও বেশি স্নেহ করেছেন, দরকারে অদরকারে আমাকে কাছে ডেকেছেন। আজ আপনি আপনার প্রিয় পাত্রকে পেয়ে আমাকে ভুলে গেলেন। এর বদলা আমি নেবই।

মিস্টার মুখার্জি ঃ বাজে কথা বলার চেষ্টা কোনো না। তোমার মুখ আমি ভেঙে দেব। প্রিয়পাত্রের সঙ্গে নিজেকে তুলনা কোরো না। তুমি ওর পায়ের নখের যোগ্য নও। ও যেভাবে কোম্পানির জন্য ভাবে তুমি যদি তার ওয়ান পারসেন্টও ভাবতে তবে আমি তোমাকে চাকরি থেকে তাড়াবার কথা ভাবতাম না। ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে যাও অফিস থেকে, না হলে পুলিশ ডাকব। গেট আউট ইমিডিয়েটলি।

অপরিচিত লোক ঃ ওসব পুলিশ-ফুলিশের ভয় আমাকে দেখাবেন না। ছ'মাস ধরে ভিখিরির মতো বেঁচে আছি আমি। আর আপনার প্রিয়পাত্রকে আপনি মাথায় তুলেছেন।

মিস্টার মুখার্জি ঃ বেশ করেছি। আমি এই কোম্পানির মালিক। যাকে আমার ইচ্ছে মাথায় তুলব, আবার যাকে ইচ্ছে খাদে ফেলে দেব। ভুলে যেয়ো না একজনের কথায় দয়া করে তোমায় কোম্পানিতে চাকরি দিয়েছিলাম। অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম। বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে।

অপরিচিত লোক ঃ ঠিক আছে যাচ্ছি। তবে তুই আর তোর প্রিয় পাত্র যাতে এই দুনিয়ায় আর চোখ মেলে তাকাতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করে যাব। শেষবারের মতো সবাইকে স্মরণ করে নে, শয়তান।

"আমি তখনও চেম্বারের দেয়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে

পরপর দু'খানা গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। আততায়ী যখন দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে আমি তখন ভিজিটার্স লবিতে গিয়ে টেবিলের আড়ালে মাথা নীচু করে বসে থাকি। আততায়ী চলে যাবার সময় শুধু পা দুটো দেখতে পেয়েছিলাম। তারপরেই আমি মিস্টার মুখার্জির বাড়িতে ফোন করি।"

শুভ্রর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখে মুখে ভয়ঙ্কর উদ্বেগ এবং ভয়ের চিহ্ন। ধরা গলায় বললেন, "মিস্টার মজুমদার আর একটা অমূল্য জীবন অজানা অনিশ্চিত আশঙ্কার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো সময় আর একটা প্রাণ ছিনিয়ে নেবে। কে জানে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি কে। যে কেউ হতে পারে। স্যারের প্রিয় পাত্র তো অনেক আছে। পুলিশ নিজের পথে তদন্ত করছে করুক। কিন্তু স্যার, তাতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। পোস্টমর্টেম, ফরেনসিক, ইনটারোগেশন এসব করতে অনেকদিন লাগবে। তার মধ্যে...."

"আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু পুলিশকে তার নিজের রাস্তায় চলতে দেওয়া উচিত নয় কি? আইনকানুনের ব্যাপারটাও তো মাথায় রাখতে হবে।"

ইন্দ্রজ্যোতি মুখার্জি চোখ থেকে চশমাটা খুলে বললেন, "মিস্টার মজুমদার, শুভ্রর কথায় লজিক রয়েছে। ও যখন নিজে কানে শুনেছে যে আততায়ী শাসিয়ে গেছে আর একটা খুন করবেই, তখন নিশ্চিত হয়ে বসে থাকি কী করে, ভিকটিম যখন আমাদের নিজেদের কোনো লোকই হবে। আপনি বরং আমাদের পরিবার এবং কোম্পানির তরফে একটু দ্রুত তদন্ত চালান যাতে আততায়ীকে আইডেনটিফাই করা যায় বা ভিকটিমকে বাঁচানো যায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আততায়ী আমাদের সকলেরই খুব পরিচিত এবং এই কোম্পানিকে সে অনেকদিন ধরে চেনে।"

শান্তনুদাকে বেশ বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। শান্তনুদা এর আগে অনেক জটিল রহস্যের জাল ভেদ করেছে। কিন্তু এত অসহায় খুব কম সময়েই মনে হয়েছে। চশমাটা খুলে বাঁ হাতটাকে রুমালের মতো ব্যবহার করে মুখটাকে মুছে নিয়ে বলল, "দেখুন, ব্যাপারটা যত সহজ করে আপনি বলছেন, কাজে কিন্তু ততটা সহজ নয়। একজন প্রকৃত অপরাধীকে এত তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে গেলে অনেক নিরপরাধ লোককেও সন্দেহের তালিকায় রাখতে হয়। আপনারা যদি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"আপনি একশো ভাগ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিস্টার মজুমদার। আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা আপনি পাবেন। বলুন কী করতে হবে।"

"দেখুন এই রহস্য সমাধানের জন্য আমাকে তথ্য প্রমাণের থেকে বেশি নির্ভর করতে হবে মানুষের মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। তার আগে আমি আপনাদের দুই ভাই এবং শুভ্রবাবুর সঙ্গে আলাদাভাবে মিনিট পাঁচেক করে কথা বলতে চাই। আমার সঙ্গে এই দু'জন, আমার বন্ধু মিস্টার অরিন্দম দাশগুপ্ত এবং আমার ভাই প্রীতম মিত্র, থাকবেন। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এরা আমার খুব বিশ্বস্ত লোক।"

ইন্দ্রজ্যোতিবাবু কিছু বলার আগেই ডি.সি. (ক্রাইম) দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, "এক্সকিউজ মি, মিস্টার মজুমদার, আমার কিছু ইনটারোগেশন আছে। কাইন্ডলি যদি....।"

'ওহ্! সরি সরি। নিশ্চয় করবেন। আপনারই তো কাজ এটা। সরি ফর দা ইনটারাপশন। আসুন। আমি না হয় বাইরেটা একটু দেখি।"

"আপনার আপত্তি না থাকলে বসতে পারেন। আফটার অল আপনার মতো লোক সঙ্গে থাকলে আমরা বল ভরসা পাই।"

"থ্যাংকস ফর দা কমপ্লিমেন্টস। আপনার হয়ে গেলে বলবেন।"

শান্তনুদার পেছন পল্টু ও অরিন্দমবাবু বাইরে চলে গেল। ডি. সি. (ক্রাইম) ঘরে ঢুকতেই ইন্দ্রজ্যোতিবাবু চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সাদরে বসালেন। ডি. সি. (ক্রাইম) মিস্টার চন্দ বললেন, "মিস্টার মুখার্জি ডোন্ট মাইন্ড, একটা কথা প্রথমেই বলে দিই, যেহেতু আপনারাও চাইছেন একটা দ্রুত এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, সেজন্য কাইন্ডলি কিছু গোপন করবেন না। এতে আর কিছু হোক বা না হোক তদন্তের ক্ষতি হবে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মিস্টার চন্দ। আমার তরফে ফুল কো-অপারেশনের অ্যাসিওরেন্স দিতে পারি।"

"আচ্ছা মিস্টার মুখার্জি, আপনি প্রথম কীভাবে খবরটা পান?"

"আমাদের অফিসের ম্যানেজার, মানে ওই শুভ্র বলে ছেলেটি, ও-ই টেলিফোনে খবরটা আমাকে দেয়।"

"আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

"আমি তখন পার্ক স্ট্রিটে একটা রেস্টুরেন্টে ছিলাম।"

"বারে?"

"হ্যাঁ, মানে আমার আবার সন্ধেবেলা একটু ড্রিঙ্ক করার অভ্যেস আছে কিনা। তবে বেশি নয়, মাপা দুটো।"

"আপনি যখন খবরটা পেলেন তখন ক'টা বাজে?"

"ঘড়ি দেখিনি। তবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি দশটা হবে।"

"রোজই কি এই সময় অব্দি বাইরে থাকেন?"

"না। এমনিতে আমি সাড়ে ন'টার মধ্যে বাড়িতে ঢুকে যাই, তা সে যেখানেই থাকি না কেন। হয়েছে কী, আপনাকে তো বলতে বাধা নেই, কাল নতুন অফিস ইনঅগারেশনের জন্যে সারাদিন কাজের চাপ খুব বেশি ছিল। তার ওপর একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটি হওয়ার জন্যে মুডটাও অফ ছিল। তাই একটু বেশি...."

"খেয়ে ফেলেছিলেন, এই তো, বেশ করেছেন। এতে আর অপরাধটা কোথায়। আপনি অকারণ কুণ্ঠা বোধ করছেন। ঠিক আছে আপনি যান। কাইন্ডলি যদি শুভ্রবাবুকে পাঠিয়ে দেন...."

"সিয়োর, সিয়োর।"

শুভ্রবাবু ঘরে ঢুকতেই ডি. সি. (ক্রাইম), "আপনি মিস্টার শুভ্র...."

"চট্টোপাধ্যায়। মুখার্জি ইনফোটেকের ম্যানেজার।"

"আপনার তো ছুটি হয়, যত দূর জানি, বিকেল পাঁচটায়। তা আপনি দশটা পর্যন্ত অফিসে কী করছিলেন?"

"আমি আজ তিনটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে যাই। কিছু ইনভাইটেশন কার্ড দেওয়ার ছিল। ভেবেছিলাম কার্ডগুলো ডিস্ট্রিবিউট করেই বাড়ি চলে যাব, কাল আর্লি মর্নিং এসে অফিসটাকে ডোকোরেট করব। নিউ মার্কেটের সামনে দিয়ে যেতে যেতে মনে হল ডেকোরেশনের জিনিসগুলো কিনে নিই। হঠাৎ কী খেয়াল হল ফিরে এলাম অফিসে। বাইরে থেকে দেখলাম অফিসে আলো জ্বলছে, আর উনি উচ্চৈঃস্বরে কাউকে ধমক দিচ্ছেন। অন্য লোকটিকে দেখা যাচ্ছিল না। তবে সেও স্যারের সঙ্গে বেশ উঁচু গলায় তর্ক করে যাচ্ছিল। সব কথা শোনা যাচ্ছিল না, তবে এটুকু কানে এসেছিল, লোকটি স্যারকে বলছিল 'আপনাকে আমি ছাড়ব না, দেখে নেব। আমার ওপর অন্যায়ের বদলা আমি নেবই।' তারপরেই পরপর দুটো গুলির শব্দ। আমি কিছু বোঝার আগেই লোকটা দৌড়ে বাগান দিয়ে চম্পট দিল। তখন আমি বড়দাকে আর ছোড়দাকে ফোন করি।"

"দেবজ্যোতিবাবু তখন কোথায় ছিলেন?"

"জানি না। আমি ওঁর সেলফোনে ফোন করেছিলাম।"

"আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। সত্যি জবাব দেবেন। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বিশ্বজ্যোতিবাবুর সঙ্গে যে লোকটির কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, তার গলার স্বর কি আপনার চেনা মনে হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, না, মানে...না, চিনতে পারিনি।"

"আপনি কিন্তু সত্য গোপন করছেন মিস্টার চ্যাটার্জি। নির্ভয়ে সত্যি কথাটা বলুন। কার গলা বলে মনে হয়েছিল?"

শুভ্রবাবুর হাত-পা রীতিমতো কাঁপছে। ভীষণ নার্ভাস মনে হচ্ছে। আমতা আমতা করে বললেন, "ছোড়দার গলার আওয়াজ বলে মনে হয়েছিল। প্লিজ আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি আর কিচ্ছু জানি না।"

"ঠিক আছে আপনি যান। দেবজ্যোতিবাবু বোধহয় এখানে নেই।"

মিস্টার চন্দ ও. সি. মিস্টার তরফদারকে বললেন, "শুনুন, আমি একটা আর্জেন্ট কাজে এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনি ডেডবডি সরাবার ব্যবস্থা করুন। তার আগে ফরেনসিক সংক্রান্ত যা যা করণীয় আছে করে ফেলুন। আর হ্যাঁ, দেবজ্যোতিবাবুকে যা যা কোয়েশ্চেন করার করে আমাকে রিপোর্ট দেবেন। আমি আসছি।"

ডি. সি. (ক্রাইম) যখন ইনটারোগেশনে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় শান্তনুদা পল্টু আর অরিন্দমবাবুকে নিয়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে নিয়েছে। প্রথমে শান্তনুদা ডেডবডিটা ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, "একেবারে অলট্রামডার্ন হাইলি সফিস্টিকেটেড মাইক্রো পিস্তলের সাহায্যে খুব সামনে থেকে গুলি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আততায়ী এই অফিসের নাড়িনক্ষত্র জানে। কোন্ জিনিস কোথায় থাকে, কে কোথায় বসে, কে কখন আসে যায়, সব তার হাতের তালুর মতো জানা। বিশ্বজ্যোতিবাবু তাঁর চেম্বারে কোথায় কোন্ জিনিসটা রাখেন, এমনকি তাঁর যে আজ ওই সময়ে অফিসে আসার কথা ছিল সেটাও তার জানা।"

"তুমি এত সিয়োর হয়ে কী করে বলছ?" পল্টু ক্যামেরার লেন্সে চোখ লাগিয়ে বলল। দেখ ও. সি. সাহেবের ইনটারোগেশন পর্ব শেষ হল কিনা।"

অরিন্দমবাবু বললেন, "আপনিও নিশ্চয় সবাইকে জেরা করবেন?"

"দেখি।"

তিনজন একসঙ্গে ইন্দ্রজ্যোতিবাবুর চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেল।

তিন

ফরেনসিক এগ্‌জামিনেশন, ফোটো নেওয়া, ডেডবডি সরানো ইত্যাদি কাজ মিটতে মিটতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। ইতিমধ্যে ইন্দ্রজ্যোতির নির্দেশে শুভ্র সবাইকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছে অনুষ্ঠান বাতিলের কথা। তা ছাড়া বিভিন্ন খবরের কাগজের রিপোর্টারও রিপোর্ট নিয়ে গেছে।

ইন্দ্রজ্যোতিবাবু বললেল, "মিস্টার মজুমদার, মিসহ্যাপ যা হবার হয়ে গেছে। আপনি শুভ্রর কথাটাকে একটু সিরিয়াসলি ভাবুন। দেরি করলে আর একটা জীবনহানি হবে। কার কপালে কী আছে কে জানে।"

শান্তনুদা কনফিডেনশিয়াল লেখা একটা ফাইল ওলটাতে ওলটাতে বলল, "দেখুন, আপনারা এডুকেটেড সেন্সিবল লোক। আপনাদের তো জানা উচিত যে কোনো খুনের কিনারাই এত তাড়াতাড়ি করা যায় না। তার ওপর এই জাতীয় মিস্টিরিয়াস খুন। কোনো ক্লু পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন কাউকেই সন্দেহের বাইরে রাখা উচিত নয়। এমনকি আপনাদের দুই ভাইকেও নয়। বাই দা বাই, আপনি একটু আগে বলছিলেন না আপনার বাবার সঙ্গে আজ বিকেলে আপনার তর্কাতর্কি হয়েছিল। কারণটা কী কাইন্ডলি বলবেন?"

"ব্যাপারটা একান্তই পারিবারিক। আপনাকে বলতে বাধা নেই। তবে..."

"আমি একটু আসছি, স্যার" বলে শুভ্রবাবু বাইরে বেরিয়ে যেতেই ইন্দ্রজ্যোতিবাবু বললেন, "বাবা একটা উইলের খসড়া তৈরি করে আমাকে ডেকেছিলেন মতামত দেবার জন্য। সত্যি কথা বলতে কি উইলটা আমার মোটেই মনঃপূত হয়নি।"

"কী ছিল সেই খসড়াতে জানতে পারি?"

"বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনভাগে ভাগ করে আমাকে ফর্টি পারসেন্ট, ভাইকে টোয়েন্টি পারসেন্ট আর শুভ্রকে থার্টি পারসেন্ট দেওয়ার কথা বলছিলেন। বাকি টেন পারসেন্ট কাকে দেবেন সেটা বলেননি। শুভ্রকে প্রপার্টি দেওয়ার ব্যাপারটা আমার একদম পছন্দ হয়নি। তাই বাবাকে বোঝাতে গেলে উনি ফিউরিয়াস হয়ে গেলেন।"

পল্টু একমনে নোট নিয়ে যাচ্ছিল আর অরিন্দমবাবু বাইরে বাগানের দিকটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। পল্টুও ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিয়েছে। শান্তনুদা বলল, "শুভ্রবাবুকে সম্পত্তি দেওয়ার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে?"

ইন্দ্রজ্যোতিবাবুকে একটু বিব্রত দেখাল। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, "জানি না।

বাবার এসব খামখেয়ালি আমার একদম পছন্দ নয়। আফটার অল একটা কর্মচারীকে এতটা প্রশ্রয়...।"

"শুভ্রবাবু কতদিন এই কোম্পানিতে কাজ করেছেন?"

"বেশিদিন নয়। মাত্র ছ'মাস হল জয়েন করেছে।"

"উনি কি কারোর জায়গায় এমপ্লয়েড হয়েছেন?"

ইন্দ্রজ্যোতি একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, "হ্যাঁ। শুভ্র আসলে বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে। পিটার নামে একটি ছেলে আগে ওর জায়গায় কাজ করত। বাবা বিনা কারণে তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে শুভ্রকে অ্যাপয়েন্ট করেন। ছেলেটি এখন বেশ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।"

কথার মাঝখানে দেবজ্যোতিবাবু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আসতে পারি?"

"হ্যাঁ, আসুন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।" শান্তনুদা কথা শেষ করার আগেই অরিন্দমবাবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "কী ব্যাপার, রাত্তিরে ঘুমোবার কোনো ইচ্ছে নেই বলে মনে হচ্ছে।"

শান্তনুদা বলল, "এই হয়ে এসেছে প্রায়। দেবজ্যোতিবাবু, আজ সন্ধে থেকে দশটা পর্যন্ত মানে ঘটনার আগে এবং পরে আপনি কোথায় ছিলেন এবং কী করছিলেন?"

দেবজ্যোতিবাবুর চেহারার মধ্যে বেশ রুক্ষতার ছাপ। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের চিহ্ন মুখেচোখে। বিরক্ত হয়ে বললেন, "উত্তর দেওয়াটা কি একান্ত জরুরি? ওটা আমার পার্সোনাল ম্যাটার নয় কি?"

শান্তনুদা কোনোরকম অভিব্যক্তি না দেখিয়ে বলল, "নিশ্চয় পার্সোনাল ম্যাটার। তবে যেহেতু আপনার দাদা আমাকে শীঘ্র তদন্ত করতে বলেছেন এবং যেহেতু আপনাদের কেউই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন সেহেতু আপনার স্বার্থেই উত্তর দেওয়াটা জরুরি বলে আমার মনে হয়। এখন দেওয়া না দেওয়াটা আপনার ব্যাপার।"

"আমি আজ সন্ধে থেকে ক্লাবে ছিলাম। অ্যাজ সাচ রোজই থাকি। সাড়ে দশটা নাগাদ শুভ্র আমাকে ফোনে খবরটা দেয়। আমি অবশ্য অফিসে এসেছি অনেক পরে, এগারোটা নাগাদ।"

কথার মাঝখানে শুভ্রবাবু এসে অনুরোধ জানালেন কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্য। শান্তনুদা বলল, "খাবার পরে সব্বাই একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। আপনারা বাড়ি চলে যান। ওদিকটাও সামলাতে হবে। আমরাও বাড়ি গিয়ে একটু ক্লান্তি দূর করি। তবে আপনারা

কেউ বাড়ির বাইরে যাবেন না। এভরিবডিজ লাইফ ইজ ইন ডেঞ্জার। ডি. সি. সাহেবকে বলে দিয়েছি পুলিশ প্রটেক্‌শন দেওয়ার জন্য। সকাল সাতটায় আমরা মিট করছি। কতকগুলো ইম্পর্ট্যান্ট কাজ আছে। সকলেই আসবেন কিন্তু।"

অরিন্দমবাবুও শান্তনুদার সঙ্গেই চলে এলেন কেসটা নিয়ে শান্তনুদা কী ভাবছে সেটা জানার লোভে। বিছানায় আধশোয়া হয়ে শান্তনুদা বলল, "অরিন্দমবাবু, বলতে পারেন মানুষ কেন খুন করে? মানে বলতে চাইছি কোন্ কোন্ ধরনের মানুষ কোন্ কোন্ অবস্থায় একজনকে খুন করতে পারে।"

"সরি মিস্টার মজুমদার। আমার এ ব্যাপারে কোনো ব্যুৎপত্তি নেই।"

"পল্টু একটা লম্বা হাই তুলে বলল, "না, আমারও নেই।"

"যাকগে, আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নে। অরিন্দমবাবু, আপনিও বডিটা স্ট্রেচ করে নিন। সাতটার মধ্যে মুখার্জিবাবুর অফিসে পৌঁছোতে হবে। খুব গভীর চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে, কেসটা নো ডাউট জটিল, বুঝলেন।"

সাতটার মধ্যে সবাই মুখার্জি ইনফোটেক-এর অফিসে চলে এসেছে।

ইন্দ্রজ্যোতিবাবুর চেম্বারে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শান্তনুদা বলল, ইন্দ্রজ্যোতিবাবু, পিটার ছাড়া আর কোনো এমপ্লয়িকে কি রিসেন্টলি ছাঁটাই করা হয়েছে?"

"না।"

"ঠিক আছে। শুভ্রবাবুকে বলুন আপনাদের অফিসের সমস্ত এমপ্লয়ির পার্সোনাল ফাইল আমাকে দিতে। শুভ্রবাবুর কথাকে বিশ্বাস করে যদি ধরেই নিই যে আততায়ী আর একটা খুন করতে পারে তবে তার জন্য ইমিডিয়েটলি ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আততায়ীকে ধরার চেষ্টা করতে হবে। যে কোনো খুনের তদন্তের সাধারণত যে সব ধারা বা পদ্ধতি হয় সেটা ভীষণ সময়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের হাতে সময় একদম নেই সেহেতু খুনিকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমাকে কিছু সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস করতে হবে। এবং সেজন্যই ফাইলগুলো দরকার।"

শুভ্রবাবু তিরিশ-পঁয়তিরিশখানা ফাইল টেবিলে রাখতেই শান্তনুদা বলল, "পল্টু, তুই আর অরিন্দমবাবু মিলে এই ফাইলগুলো ঘেঁটে প্রত্যেক এমপ্লয়ির চাকরির অ্যাপ্লিকেশনগুলো বের করে পেজ-মার্ক দিয়ে রাখ।"

শান্তনুদা এবার কয়েকটা উলটে আবার রেখে দিয়ে বলল, "ইন্দ্রজ্যোতিবাবু, আপনি

বলেছিলেন পিটার ছাড়া আর কোনো কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়নি। সেটা কি ঠিক? একটু ভেবে বলুন তো।"

"আমার যত দূর মনে পড়ছে ঠিক।"

শান্তনুদা এবার দেবজ্যোতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার মনে পড়ে দেবজ্যোতিবাবু? আপনিও তো এই কোম্পানির ওয়ান অফ দা ডাইরেক্টরস্, তাই না?"

"সেটা ঠিক। তবে কোম্পানির রিক্রুটমেন্টের দিকটা বাবা আর দাদাই দেখাশোনা করতেন।"

পল্টু বলল, "হয়ে গেছে। এখন দেখবে?"

শান্তনুদা অনেকক্ষণ ধরে ফাইলগুলো উলটেপালটে ডায়েরিতে কিছু নোট করল। তারপর বারান্দায় গিয়ে মোবাইল ফোন থেকে কারোর সঙ্গে মিনিটদুয়েক কথা বলল। এতদিন শান্তনুদার সঙ্গে থেকে এত জটিল কেসের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার পরেও পল্টু ওর চিন্তা-ভাবনা বিন্দুমাত্র আন্দাজ করতে পারল না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। ও. সি. মিস্টার তরফদার একান্তে বেশ কিছুক্ষণ শান্তনুদার সঙ্গে কথা বলার পর বললেন, "চলুন মিস্টার মজুমদার। দেরি করলে আপশোশ করতে হতে পারে। শুভ্রবাবুকেও নিয়ে চলুন।"

একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরকে অফিসের দায়িত্ব দিয়ে তিনজনে জিপের দিকে এগোল। মিস্টার তরফদার এবং শান্তনুদার পেছন পেছন শুভ্রবাবু যেই গাড়িতে উঠতে যাবেন একজন বলিষ্ঠ লোক ওঁর ওপর লাফিয়ে পড়তে যাবার মুহূর্তে শান্তনুদা অসামান্য ক্ষিপ্রতায় তাকে জুডোর প্যাঁচ দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। লোকটা পকেটে হাত ঢোকাবার আগেই শান্তনুদা তার কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে বলল, "তোমার খেল খতম, ডেভিড। ভালো ছেলের মতো পিস্তলটা আমাকে দিয়ে দাও। মিস্টার তরফদার, একে অ্যারেস্ট করুন। আর একটু দেরি করলে বা আমি আগে থেকে শুভ্রবাবুর দিকে নজর না রাখলে এক্ষুনি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত।"

মিস্টার তরফদার শান্তনুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিস্টার মজুমদার, আপনি এত তাড়াতাড়ি কী করে কেসটা সলভ করে ফেললেন? আমরা তো কোনো ক্লু-ই পাচ্ছিলাম না।' '

"তাড়াতাড়ি কি আর সাধ করে। নেহাত একটা নিরপরাধ জীবন শেষ হয়ে যাবার

আশঙ্কা ছিল, তাই ওঁদের এই অবস্থাতেও আমি তদন্ত করার স্বার্থে নানাভাবে বিরক্ত করেছি। একটা কথা আপনাদের জানা উচিত যে আমি অপরাধীকে ধরার জন্য চিরাচরিত তদন্তের ধারাকে বাদ দিয়ে হ্যান্ডরাইটিং অ্যানালিসিসের সাহায্য নিয়েছি। পার্সোনাল ফাইলগুলো পরীক্ষা করে আমি হাতের লেখা দেখে অপরাধীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। পিটারকে যে আপনার বাবা ছাঁটাই করেছিলেন তার ফলে তার মনের মধ্যে স্বভাবতই একটা প্রতিশোধস্পৃহা জেগে থাকবে এবং তার জন্য সে বিশ্বজ্যোতিবাবুকে খুন পর্যন্ত করতে পারে এরকম একটা সন্দেহ আমার হয়েছিল। সুতরাং আমি এমন একটা হাতের লেখা খুঁজছিলাম যার মধ্যে একজন অতৃপ্ত, একাকী, বান্ধবহীন প্রতিশোধপরায়ণ চরিত্রের খোঁজ পাওয়া যাবে। এই জাতীয় লোকের হাতের লেখা ছোটো এবং ডানদিকে হেলানো হয়। তাছাড়া যাদের ভেতর খুন করার প্রবণতা থাকে তাদের হাতের লেখা বারবার ডানদিকের মার্জিন ছাড়িয়ে চলে যায়। পিটারের হাতের লেখার মধ্যে এই বিশেষত্বগুলো থাকার জন্য প্রথমে আমি তাকেই সন্দেহের তালিকায় রেখেছি। শুভ্রবাবু যদিও বলেছিলেন যে আততায়ীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে দেবজ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বরের মিল ছিল, সেটা নেহাত কাকতালীয়।"

শান্তনুদা একটু থেমে একগ্লাস জল খেল। সবাই রুদ্ধশ্বাসে শান্তনুদার কথা শুনছিল।

মিস্টার তরফদার বললেন, "কিন্তু পিটারকে ছেড়ে আপনি ডেভিডকে পাকড়াও করলেন কী ভাবে?"

"সেটাই তো ইনটারেস্টিং। ইন্দ্রজ্যোতিবাবু একটা সত্যি কথা গোপন করেছিলেন। পিটারের মতো ডেভিডকেও বিনা কারণে ছাঁটাই করেছিলেন ওঁর বাবা। ইন্দ্রজ্যোতিবাবু অবশ্য বাবার এই কাজটা খুশি মনে নেননি, কারণ ডেভিডের চাকরি হয়েছিল ইন্দ্রজ্যোতিবাবুর রেকমেন্ডেশনে। এবং ডেভিডকেও বিশ্বজ্যোতিবাবু প্রথম দিকে খুব ভালোবাসতেন। শুভ্রবাবু আসার পরে উনি ডেভিডকেও ছাড়িয়ে দেন। স্বভাবতই ডেভিডেরও সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে বিশ্বজ্যোতিবাবু এবং শুভ্রবাবুর ওপর। ডেভিডের হাতের লেখার মধ্যে পিটারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা গেছে। তখন আমি থানায় ফোন করে দু'জনের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে বলি। পিটারের ব্যাপারে রিপোর্ট পেয়ে ওর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু না পাওয়াতে ডেভিডকেই প্রধান সন্দেহভাজন বলে ধরে নিয়ে ডেভিডকে খোঁজ করা শুরু হল। ওকে বাড়িতে পাওয়া না যাওয়ায় সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। অরিন্দমবাবু বাগানে একটা টোবাকোপাইপ কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে

দেখাতেই আমি খোঁজখবর করে জানলাম যে বিশ্বজ্যোতিবাবুসহ এই কোম্পানির বর্তমান কোনো কর্মচারী টোবাকোপাইপ খান না। এও খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে ডেভিড নিয়মিত পাইপ সেবন করে এবং ও ডানহিল পাইপ ব্যবহার করে। অরিন্দমবাবুর কুড়িয়ে পাওয়া পাইপটাও ডানহিল। তাছাড়া একটু আগে ওর কাছ থেকে যে পিস্তলটা পাওয়া গেছে সেটা দিয়েই বিশ্বজ্যোতিবাবুকে খুন করা হয়েছে। ফরেনসিক রিপোর্ট অফিসিয়ালি হাতে না আসলেও প্রাথমিক রিপোর্টে এটা প্রমাণিত।''

ইন্দ্রজ্যোতিবাবু উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, ''তা হলে আর কারোর প্রাণহানির আশঙ্কা নেই বলছেন?''

শান্তনুদাকে খুব ক্লান্ত লাগছিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, ''সেটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। আর সেটা আমার কাজও নয়। এর পর যা বলার পুলিশই বলবেন। সবাই খুব ক্লান্ত। যে যার কাজ করুন। আমার একটা লম্বা ঘুম দরকার।''

গাড়ির স্টিয়ারিঙে বসে স্টার্ট করে অরিন্দমবাবু বললেন, ''যাই বলুন, গাড়িটা কিন্তু ব্যাপক সারিয়েছে। কী বল পল্টুবাবু?''

শান্তনুদা লম্বা হাই তুলতে তুলতে বলল, ''মেকানিকের ক্যালি আছে বলতে হবে।''

তিনজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

বিশ্বদর্পণবাবুর দৃশ্যতর্পণ

বিশ্বদর্পণবাবু এমনিতে রাত দুটোর আগে ঘুমোতে যান না। অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে আটটা ন'টা। তারপর মুখহাত ধুয়ে একটু মুড়ি আর পাটালি খেয়ে বিছানায় বসে জলচৌকির ওপরে লিখতে বসেন। লেখার যদি খুব একটা চাপ না থাকে অর্থাৎ পুজোসংখ্যা বা কোনো বিশেষ সংখ্যার জন্য তাগাদা না থাকলে বারোটা অব্দি লেখেন। তারপর আধঘণ্টা মতো ছাদে পায়চারি করে খাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। রান্না অবশ্য বিশ্বদর্পণবাবুকে নিজের হাতে করতে হয় না। তাঁর একটা মাল্টিপারপাস কাজের লোক আছে। ডাকনাম মিচকে, ভালো নাম রাত্রিসখা নস্কর। বছর দশেক ধরে কাজ করছে। বিশ্বদর্পণবাবু যেহেতু বিয়ে-থা করেননি এবং যেহেতু একটা দূর সম্পর্কের ভাগ্নে ছাড়া ওঁর কেউ নেই, সেহেতু ঠিক সংসার বলতে আমরা যেটা বুঝি সেরকম 'সখাত সলিল' জাতীয় কিছু একটা রহস্যময় বস্তুর সম্বন্ধে কোনো ধ্যান-ধারণাই নেই। চাকরি করেন একটা নামী প্রকাশনা সংস্থায়। শিশুসাহিত্যিক হিসেবে সাহিত্যজগতে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি আছে। রোজগার যা করেন তার অর্ধেকও তাঁর জীবনযাপনের জন্য খরচ হয় না।

বিশ্বদর্পণবাবুর আপন-পর শত্রু-মিত্র, সবকিছু বলতে মিচকে। মাসের শুরুতে থোক টাকা দিয়ে দেন মিচকেকে। সকালবেলা চা করা থেকে বিছানা তোলা, বাজার করা, রান্না করা, জামাকাপড় কাচা, এমনকি টেলিফোনের হিসেব পর্যন্ত রাখে এই মিচকে। শুধু রাত্তির আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত মিচকেকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। পাড়ার একটা গ্যারাজে আর তিনজন বন্ধুর সঙ্গে টোয়েন্টি নাইন খেলে রাত দশটায় বাড়ি ফিরে মনিবের খাবার দোতলায় ডাইনিং টেবিলে ঢাকা দিয়ে নীচে এসে শুয়ে পড়ে।

মিচকে শুয়ে পড়ার পরও বিশ্বদর্পণবাবু জেগে থাকেন। যখন লেখার চাপ খুব বেশি থাকে, তখন মাঝে মাঝে একরাতে ঘুম প্রায় হয়ই না। একেবারে ভোররাতে যখন কাক ডাকতে শুরু করে, পুব আকাশ লাল হতে শুরু করে তখন বিছানায় ঢোকেন। প্রকাশন সংস্থায় কাজ করেন বলে তাঁর ডিউটি আওয়ার শুরু হয় বেলা দুটো থেকে। সুতরাং সকাল ন'টা দশটা অবধি তিনি আরামসে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে পারেন।

বিশ্বদর্পণবাবুর শরীরটা কাল রাতে বিশেষ ভালো ছিল না। এমনিতে উনি বাইরে কোথাও বা কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে খান না। কিন্তু কাল খোদ মালিকের ছেলের বউভাত ছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না। ভাগ্নে সৌরাশিস গেছে বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেকিং করতে। মিচকেও সারাদিন ধরে কাজকর্ম সেরে মনিবকে বলে বন্ধুদের সঙ্গে সারারাত ফিস্টি করবে বলে চলে গেছে। সকালবেলাতেও কিছু বলেনি। অফিস বেরোবার আগেও না। অফিস থেকে ফিরে দেখেন টেবিলে রান্না-বান্না থালা বাটি জলের গ্লাস সব পরিপাটি করে সাজানো। আর মুড়ি-পাটালির বদলে একপ্লেট চাউমিন রাখা আছে। দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল। হেজে যাওয়া জিভে বিন-গাজর কড়াইশুঁটি দেওয়া চাউমিন খারাপ লাগবে না। লালচে লালচে ডিমভাজার কুচিগুলো—ওঃ ভাবা যায় না! মনে মনে মিচকের প্রশংসা করে জামাকাপড় ছাড়তে যাবেন, দেখেন চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে মিচকে।

হাত কচলে মিনমিন করে বলল, "মামা, বলেছিলাম কি, মানে, আজকে না আমরা একটু ফিস্টি করব—মানে, ওই পালান দাসের গ্যারাজে। তাই মানে বলছিলাম কি....।"

"বুঝেছি, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। রাত্তিরে আসবি না এইকথা তো?"

"হ্যাঁ মানে আর কি, বলতে না ভয় করছিল। আমি কাল সকালে এসে পড়ব।"

"ঠিক আছে ঠিক আছে, যা। কাল সকাল সকাল চলে আসবি কিন্তু।"

মিচকে চলে যাওয়ার পরে মিনিটখানেক চুপ করে ভাবলেন বিশ্বদর্পণবাবু—বলে তো দিলাম ঠিক আছে যা। মানে এই বাড়িতে বারো বছর আছেন, কখনও সম্পূর্ণ একা থাকেন নি। কখনো-সখনো মিচকে ওর দেশের বাড়ি নোদাখালিতে গেলেও ভাগ্নে সৌরাশিস থাকে। আজ সম্পূর্ণ একলা থাকবেন এটা মাথার মধ্যে ভেসে উঠতেই মনটা কেমন যেন গুড়গুড় করে উঠল। শিরদাঁড়া বেয়ে দু ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে নীচে নেমে এল। আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। কপালটা টসটস করছে। বাঁ হাতের তালু দিয়ে চিবুকটা একবার মুড়িয়ে নিলেন, অনেকটা কাপড় নিংড়োবার ভঙ্গিতে। হাতদুটোকে টানটান করে, পি. টি. করার মতো দুবার মাথার উপরে তুলে আবার পাশে নামালেন। তিন চারবার উঠবোস করে নিলেন। মুখ-হাত ধুয়ে চাউমিনের প্লেটটা হাতে নিয়ে বারান্দায় বসলেন।

মালিকের বাড়ি নেমন্তন্ন আছে বলে আজ অনেক আগেই ফিরেছেন। চাউমিন খেতে খেতে গালে একবার হাত দিয়ে মনে হল দাড়িটা কামিয়ে নিলে ভালোই হয়। সকালে আলসেমির জন্য কামানো হয়নি। একটু আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও মনে হয়েছিল।

চাউমিনটুকু খেয়ে শেষ পাতের এককুচি ডিম আর দু-একটা পিঁয়াজকে সাবড়ে-সুবড়ে হাত ধুয়ে দাড়ি কামালেন, একটা রঙচঙে জামা আর কালো প্যান্ট বের করে পরলেন। রুমালে দু এক ফোঁটা পারফিউম লাগালেন। তারপর দরজা জানালা বন্ধ করে নীচে নেমে সদরে দুখানা তালা লাগালেন। মনে মনে 'জয় দুর্গা' বলে দু'হাত কপালে ঠেকালেন। আস্তে আস্তে বড়ো রাস্তার দিকে হাঁটা লাগালেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় বারোটা। আর ঘণ্টাখানেক আগে হয়তো আসতে পারতেন। কিন্তু থার্ড ব্যাচের আগে খেতে বসতে পারলেন না। সুযোগ এসেছিল সেকেন্ড ব্যাচে। কিন্তু সিনিয়র কর্মচারী এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক হিসেবে সাততাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে একটু লজ্জাবোধ হচ্ছিল।

খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। জামাপ্যান্ট ছেড়ে একটা পুদিনহরা খেয়ে একগ্লাস জল খেলেন। একবার ভাবলেন নতুন একটা লেখা ধরবেন। পরক্ষণেই মন পালটালেন। তার চেয়ে বরং পুরোনো কিছু লেখার ডি.টি.পি. করে রাখবেন। কম্পিউটারের সুইচ অন করে ভাবলেন মিচকেকে বলে এক ফ্লাস্ক চা করিয়ে রাখলে ভালো হত, যদি অনেক রাত অবধি কাজ করতে হয়।

মিচকের কথা মনে আসতেই মুখের চেহারাটা পালটে গেল। ভাগ্নের কথা মনে পড়ল। পেটটা গুড়গুড় করে ডেকে উঠল। উঠে ভালো করে জানলার ছিটকিনিগুলো দেখে এলেন। বাথরুমের জানলাদুটো খোলা ছিল। দুটো পাল্লা এক করে ছিটকিনি তুলে দিলেন। সবে কালীপুজো গেছে, এখনও সে রকম ঠান্ডা পড়েনি। তবুও ভোরের দিকটায় একটা হিমেল ভাব আসে। এমনিতে রাত বারোটার সময় জানলা বন্ধ থাকলে খুব খারাপ লাগে না। কিন্তু মিচকে বাড়িতে নেই এই কথাটা মনে হতেই গেঞ্জির ভিতরে কুলকুল করে ঘামতে শুরু করলেন। বারান্দার দিকের জানলাটা খুলে দেবেন বলে হাত বাড়িয়েও থমকে গেলেন। নাঃ, পাখাটা এক পয়েন্টে খুলে দেওয়াই ভালো। ঘড়ির দিকে তাকালেন। বারোটা চল্লিশ। আজ আর লেখাও হবে না, কম্পিউটারে টাইপ করাও হবে না। শুয়ে পড়াই ভালো।

বাথরুম থেকে এসে বেসিন থেকে চোখেমুখে ঘাড়ে জল দিলেন। ডান হাতটায় অল্প জল দিয়ে দুটো কুনুই এবং হাঁটুতে দিলেন। পাখাটা অফ করে নাইট ল্যাম্প জ্বেলে বিছানায় ঢুকে বেড সুইচে হাত দিলেন।

শরীরে ক্লান্তি থাকায় তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু চোখদুটোতে

ঘুম জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও যেন গাঢ় ঘুম আসছিল না। আবার আলো জ্বালিয়ে উঠে সদ্যলেখা গল্পের পাণ্ডুলিপি পড়তে শুরু করলেন।

পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুমের চটকা ভেঙে গেল। একটু পরেই বুঝলেন একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলেন। শহরে একটা সাহিত্যসভায় তিনি সংবর্ধিত হচ্ছেন। অনেক পুরস্কার, ফুলের তোড়া পেয়েছেন। তাঁর ভাষণ দেওয়ার পালা আসতেই উঠতে গিয়ে টেবিলক্লথে টান লেগে কাচের ফুলদানিটা পড়ে গিয়ে চৌচির।

আচমকা ঘুমটা ভেঙে যেতে প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারেননি। খানিক পরে বুঝলেন ঘরের মধ্যেই কিছু একটা পতনের শব্দ তাঁর কানে যাওয়ায় ঘুমটা ভেঙে গেছে। চোখদুটো রগড়ে নিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। রাত গভীর হলে নাইট ল্যাম্পের তেজ বেড়ে যায়। হাল্কা নীল আলোয় দেখলেন দরজাটা বন্ধ। জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে রকম বন্ধ করে শুয়েছিলেন সেরকমই বন্ধ। মনে সাহস সঞ্চয় করে বললেন, "কে?"

কোনো উত্তর নেই। একটু পরেই আবার একটা শব্দ। বিশ্বদর্পণবাবুর মনে হল কিছু একটা টানাটানি করার আওয়াজ।

"কে? কে ওখানে?"

"আজ্ঞে আমি চোর। ভয় নেই, ভালো চোর। খুব সুনাম আছে। কোনো ক্ষতি করব না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন স্যার।"

"চোর মানে? তামাশা হচ্ছে?"

বিশ্বদর্পণবাবু বেডসুইচ হাতরে যাচ্ছেন। মশারির ভেতর থেকে যতবার ঝুলন্ত বেডসুইচটাকে ধরতে চেষ্টা করছেন ততবারই পিছলে যাচ্ছে।

আর সুইচটা ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলছে। দু-চারবার চেষ্টা করার পর মরিয়া হয়ে ধরতে গেলেন আর মশারির দড়ি ছিঁড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। কোনোরকমে ছতরি আঁকড়ে পতন আটকালেন বটে, কিন্তু বেডসুইচটাতে টান লেগে ইঞ্চি ছয়েক তারসুদ্ধ সুইচটা ওঁর হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, "আস্তে আস্তে। ব্যস্ত হবার কী আছে? আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না। তাছাড়া ওই যে বললাম না যে আমি ভালো চোর, কোনো ক্ষতি করব না। এক্ষুনি খাট থেকে পড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলেছিলেন আর কি! সাবধান,

দেওয়ালের তারটায় হাত দেবেন না। ওটা লাইভ অয়্যার। দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি বোর্ড থেকে সুইচটা অফ করে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, আপনার ঘরে টিউবলাইট ছাড়া অন্য কোনো বাল্‌ব নেই? নাইট ল্যাম্পটার আলোর তত জোর নেই বুঝলেন। লোকাল কোম্পানির বোধ হয়, তাই না? দাঁড়ান, আপনাকে কষ্ট করে উঠতে হবে না। মশারিটা ছিঁড়ে যাবে। আমি বরং ও ঘরের আলোটা জ্বেলে দিই।"

বিশ্বদর্পণবাবু কী করবেন বা এমন অবস্থায় কী করা উচিত ভেবে পেলেন না। জীবনে কখনও এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি। মরতে কেন যে মিচকেকে ফিস্ট করতে যাবার পারমিশান দিলেন। হঠাৎ তার মনের মধ্যে কে যেন এক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ চার্জ করে দিল। গলা উঁচিয়ে বললেন, "কী তখন থেকে তামাশা করে যাচ্ছেন? কে আপনি? নাম কী? কোথায় থাকেন? ঘরে ঢুকলেনই বা কী করে?"

"দাঁড়ান স্যার। অত জোরে ধমকাবেন না। আমি একটু কমজোরি, মানে মিনমিনে টাইপের। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে আমি ঘাবড়ে যাব। একটু জল খাব স্যার আপনার জগ থেকে? বেশ তেষ্টা পেয়েছে।"

"হ্যাঁ খান। খেয়ে বিদেয় হন।"

"বলছিলাম কি স্যার, ফ্রিজে দু একটা মিষ্টি-ফিস্টি হবে না? নিদেনপক্ষে এক ড্যালা পাটালি? শুধু জল খেলে আপনার অকল্যাণ....।"

"থামুন তো, চোরের আবার শুধু জল। এক্ষুনি কাটুন, নইলে.....।"

"পুলিশ ডাকার কী দরকার স্যার? আপনি সাহিত্যিক মানুষ। তারওপর শিশুসাহিত্যিক বলে কথা। পুলিশ-ফুলিশ ডাকা কী আপনার কাজ? সে না হয় আমি ডেকে দেবখন। তা এখনতো ডাকলে আসবেও না। একটু ফর্সা হতে দিন। ততক্ষণ বরং আপনার কাছে একটু বসি। চেয়ারটা নিয়ে আসি স্যার খাটের কাছে? তখন চেয়ারটা টানতে গিয়ে শব্দ হল বলে আপনার ঘুমটা চটকে গেল। তবে ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। তা না হলে আমি চুরি করে চলে যেতাম, আপনার সাথে দেখাই হত না।"

"আপনি কী করে জানলেন আমি সাহিত্যিক? আপনি আমাকে চেনেন? আমার নাম জানেন?"

"কী যে বলেন স্যার। আপনি বড্ড হাসান। অত, হাসাবেন না স্যার। আমার আবার ম্যাচিয়োর্ড অ্যাপেনডিসাইটিস। বেশি হাসলে বার্স্ট করতে পারে। আপনার নাম জানব না? জানেন আমি রোজ সকালে ডিউটি থেকে ফেরার সময় অজার দোকানে

পেটাই পরোটা আর ঘুগনি খাই। পেটাই পরোটা খেয়েছেন স্যার কখনো? খাননি বোধ হয়। ওজনে বিক্রি হয়। অজার দোকানের এক গ্রাম পরোটা আর এক প্লেট ঘুগনি ফ্রি পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা দিয়ে খেয়ে এক জগ জল খেয়ে নেবেন স্যার, চার-পাঁচ ঘণ্টা পেট জয়ঢাক হয়ে থাকবে। তা যে কথা বলছিলাম স্যার, অজা পুরোনো খবরের কাগজে পরোটা দেয়। তো মাঝেমাঝে, মানে প্রায়ই স্যার, কাগজের 'ছোটোদের পাতা'টা আমার কপালে পড়ে যায়। পরোটা খাওয়া হয়ে গেলেই আমি পাতাটা পড়ি। প্রায়ই দেখি আপনার লেখা ছড়া গল্প ছাপা হয়েছে। এই তো কয়েকদিন আগে আপনার একটা ছড়া কী ভালো হয়েছিল। বলুন স্যার, ওই যে কী যেন—ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। দাঁড়ান শোনাচ্ছি—'এই যে শোনো, এগিয়ে এসো, কী নাম তোমার? কমল দে?/দেখেছ আজ চাঁদের রংটা আগের থেকে কম হলদে।' ওঃ অসাধারণ। ভাবা যায় না, এরকম অন্ত্যমিল ভাবা যায় না স্যার। কী ধ্বনিমাধুর্য। আর আপনি বলছেন কিনা আপনার নাম শুনিনি?"

কথা বলতে বলতেই লোকটা সুইচবোর্ড হাতড়ে একশো পাওয়ারের বাল্‌বটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, নাইট ল্যাম্প আর টিউব লাইটের সুইচটা অফ করে দিয়েছে। ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা একটা কৌটো থেকে এক ড্যালা পাটালি গালে দিয়ে জগ থেকে অনেকটা জল খেয়ে নিয়েছে। আর কম্পিউটার টেবিলের নীচ থেকে চাকা লাগানো চেয়ারটা নিয়ে এসে খাটের সামনে বসে পড়েছে।

বিশ্বদর্পণবাবু বিস্ময়ে হতবাক। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। অনেকক্ষণ ধরে লোকটার মুখ এবং শরীরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। লোকটা চোর হলেও অবশ্য চোর-চোর ভাব আছে বলে মনে হল না। পরনে একটা আধময়লা পাজামা আর বেশ পরিষ্কার আদ্দির পাঞ্জাবি। চুল আঁচড়ানো। গালে দু-তিন দিনের না কামানো দাড়ি। পাঞ্জাবির বুক পকেটে একটা কলম আর একটা চকচকে পাঁচ টাকার নোট।

বেশ কিছুক্ষণ দেখার পরে লোকটাকে ভালো লেগে গেল। বিশ্বদর্পণবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ছড়া আপনার ভালো লেগেছে বলছেন। আপনি কি ছড়া-টড়া খুব ভালোবাসেন।"

লোকটার মুখটা চকচক করে উঠল। জিভ দিয়ে ঠোঁটদুটো চেটে নিয়ে বলল, "কিছু মনে না করলে একটা কথা বলব স্যার?"

"বলুন।"

"আমি না স্যার, একটু আধটু ছড়া-টড়া লিখি। শুনবেন নাকি দুটো একটা?"

"না, না এখন নয়। মুড নেই। তাছাড়া তুমি তো, মানে আপনি তো....."

"হ্যাঁ স্যার, তুমিই বলুন। আপনি শুনতে আমার খুব কুণ্ঠা হচ্ছে। আফটার অল, এই যাঃ, থুড়ি স্যার, মোটের ওপর আপনি আমার থেকে মানে এবং বয়সে দুটোতেই বড়ো। আমি হলাম যাকে বলে তস্কর সম্প্রদায়ের। আমাকে তুমিই বলুন। অনেক শ্রুতিমধুর হবে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা তোমার নামটা তো বললে না। কী নাম তোমার? চোর বলে তো কাউকে ডাকা যায় না।"

"কারেক্ট বলেছেন স্যার। থুড়ি, ইংরেজি চলে আসছে, কিছু মনে করবেন না। আমার নাম দৃশ্যতর্পণ। দৃশ্যতর্পণ পাড়ুই।"

বিশ্বদর্পণবাবু এবারে খুব রেগে উঠলেন। একে রাতের ঘুমটা মাটি করে দিল কোথাকার এক উটকো আগন্তুক। তার ওপর ফক্কড়দের মতো ইয়ার্কি ঠাট্টা। ধমকের সুরে বললেন, "কী বললে? ইয়ার্কি ফাজলামি হচ্ছে, অ্যাঁ। আমরা নামটাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। জানো আমি কে? হুঁ, বিশ্বদর্পণ বাড়ুইয়ের সঙ্গে প্যারডি করে নাম বলা হচ্ছে দৃশ্যতর্পণ পাড়ুই। যত্তোসব। দূর হয়ে যাও এখান থেকে, অসভ্য বখাটে কোথাকার, আবার বলা হচ্ছে কিনা ভালো চোর।"

"রাগ করছেন কেন স্যার। আমি ঠাট্টা ইয়ার্কি করছি না। আপনি হলেন আমার শ্রদ্ধার পাত্র। সত্যিই আমার নাম দৃশ্যতর্পণ পাড়ুই। বার্থ সার্টিফিকেটে লেখা আছে। বিশ্বাস না হয় দেখাতে পারি। দেখবেন স্যার? এই ব্যাগে আছে। দাঁড়ান দেখাচ্ছি।

লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বিশ্বদর্পণবাবু বললেন, "থামো তো। চোরের আবার বার্থ সার্টিফিকেট। উজবুক, ধান্দাবাজ কোথাকার, সকালেই পুলিশে দেব।"

লোকটা চেয়ারটাকে খাটের কাছে টেনে এনে দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বলল, "এরকম ভাবে বলবেন না স্যার। চোর বলে কি মানুষ নই? চোর বলে কি কোনোদিন মায়ের পেট থেকে জন্মাইনি? কেন স্যার? দৃশ্যতর্পণ নামটা খারাপ?"

"দৃশ্যতর্পণ একটা নাম হল নাকি? দৃশ্যের সঙ্গে তর্পণের কী সম্পর্ক? তর্পণ তো যাগযজ্ঞ। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে মহালয়ার দিন তর্পণ করে শোনেননি?"

"তর্পণ মানে তৃপ্তিও হয় স্যার। ছোটো মুখে বড়ো কথা হয়ে যাবে। দৃশ্যতর্পণ

মানে দৃশ্য দেখে তৃপ্ত হওয়া বা তৃপ্তি লাভ করা। বাজে কথা বলছি না স্যার। 'তর্পণ' শব্দটা তৃপ্ ধাতু থেকে এসেছে। তৃপ্ ধাতু অন্ প্রত্যয়। বিশ্বাস হচ্ছে না স্যার? 'জ্ঞানেন্দ্রমোহন' খুলে দেখবেন সময় পেলে।"

"বাব্বা! তুমি তো দেখছি বেশ পণ্ডিত লোক। ইংরেজি জান, সংস্কৃত জান। আবার ছড়া-টড়াও লেখ বলছ। শোনো ভাই, তুমি আর আমাকে স্যার বোলো না তো।"

দৃশ্যতর্পণ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরটা চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ঘড়িতে তিনটে বাজার ঘণ্টা পড়ল। ডাইনিং টেবিলের সামনে গিয়ে প্লাস্টিকের ঢাকনাগুলো তুলে দেখল। তারপর বলল "বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন ছিল আপনার কাজের লোককে বলেননি। গুচ্ছের রান্না করে ঢাকা দিয়ে রেখেছে। ফ্রিজেও তোলেনি। নেহাত একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আছে। তবে....."

"আর বোলো না। আমিও বলতে ভুলে গেছি। আর মিচকেও আমাকে বলেনি যে অত কিছু রান্না করেছে। হ্যাঁ শোনো, তুমি তো অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেড়িয়েছ। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। ওখান থেকে যা ইচ্ছে খেয়ে নাও।"

"বলছেন স্যার। না, থুড়ি, স্যার নয়, কী বলব আপনাকে বলে দিলেন না তো। আচ্ছা, না হয় পরে বলবেন। আমি একটু খেয়ে নিই বরং। বড্ড খিদে পেয়েছে। খেয়ে নিয়ে চা বানাচ্ছি। আপনি বরং মুখে চোখে জল দিয়ে নিন।"

রান্নাঘরের তাক থেকে একটা থালা পেড়ে নিয়ে চারটে রুটি আর তরকারি নিয়ে খেতে খেতে বলল, "রান্নাঘরে বড্ড আরশোলা হয়েছে। কাল সকালে পরিষ্কার করে বেগন স্প্রে করে দেব। গ্যাস-ওভেনটা খুব তেল প্যাচপ্যাচে হয়েছে। টিভিটা চালাবেন স্যার, মানে বিশ্বদর্পণদা? রাত্তিরে কখোনো টিভি দেখিনি।

দৃশ্যতর্পণ খাওয়া শেষ করে রান্নাঘর থেকে দু কাপ চা করে নিয়ে এসে আবার খাটের সামনের চেয়ারটায় বসল। বিশ্বদর্পণবাবু বললেন, "তুমি থাকো কোথায় দৃশ্যতর্পণ? বাড়িতে কে কে আছে?"

"আমি থাকি পাঁচের এক গদাধর মিস্ত্রি লেনে। আপনার এই বাড়ির পরের পরের গলি। বাবার তৈরি বাড়ি। আমার তো বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই।"

"আর বউ ছেলেমেয়ে?"

দৃশতর্পণ এবারে সত্যিসত্যিই লজ্জা পেয়ে গেল। কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "কী

যে বলেন। বিয়ে না করলে বউ হবে কোত্থেকে? চোর বলে কেউ মেয়েই দেয়নি। অবশ্য লুকিয়ে বিয়ে করতে পারতাম। তবে ওই যে, প্রথমেই বলেছিলাম না আমি ভালো চোর, বেশ সুনাম আছে।"

বিশ্বদর্পণের এতক্ষণে বেশ মায়া পড়ে গেছে লোকটার ওপরে। তবে জিনিসপত্র কিছু নিয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সকালে পুলিশে খবর দেবেন কিনা তাও ভেবে পাচ্ছেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "তা তুমি বাড়ির ভেতরে ঢুকলে কোত্থেকে? দরজা জানালা তো সব যেমন কে তেমন বন্ধ।"

"দেখুন, সাহিত্যিকদের একটু আধটু অন্যমনস্কতা থাকেই। এটা কোনো দোষের নয়। বাথরুমের জানালার পাল্লাদুটো এক করেছেন, ছিটকিনি উপরে তুলেছেন, সব কাজই নিখুঁত। কিন্তু ছিটকিনির মাথাটা ফুটোর মধ্যে ঢোকেনি। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম ওই তেতলা বড়ো বাড়িটার দিকে। ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা দেখে ঠেলা দিলাম, খুলে গেল। এভাবে আর খুলে রাখবেন না, স্যার। আর হ্যাঁ, গ্রিলে অনেক জং পড়েছে। কাল শিরিষকাগজ মেরে একটু প্রাইমার লাগিয়ে দেব।

বিশ্বদর্পণবাবু এতক্ষণে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে লোকটা শিক্ষিত এবং জাত চোর নয়। সুযোগ দিলে হয়তো ভালো রাস্তায় আনা যাবে।

দৃশ্যতর্পণ কম্পিউটার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "বা! একেবারে পেন্টিয়াম ফোর নিয়েছেন। ভালো করেছেন। নিশ্চয় টোয়েন্টি জিবির হার্ডডিস্ক। পেজমেকার কোন্ ভার্সন নিয়েছেন দাদা? সিক্স পয়েন্ট ফাইভ? সব পাণ্ডুলিপি কি আপনি নিজেই ডি.টি.পি. করেন?"

"তুমি ডি. টি. পি.-ও জান নাকি? অনেক গুণ আছে দেখছি। আচ্ছা তোমার যখন এত গুণ তখন চুরি কর কেন?"

"সেই কথাটা আমিই আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। আমি যে লোকের বাড়ি ঢুকে রোজ অনেক কিছু চুরি করি তা কিন্তু নয়। সেই কবে অবিনাশ পাকড়াশির বাড়ি থেকে একটা চকচকে পাঁচটাকার নোট নিয়ে এসেছিলাম। তারপর থেকে মনটা খচখচ করছে। মানে যাকে বলে রিপেনট্যান্স আর কী। সখে নিয়েছিলাম। খরচা করিনি, এখনও আছে, এই দেখুন। আসলে আমি পাইপ বেয়ে দোতলা তিনতলায় উঠতে খুব ভালোবাসি।

বিশ্বদর্পণবাবু খাট থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন। সারা রাত ধরে কী এক আশ্চর্য নাটক

দেখে চলেছেন তিনি। অবাক হয়ে বললেন, "তার মানে? পাইপ বেয়ে ওঠাটা কি ইলিশমাছের পাতুরি নাকি যে ভালোবাসাবাসির কথা উঠবে? এ যেন 'আমি খেজুরগুড় দিয়ে গরম পরোটা খেতে খুব ভালোবাসি'। স্টুপিড, ননসেন্স। এগুলোকে বলে অবিমৃশ্যকারিতা।"

"এই দেখুন, আবার আপনি রাগ করছেন। আসলে কী জানেন, স্যার, চোরদের কপালটাই মন্দ, তা সে ভালো চোরই হোক, আর খারাপ চোরই হোক। চোরদের সবাই তাচ্ছিল্য করে।"

দৃশ্যতর্পণ এবার সত্যিই কেঁদে ফেলল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, "ঠিক আছে স্যার। অন্যায় হয়েছে। আর একটু থাকতে দিন। এ সময়ে বেরোলে কুকুরগুলো বড্ড জ্বালায়। ভোর হলেই আমি পুলিশ ডেকে আপনার সামনে নিজেকে ধরিয়ে দিচ্ছি।"

বিশ্বদর্পণবাবুর মনটা আবার নরম হয়ে গেল। আসলে কারোর কান্না দেখলে উনি মন ঠিক রাখতে পারেন না। গলার স্বরটা নরম করে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, রাগ কোরো না। আমি তা বলতে চাইনি। তুমি বলছিলে না পাইপ বেয়ে ওঠাটা অভ্যেস হয়ে গেছে।"

"গেছেই তো। পাঁচটা বছর কি মুখের কথা? তবে ডাক্তারটা উপকারই করেছে। না হলে পারতামই না।"

"কী হয়েছে বলবে তো। ভ্যানতাড়া করছ খালি।"

"একটা রুমাল দেবেন, দাদা। আর একটু কান্না রয়ে গেছে। না মুছলে ঠিক করে কথা বোঝাতে পারব না।"

নিজে উঠে গিয়ে আলনা থেকে একটা রুমাল ভালো করে ঝেড়ে, দুতিন বার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "আসলে কী জানেন দাদা, অনেক বছর আগে আমার একবার ভীষণ রকম হার্টের গোলযোগ দেখা দেয়। একজন হার্টস্পেশালিস্টকে দেখাতে তিনি বলেছিলেন যে একদম সিঁড়ি ভাঙা বারণ, কোনো অবস্থাতেই যেন সিঁড়ি দিয়ে দোতলা-তিনতলায় না উঠি। তার পর থেকে যখনই আমি কোনো বহুতল বাড়িতে যেতাম পাইপ বেয়ে উঠতাম। সেই থেকেই অভ্যেস হয়ে গেছে।"

বিশ্বদর্পণের একটু ঝিমুনি আসছিল। খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিলে মন্দ হয় না। রাত তো প্রায় শেষ হতে চলল। লম্বা একটা হাই তুলে বললেন,"তোমার তো গুণের ঘাট নেই দেখছি। তা আমার বাড়ি থেকে কী চুরি করবে বলে ঠিক করলে? যাই কর

না কেন সকালে কোরো। এখন একটু ঘুমোতে দাও। আর তুমিও মাটিতে মাদুরটা পেতে একটু গড়িয়ে নাও।"

"আপনি সত্যিই মহানুভব। তুলনা হয় না স্যার।"

আটটা নাগাদ ঘুমটা ভেঙে গেল বিশ্বদর্পণবাবুর। বিছানা ছেড়ে চোখেমুখে জল দিয়ে দেখেন চা বিস্কুট রেডি। একটু পরে গরম চারটে কচুরি আর দুটো জিলিপি হাতে দৃশ্যতর্পণের প্রবেশ।

"তুমি আবার কচুরি জিলিপি কোথায় পেলে? আমার মানিব্যাগে হাত দেওয়ার সাহস তোমার কোত্থেকে হল? দেখাচ্ছি মজা। ডাকছি পুলিশ।"

"না স্যার। সরি, দাদা। মানিব্যাগ থেকে পয়সা নিইনি। ওই যে বললাম না অবিনাশ পাকড়াশির বাড়ি থেকে নেওয়া পাঁচটাকা আমার কাছে ছিল। তা চুরির পয়সায় খেতে যদি আপনার দ্বিধা থাকে তা হলে টাকাটা অবিনাশ পাকড়াশিকে দিয়ে দেবেন। আমি আর ওর মধ্যে নেই।"

"কী বললে! চালাকি পেয়েছ? যেচে টাকা ফেরত দিতে গিয়ে মার খেয়ে মরব, না হাজতবাস করব?"

"তা হলে খেয়ে নিন স্যার। আমি সকালবেলায় থানায় খবর দিয়ে এসেছি। ওখানেই নিজেকে গ্রেফ্‌তার করিয়ে দিতে পারতাম। থানার লোকেদের সঙ্গে সে জানাশোনা আমার ছিল। ভেবে দেখলাম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়াই ভালো। যাকগে স্যার, একটা রাত খুব জ্বালিয়ে গেলাম। আজ যাই, স্যার। ছাড়া পেলে একদিন এসে ছড়াগুলো শুনিয়ে যাব। তবে আপনার পাইপগুলোতে বড্ড ছ্যাতলা পড়েছে। ওগুলো স্যার মিচকে-কে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে রাখবেন।"

বিশ্বদর্পণ প্রায় বাক্‌শক্তিরহিত। মুগ্ধের মতো দেখছেন লোকটাকে। আর ভাবছেন এমন মানুষও পৃথিবীতে হয়! একটু থেমে দৃশ্যতর্পণকে কাছে ডাকলেন। পিঠে হাত রেখে বললেন, "শোনো, তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। তোমার কত গুণ। ভালো ইংরেজি জান, বাংলা সংস্কৃতও খুব ভালো জান। কম্পিউটার চালাতে জান। প্রুফ দেখতে জান। আর কী চাই? তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না। তোমার বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দাও। কাল থেকে আমার এখানে থাকবে। অনেকদিন থেকে আমার একটা স্বপ্ন ছিল আমার নিজের প্রকাশন সংস্থা খুলব। লোকবলের অভাবে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এবার হবে। তুমি হবে আমার পার্টনার। সামনের মাস থেকে চালু করে দেব।

তোমার ছড়ার বইও বার করব। আর হ্যাঁ, এই একমাসের মধ্যে পাইপ ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে অভ্যাসটাও রপ্ত করে ফেল। আজ থেকে তুমি আর চোর নও। তুমি একজন গুণী পণ্ডিত সাহিত্যিক।"

দৃশ্যতর্পণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কী বলা উচিত ভেবে পাচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটাই ওর কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। অজার দোকানে পেটাই পরটা না খেলে তো বিশ্বদর্পণবাবুর নামটাই জানতে পারত না। কিংবা বাথরুমের জানলার ছিটকিনি লাগাতে যদি ভুল না হত। কিংবা.....।"

"কী অত ভাবছ, দৃশ্যতর্পণ? তোমার কি মত নেই?"

দৃশ্যতর্পণ হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। বিশ্বদর্পণবাবুর হাত দুটো ধরে বলল, "না স্যার, চোরদের এত সম্মান পাওয়ার কথা নয়। তবে সত্যি বলছি, মা কালীর কিরে, বিশ্বাস করুন, আমি ভালো চোর। কারোর কোনো ক্ষতি করিনি কোনোদিন।

বিশ্বদর্পণবাবু গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আমি জানি। মানুষ চিনতে আমার দেরি হয় না। নাও, কচুরি আর জিলিপিটা খেয়ে নাও। কাল থেকে আমাদের প্রকাশনার কাজ শুরু হবে।"

দৃশ্যতর্পণ বলল, "তবে স্যার, সরি বিশ্বদা, শাস্ত্রে লেখা আছে "অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো না কস্যচিৎ।"

বিশ্বদর্পণ বিস্ফারিত নয়নে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলেন দৃশ্যতর্পণের মুখের দিকে।

একতলায় কলিং বেলের আওয়াজ শোনা গেল।

সিনেসেরিটি ডট কম

অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীরমুখে পায়চারি করছেন নেদোমামা। মুখটা আষাঢ়ের জলভরা আকাশের মতো থমথমে। একটু খোঁচা দিলেই একশোটা শাওয়ারের গতি নিয়ে ঝরতে শুরু করবে। আধঘণ্টা ধরে বাড়ির সামনের রাস্তাটায় একবার এ-মাথা একবার ও-মাথা করছেন। সাড়ে আটটার সময় বাস ছাড়ার কথা। নেদোমামার কড়া হুকুম, বাস ছাড়ার শিডিউল্‌ড টাইমের পনেরো মিনিট আগে যেন সবাই স্পটে হাজির হয়। আটাশ বছর পুলিশে কাজ করছেন। কনস্টেবল হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করে এখন ইনটেলিজেন্স বিভাগের বেশ বড়ো অফিসার। যে-কোনো আউটিং-এর আগের দিন, তা সে একদিনের পিকনিকই হোক, আর দু-তিনদিনের দিঘা-বকখালি-মাইথন-মশানজোড়ই হোক, সকলকে বেশ দাপটের সঙ্গে বলে দেবেন, "অ্যাটলিস্ট ফিফটিন মিনিট্‌স আগে সবাইকে টার্ন আপ করতে হবে। আর যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে, মানে ব্রেকফাস্ট, বাজারদোকান ইত্যাদিতে থাকবে, তারা অ্যাটলিস্ট এক ঘণ্টা আগে আমার কাছে রিপোর্ট করবে।"

এভাবেই চলে আসছে গত কুড়ি-বাইশ বছর ধরে। নিজে কোনোদিন এক মিনিটের জন্যও সময়ের হেরফের করেননি। ঝড়-বৃষ্টি, মিটিং-মিছিল, এমনকি, গত বছর আমাদের পিকনিকের দিন সাতসকালে যখন স্বাস্থ্যোন্নতি ক্লাবের মাঠে একটা হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে সরকার, পুলিশ সকলের কাঁচাঘুম চটকে দিয়েছিল, তখনও নয়। কোনোরকম তোয়াক্কা না করে, যেন কিছুই হয়নি এরকমভাবে নাকের ওপর থেকে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে বলেছিলেন, "এরকম তো হতেই পারে। তা বলে এত লোকের সঙ্গে তঞ্চকতা করতে পারব না।"

প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও ওঁর এই অনমনীয় শৃঙ্খলাপরায়ণ স্বভাবের কথা জানেন বলেই বেশি পীড়াপীড়ি করেন না। সেদিনও ডি এম একবার টেলিফোনে গাঁইগুঁই করে বলতে শুরু করেছিলেন, "মিস্টার ভট্‌চাজ, স্বাস্থ্যোন্‌....."

সঙ্গে-সঙ্গে নেদোমামার লেটকাট। একটু সময় নিয়ে, সাহেবের মেজাজটা বুঝে নিয়ে, ওঁর 'নতি' বলার আগেই নেদোমামা নতি স্বীকার করে নিয়ে বলেছিলেন, "শুনেছি।

বাট এক্সট্রিমলি সরি সার। আজ আমি ব্যাডলি প্রিঅকোপায়েড। রাত্রে আপনার বাড়িতে আমি অবশ্যই দেখা করব।"

অন্য কেউ হলে ইনস্ট্যান্টলি সাসপেন্ডেড হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু নেদোমামার ব্যাপারটা আলাদা। এমনই তাঁর নিষ্ঠা, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা আর সময়ানুবর্তিতা যে কাউকে কোনো সুযোগই দেন না কোনোরকম অভিযোগ লালনপালন করার।

সাড়ে আটটা থেকে আটটা পঁয়তাল্লিশ। পনেরোটা মিনিট যেন নেদোমামার কাছে পনেরোটা ঘণ্টা। বিশাল লাক্সারি বাসটা দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসবাড়ির বাগানের সামনে। সকলে বাসের ভেতরে যে যার সিটে বসে আছে। প্রতিবার পিকনিক বা বেড়ানোর আগের দিন নেদোমামা সকলকে ডেকে তার অ্যালটেড সিটনম্বর বলে দেবেন। ইচ্ছে থাকলেও কারও অন্য সিটে বসার উপায় নেই নেদোমামার পারমিশন ছাড়া। মালপত্তর তোলা হয়ে গেছে। ড্রাইভারের হাত স্টিয়ারিংয়ে। শুধু লেফ্‌টেনান্ট জেনারেলের হুকুমের অপেক্ষায়। বাসের খালাসি ফুটবোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে। ডান হাত গেটের মাথায় দোদুল্যমান দড়িটার গায়ে, ড্রাইভার স্টার্ট দিলেই ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে। বাঁ হাত দিয়ে দরজাটা আধখোলা অবস্থায় ধরে দাঁড়িয়ে আছে কমান্ডারের প্রবেশের অপেক্ষায়।

নেদোমামার মুখটা টকটকে লাল। হন্তদন্ত হয়ে বাসের ভেতরে ঢুকে ড্রাইভারের দিকে পেছন ফিরে সিটগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর গম্ভীরমুখে বললেন, "ড্রাইভার, স্টার্ট। অই হতভাগাটার জন্য পুরো প্রোগ্রামটাই বানচাল হয়ে যাবে নাকি! নেভার। কক্ষনো না। কোনোদিন হতে দিইনি, আজও দেব না। বাইশ নম্বর সিটটা আজ খালিই যাবে। দরকার নেই। দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ঢের ভালো।"

নেদোমামিমা মিনমিন করে একবার বলে উঠলেন, "আর মিনিট দশেক দেখলে পারতে। আসবে ঠিকই। রাস্তায় হয়তো...।"

"কী বললে! আর দশ মিনিট? প্লিজ ম্যাডাম, ডোন্ট পোক ইয়োর নোজ ইন মাই অ্যাফেয়ার্স। সব কিছুর একটা সীমা আছে। এত লোকের ভালোমন্দ যেখানে জড়িয়ে আছে সেখানে এই জাতীয় ইরেসপনসিবিলিটির কোনো ক্ষমা নেই। প্লিজ, হোল্ড ইয়োর টাং।"

নেদোমামিমা এই বাচনভঙ্গিটির সঙ্গে খুবই পরিচিত। একুশ বছর ধরে দিনে পাঁচ-ছ'বার শুনে আসছেন। বিয়ের পরে প্রথম-প্রথম খুব ভয় পেতেন। নেদোমামার তখন

সাতাশ-আটাশ বছর বয়স। ব্যায়াম-করা পেটানো শরীর। বাইসেপ, ট্রাইসেপ, ল্যাটিস নিয়ে যে-কোনো পুরুষমানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারতেন। কুচকুচে কালো, চওড়া বাহারি গোঁফ। প্রথমদিকে নেদোমামার পাশে নেদোমামিমাকে পুতুল-পুতুল মনে হত। অবশ্য নেদোমামিমা যে অ্যাদ্দিনে চেহারায় লম্বাচওড়া হয়ে নেদোমামার প্রায় সমকক্ষ, মানে মানানসই হয়ে উঠেছেন তা নয় বটে, তবে প্রথম দিকের সেই ভয়জড়িত বিহ্বলতা, দ্বিধামিশ্রিত বশংবদ ভাবটা সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে কাটিয়ে ওঠার জন্য নেদোমামিমা আজকাল আর নেদোমামার এই জাতীয় বাচনভঙ্গিতে খুব সহজে বিচলিত হন না।

তাই নেদোমামা যতই খুব হাঁকডাক করে সকলকে শুনিয়ে আসর গরম-করা কায়দায় 'ডোন্ট পোক ইয়োর নোজ' বলুন না কেন, নেদোমামিমা যে দারুণ কিছু বিচলিত হননি সেটা নেদোমামিমার বনিমাসির পাঁজরে কনুইয়ের ঠেলা মেরে মুখ মোছার অছিলায় দাঁতে দাঁত চেপে হাসার মধ্যেই বেশ বোঝা গেল। ভাগ্যিস ওই সময়টায় নেদোমামা মনোযোগ দিয়ে বাসের ড্যাশবোর্ডে ফুয়েল মিটারটা দেখছিলেন। না হলে আর একটা বিস্ফোরণের হাত থেকে নেদোমামিমাকে কেউ বাঁচাতে পারত না।

বাস সবে স্টার্ট দিয়েছে। ক্লাচে পা দিয়ে ড্রাইভার গিয়ারে হাত দিয়েছে। খালাসি গেট বন্ধ করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। নেদোমামি সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন, "ছেলেটাকে ফেলেই চলে যাবে? সারাটা দিন কি আর আনন্দ করতে পারব? মনটা খচখচ করবে। তুমি কীরকম মানুষ হে?"

ড্রাইভার কেবিনে উইন্ডস্ক্রিনের পাশের সিটটায় বসে আছেন নেদোমামা। যেন টয়ট্রেন থেকে বাতাসিয়া লুপ দেখছেন এমনভাবে দু'পাশের রাস্তা দেখছেন। গিন্নির গলা শুনে ঝাঁঝটাকে একটু কমিয়ে নিয়ে বললেন, "নো নো। তোমার ভাই বলে ক্ষমা করব না। আমার শ্যালক বলেও নয়। ডিসিপ্লিন ইজ ডিসিপ্লিন। ওর জন্য তো আমি আমার এতদিনের আদর্শ বিসর্জন দিতে পারব না।...তুমি আবার হাঁ করে দেখছ কী? আগে বাড়াও, একটু ব্যাক করো, আর একটু, বাঁয়ে কাটাও, কাটাও, কাটাও, ব্যস, এবার ডান দিকে কাটাও, পুরো কাটাও, কাটাও, আরে, ভাতফাত খাও না নাকি! অপদার্থ।"

ড্রাইভার বেচারির অবস্থা সঙ্গিন। পুরোনো লোক। নেদোমামিমাকেও খুব ভালো চেনে। অনেকদিনের পরিচয়। শুধু নেদোমামিমা কেন, গত পনেরো কুড়ি বছর ধরে আমাদের সফরসঙ্গী। সবার সঙ্গেই যথেষ্ট ভালো আলাপ। নেদোমামিমার কথা ভেবে স্টার্টও করতে পারছে না নেদোমামার ভয়ে চুপচাপ বসে থাকতেও পারছে না।

বাসটা যখন ছাড়বে ছাড়বে করছে, খালাসি গেট-ফেট বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে দিয়েছে, আমাদের পাশের বাড়ির চুনে মুখুজ্যের ভাই, রেশনের দোকানের মালিক, ফুঁকে মুখুজ্যে দাঁড়িয়ে বলল, "বলছিলাম কী, মানে বুঝলেন নেদ্-দা, এভাবে ভানুটাকে ফেলে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। কখনও তো এরকম লেট ওর হয়নি। অত মিষ্টি নিয়ে আসবে। কৃষ্ণনগর থেকে রানাঘাট আসতেই ট্রেনে চল্লিশ মিনিট সময় লেগে যাবে। তাছাড়া সেই নেদেরপাড়ার অধরের দোকান থেকে সরপুরিয়া তুলবে, বউবাজারের পরানের দোকান থেকে দই আর ছানার জিলিপি নেবে, দেরি তো হবেই। নিশ্চয় সাতটা তেতাল্লিশ ফেল করেছে...।"

ফুঁকেকাকা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে নেদোমামা বললেন, "তুমি আর ওকালতি কোরো না তো। এই সময়ের মধ্যে লোকে আমস্টারডাম থেকে সরপুরিয়া আর কানেক্‌টিকাট থেকে ছানার জিলিপি নিয়ে আসে। কী হে, শম্ভু, তুমি আবার স্টার্ট বন্ধ করে নিউট্রাল করে বসে থাকলে কেন? চলো, চলো, ন'টা বেজে গেছে পাঁচ মিনিট আগেই। এর পর তেল নিতে হবে। এখান থেকে বাঁশবেড়ে যেতেও তো কম করে দেড়-দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। ভাগ্যিস, আমি আগে থেকে দু'জনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা হয়তো পৌঁছে গেছে। রান্নার জোগাড়, এমনকি, দেরি থাকলে ভাত আর ডালটা চাপিয়েও দিতে বলেছি।"

নেদোমামা কিছুতেই নরম হচ্ছেন না দেখে বনিমাসি, চুমকিমাসি, ন'পিসি আর নেংটিদা সকলে মিলে বাবাকে ধরে বলল, "বিরুদা, আপনি একটু বলুন। আপনি বললেই হবে। আপনার কথাই শুনবে। ভানুকে ফেলে যেতে কারও মন সরছে না। আর যাওয়া কি যায়, আপনিই বলুন। কোন্ ভোরে উঠে ট্রেন ধরে কৃষ্ণনগর গেছে মিষ্টি আনতে। সে তো আমাদের জন্যই। যান, আপনি একটু বোঝান।"

বাস ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। ছোটোবাজার রিকশা স্ট্যান্ড পার হয়ে, রাধাবল্লভতলাকে পেছনে ফেলে বিশ্বাসপাড়ার কাছকাছি পৌঁছেছে, শম্ভুদা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক মেরেছে। উলটোদিক থেকে একটা ষাঁড় ছুটে আসছিল। শিবু মোদকের মিষ্টির দোকানে জিলিপির থালায় মুখ দিয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে শিবু মোদকের মেজো ছেলে ফড়িং পেল্লায় একটা বাঁশ নিয়ে তাড়া করেছে । আচমকা ষাঁড় ছুটে আসতে দেখে বিশ্বাসপাড়া রিকশা স্ট্যান্ডের হলধর রিকশা নিয়ে সটান হাইড্রেনের মধ্যে। স্পোর্টিং ক্লাবের মানু, কার্লাইল, বেঁটে বিশু আর অস্ট্রেলিয়া শিবের দোকানে কচুরি খাচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে হলধর সমেত রিকশাটা সোজা করতেই দেখে রিকশার নীচে এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিলেন কোর্টপাড়ার দিনেশ ডাক্তার।

ষাঁড়-বাস-রিকশা-ফড়িং-হলধর সকলকে নিয়ে অবস্থা এমন হল যে, আরও মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া পথ থাকল না।

নেদোমামা দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছেন। বাবা উঠে আস্তে-আস্তে বনেটের ওপর পা ঝুলিয়ে নেদোমামার দিকে মুখ করে বসে বললেন, "ঘাবড়াচ্ছ কেন? এক-আধঘণ্টা লেট শম্ভু ঠিক মেক-আপ করে নেবে'খন। তা ছাড়া ভাত-ডাল যখন করে রাখবে তখন আর চিন্তা কী? বাচ্চাগুলোর তো কষ্ট হবে না।"

"আপনি আবার এর মধ্যে এলেন কেন জামাইবাবু? ভানুটার বড্ড বাড় বেড়েছে। ও আজকাল ওর জামাইবাবুকেও কেয়ার করছে না। দু'খানা মিষ্টি আনতে এত সময় লাগে।"

বাবা ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, "দ্যাখো নেদো, তুমি যেমন আমার শালা, ভেনোও তো তোমার শালা। তার ওপর ও ছেলেমানুষ। একটা কাজেই তো গেছে। হয়তো জেনুইন কোনো বিপদ হয়েছে।"

"না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না। প্রশ্নটা পাংচুয়ালিটির, প্রশ্নটা ডিসিপ্লিনের। আমি, সরি, জামাইবাবু, প্লিজ কিছু মনে করবেন না।"

কথায় কথায় মিনিট দশ-পনেরো কেটে গেছে। নেদোমামা ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন আর মুখ দিয়ে অস্ফুট ইস-আস শব্দ করছেন। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যেতেই বাস আবার চলতে শুরু করেছে। বাবা নিজের সিটে বসে পড়েছেন। হঠাৎ বোঝা গেল ভানুর না আসা নিয়ে আর কেউ কোনো আহা-উহু করছে না। কোর্টপাড়ার মোড়ে আসতেই বনিমাসি, নেংটিদা আর পটলাদার ভাই ঝিঙেদা কাগজের প্লেটে জলখাবার সাজিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে সবার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। খাওয়া যখন শেষপর্বে, নেদোমামা আচমকা বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "হোয়াট! এ কী স্বপ্ন! এ কী মায়া। সরপুরিয়া এল কোত্থেকে? রানাঘাটে তো কোনো দোকানে সরপুরিয়া করে না। আকাশ থেকে উদয় হল নাকি?"

নেদোমামিমা যেন বদলা নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এমনভাবে বলে উঠলেন, "তোমার অত খোঁজে দরকার কী। পেয়েছ, খেয়ে নাও। কোত্থেকে এল, কে আনল, এসব খোঁজে তোমার জমিদারির কী উপকারটা হবে শুনি।"

নেদোমামা চুপ করে গেলেন। বোধ হয় রিয়ালাইজ করতে পারছেন যে কাজটা ঠিক হয়নি, বিশেষ করে বাবা অনুরোধ করার পরেও। শম্ভুদা ততক্ষণে পরামানিকদের পেট্রোলপাম্পে বাসটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তেল নেওয়া শেষ হলে যখন টাকা দিতে যাবেন তখন নেদোমামার মাথায় হাত। মুখটা একদম পাঁচতলা থেকে মাটিতে আছড়ে পড়া ছানার জিলিপির মতো থেবড়ে গেছে। কাঁচুমাচু মুখ করে বাবাকে বললেন, "জামাইবাবু, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার ফোলিও ব্যাগটা শিবে মোদকের দোকানে ফেলে এসেছি। তখন ষাঁড়ের গুঁতো থেকে বাঁচবার জন্য শিবে মোদকের দোকানে ঢুকেছিলাম, বেঞ্চিতে বসেও ছিলাম, বড়োজোর মিনিটখানেকের জন্য। ব্যাগটা ফেলে এসেছি। স্পষ্ট মনে পড়ছে। চলুন, ফিরতে হবে। অনেক টাকা আছে।"

বাবা মুখের মধ্যে যথাসম্ভব দৃঢ়তা, কাঠিন্য ও গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললেন, "তা কী করে হয় নেদো, অলরেডি ভেনোর জন্য তোমার আধঘণ্টা লেট হয়েছে, তার ওপর ষাঁড়ের খ্যাপামির জন্যও মিনিট দশেক। আর দেরি করলে পিকনিক ক্যানসেল করে দাও, নচেৎ আমাকে বাদ দাও, আমি বুড়ো মানুষ, অত ধকল সইবে না।"

বাবাকে রেগে যেতে দেখে নেদোমামা বললেন, "ঠিক আছে, থাক। শিবেকে ফোন করে দিচ্ছি, ব্যাগটা তুলে রাখবে। তোমাদের যার কাছে যা একস্ট্রা টাকা আছে দাও। তেলটা ভরে নিই। সামনের থানায় গিয়ে কারও থেকে না হয় কিছু টাকা ধার করে নেব। নেদোমামিমা হঠাৎ বলে উঠলেন, "আর চেঁচাতে হবে না। এই নাও তোমার ব্যাগ।"

নেদোমামা বিস্ময়ে অভিভূত, "এ ব্যাগ তোমার কাছে এল কোত্থেকে! আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে শিবের ক্যাশবাক্সের পাশে ব্যাগটা রেখে আমি শিবেকে বলেছিলাম একটু খেয়াল রাখতে।"

নেংটিদা বলল, "নেদোমামা, ভানুমামা না এয়েছে। পেছনে লাগেজ ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আপনার ভয়ে বেরোচ্ছে না। ভানুমামাই তো, যখন বাসটা বিশ্বেসপাড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, তখন দৌড়তে দৌড়তে এসে বাসের ডিকির মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। আর ভাগ্যিস শিবেদা ব্যাগটা ডিকির মধ্যে ছুঁড়ে দিতে পেরেছিল। শম্ভুদা তখন ইস্‌পিড দিয়ে দিয়েছে। ভানুমামা ঝুলতে ঝুলতে ব্যাগটা লুফে নিয়েছিল। ভানুমামার না অনেক জায়গায় ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেছে।"

নেদোমামা সিট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, "ভানুটা এসেছে! কই, কই দেখি।

ওকে তো পুরস্কার দিতে হয়। ওর জন্যই তো টাকাগুলো ফেরত পেলাম। তবে সেই ষাঁড়টাকে আগে প্রাইজ দিতে হয়। যেভাবে তেড়ে এল...।"

মিলনসঙ্ঘ স্কুলের ভূগোলস্যার বিশ্বামিত্র তোপদার বললেন, "নেদোবাবু, প্রাইজ যদি কাউকে দিতে হয় তো সব প্রাইজ শম্ভুকে দিন। অনেক দূর থেকে আয়নাতে ও ভানুকে দেখেছিল দু'হাতে দুটো ঢাউস প্যাকেট নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে। আচমকা ব্রেক করে ও একটা যানজট সৃষ্টি করে ভানুকে ওঠার সুযোগ করে দেয়। পাছে সামনে দিয়ে বাসে উঠলে আপনার কাছে বকুনি খায় সেজন্য শম্ভু কাজের ছুতোয় খালাসিকে পাঠিয়ে লাগেজ ট্রাঙ্ক খুলিয়ে ভানুকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দেয়। তবেই না শিবে মোদক ব্যাগটা পেছন থেকে ছুড়ে দিতে পেরেছিল।"

নেদোমামার মুখে কোনো কথা নেই। বোঝা যাচ্ছিল একটা অপরাধবোধের ছায়া ওঁর কপালের ভাঁজগুলোর মধ্যে খেলা করে যাচ্ছিল। মুখে একটা কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটিয়ে তুলে বাবার দিকে চেয়ে বললেন, "জামাইবাবু, ভানুকে তো একটা বিশেষ পুরস্কার দেওয়া উচিত। সরপুরিয়াটা যা টেস্টি ছিল না, কী বলব।"

"অবশ্যই দেওয়া উচিত। তা ছাড়া যেভাবে ভানু শিবের ছুড়ে দেওয়া ব্যাগটাকে রানিং বাস থেকে ঝুলে পা দিয়ে শট মেরে উঁচুতে তুলে হাত দিয়ে লুফে নিল সেটা জন্টি রোড্‌স দেখলে, আমি সিওর, প্রচণ্ড লজ্জা পেয়ে যেত।"

এতক্ষণ ভানু গুটিসুটি মেরে লাগেজ ট্রাঙ্কের মধ্যে বসে ছিল। নেদোমামার কথায় আশ্বস্ত হয়ে একদম শেষ রো-য়ের সিটের পেছন থেকে মাথা তুলে মুখখানা কাঁচুমাচু করে হাসল। তারপর সিট টপকে নেদোমামার সামনে এসে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল।

নেদোমামা ভানুমামাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ব্রাভো ব্রাভো। এর নামই ডিসিপ্লিন, এর নামই রেসপনসিবিলিটি। সিনসেরেটি আর পাংচুয়ালিটির গ্লেয়ারিং এগজাম্পল। এইরকমই তো আমি চাই।"

ফুঁকে মুখুজ্যে বললেন, "নেদ্‌দা, ভানুর নামে একটা ওয়েবসাইট খুলে দিলে কেমন হয়, ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ভানুসিনসেরেটি ডট কম। আমরা সকলে টিপ্‌স নিতে পারব। সারা দুনিয়ার লোক সিনসেরেটি শিখতে পারবে।"

নেদোমামা চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ দুটো আড়াল করে বললেন, "যা বলেছ! সিনসেরেটি ডট কম। দারুণ, দারুণ।"

টুবুল আজ টিফিন নেয়নি

সকাল ন'টা নাগাদ তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল বাড়িতে। যেন আচমকা একটা বিস্ফোরণ সারা বাড়ির ভিত কাঁপিয়ে দিল।

বড়োবাবু, অর্থাৎ টুবুলের জ্যেঠুসোনা, দিগন্তসুন্দর, স্নান-খাওয়া সেরে কোর্টে বেরোবেন। বড়ো কেসের রায় বেরোবার কথা। ঠাকুরঘর থেকে দই আর চন্দনের ডবল ফোঁটা নিয়ে আয়নাতে একবার মুখমণ্ডলখানা দেখে নিলেন। তারপর জুতো পরবেন বলে সোফার ওপর বসে সবে একপায়ে মোজা গলিয়েছেন এমন সময় বিস্ফোরণটা ঘটল।

কাজের মেয়ে সুমিত্রা টুবুলকে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির সামনে স্কুলের ভ্যানগাড়ির হর্ন শোনা যাচ্ছে। ঘরের ভিতর থেকে টুবুলের মা'র চিৎকার, "টিফিনবাক্সটা ফেলে গেলি সুমিত্রা। তাড়াতাড়ি নিয়ে যা। গাড়ি ছেড়ে দেবে। বাবুসোনা, টিফিন খাবে ঠিক করে। ফেরত আনবে না কিন্তু। খুব রাগ করব।"

টিফিনবাক্স নেবার জন্য সুমিত্রা সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, টুবুল বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল—"আমি ওই টিফিন নেব না পিসি। ওটা পর্যুষিত।"

"সেটা আবার কি? টিফিন আবার ওসব হয় নাকি? কী বললি তুই? এ কথা তো আমি কোনোদিন শুনিনি।"

টুবুল আগের মতোই ঝাঁজের সঙ্গে বলল, "তা শুনবে কেন? তোমার মতো নাদান আর কে আছে?"

টুবুলকে ছেড়ে সুমিত্রা দিশাহারা হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, "ও বউদি, দেখ না টুবুল কি সব বলছে। পজ্জুসিত, নাদান—এসব কথা তো আমি জন্মে শুনিনি। আমি কেন, তোমরাও শোননি। বড়দা, আপনি শুনেছেন টুবুল কী বলছে?"

দিগন্তসুন্দর একপাটি মোজা গলিয়ে একটা রাবারব্যান্ড লাগাচ্ছিলেন ওটার ওপরে। ইলাসটিক ঢিলে হয়ে গেছে। কবে থেকে ভাবছেন একজোড়া মোজা কিনবেন, কাজের চাপে তা আর হয়ে উঠছে না। আরেক পাটি মোজা হাতে নিয়ে বললেন, "বাবুসোনা, টিফিন নেবে না? কী হয়েছে বাবা টিফিনে?"

"ওই টিফিনটা পর্যুষিত। আমি নেব না।"

টুবুলের মুখে এই গুরুগম্ভীর দুর্বোধ্য শব্দ শুনে দিগন্তসুন্দর ঘাবড়ে গিয়ে এমনভাবে ডান পাটা ছুড়লেন যে সেন্টার টেবিলে রাখা জুতোর ব্রাশটা শচিনের ব্যাটের তাড়া খাওয়া বলের মতো দ্রুতগতিতে গিয়ে আঘাত করল ওয়াশবেসিনের ওপরে দেয়ালে টাঙানো আয়নাটার গায়ে। ঝনঝন করে কাচের টুকরো গড়িয়ে পড়ল বেসিনের ভেতরে, মেঝেয়।

দিগন্তসুন্দরকে কিছু বলার মতো সাহস বা বুকের পাটা এই বাড়িতে এক জনেরই আছে।

টুবুলের বড়োমা পুজো সেরে নীচে নামছিলেন। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তার স্বামীর কীর্তিকলাপ দেখে প্রথমেই সি শার্পে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আবার একটা কাজ বাড়ালে তো। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে পার না, সংসারে একটা কুটো নেড়ে দু'খান করতে পার না, তার ওপর এই অকাজ। ওরে সুমিত্রা, তাড়াতাড়ি ঝাঁটা বারুন নিয়ে আয়। ওঃ তুমি আবার এর মধ্যে উঠছ কেন? এক পায়ে মোজা পরে তো জড়ভরত হয়ে আছ, আর কাজ দেখিয়ে লাভ নেই। বসে থাকো দয়া করে। টুবুল, বাবা, ওদিকে যেয়ো না। ঘরময় কাচ। আয়নার পারা খুব সাংঘাতিক। গায়ে লাগলে ঘা হয়ে যাবে।"

সবাইকে আর একপ্রস্থ অবাক করে দিয়ে টুবুল বলল, "কিচ্ছু হবে না বড়োমা। আমার পয়জার আছে। তবে বড়োমা, জ্যেঠুসোনার তকদিরটা খুব ভালো। বুরুশটা যেভাবে অশনির মতো গেল আমি তো প্রমাদ গুনছিলাম।"

গেটের বাইরে শিশিরের শব্দ শোনা গেল। শিশির স্কুল-ভ্যানের চালক। হর্ন বাজিয়ে বাজিয়ে ক্লান্ত হয়ে ও শেষমেশ বাড়িতে চলে এসেছে। টুবুলের মা পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে বারান্দায় এসে বললেন, "শিশির, টুবুলের শরীরটা আজ ভালো নেই। ওকে আজ স্কুলে পাঠাচ্ছি না। তুমি যাও। তোমার অনেক দেরি হয়ে গেল।"

জ্যেঠুসোনা বললেন, "টুবুল, টিফিনটা কী হয়েছে বললে, পর্যুষিত? সেটার মানে কী? মেজো বউ, ওর শরীরটা ভালো আছে তো? মনে হচ্ছে পেট গরম হয়ে ভুল বকছে। ক্লাস ওয়ানের ছেলের মুখে এমন সব কথা আসছে কী করে? আঠাশ বছর ওকালতি করছি, কত খটোমটো শব্দের সংস্পর্শে এসেছি, এরকম বিস্ময়কর কথা কখনও শুনিনি। পর্যবসিত বলে কথা হয়তো শুনেছি। মানেটা কী জানি না। কিন্তু পর্যুষিত!

নাঃ, এ আমার কম্মো নয়। মেজোবাবু জানলেও জানতে পারে। অধ্যাপক মানুষ, তার ওপরে নাম করা লেখক। জ্ঞানের পরিধিও অনেক বেশি।"

"মেজদা তো বাজারে গেছেন। এক্ষুনি এসে পড়বেন। টুবুলের মা-র চোখেমুখে যথেষ্ট উদ্বেগ। যে ছেলের এখন 'জ্যাক অ্যান্ড জিল' রাইম আর 'তিন দুগুণে ছয়' পড়ার কথা তার মুখে....। বড়দা, আপনি একটা কিছু করুন। আমার তো ভালো ঠেকছে না। ওর ওপরে কি রবিঠাকুর ভর করলেন?"

সুমিত্রা সারা ঘর ঝেঁটিয়ে কাচের টুকরো তুলছে আর গজগজ করে কী সব বিড়বিড় করছে। টুবুলের বড়োমা সিঁড়ির ওপরে বসে টুবুলের সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলছেন। গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন টুবুলের মেজো জ্যেঠুমণি সর্বাঙ্গসুন্দর।

বাজারের ব্যাগটাকে টিভি টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে রুটিনমাফিক বেসিনে সাবান দিয়ে হাত ধুলেন। তারপর পকেট থেকে চিরুনি বার করে মাথায় চালাতে গিয়ে থমকে গেলেন। শুধু ফ্রেমটা ঝুলছে। মাঝখানে ঝুলকালি মাখা সাদা দেয়াল। বুঝলেন একটা ছোটোখাটো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলেছেন তার উকিল বড়দা।

চিরুনিটা পকেটে রেখে বললেন, "কী টুবুলবাবু, আজ স্কুলে যাওনি কেন? হোমটাস্ক করনি? না টিভিতে ক্রিকেট খেলা আছে?"

টুবুলের মা ঝাঁপিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, "দেখুন মেজদা। দিব্যি ভালো ছেলে সকালে বিছানা থেকে উঠল। ভাত খেল। জামাকাপড় পরল। টিফিনবাক্স নেবার কথা বলতেই মুখ দিয়ে কী সব দুর্বোধ্য অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করল। সুমিত্রা তো রীতিমতো ভয় পেয়ে সিঁটিয়ে বসে আছে। আপনি বড়দাকে জিজ্ঞেস করুন। বড়দাও কিছু বলতে পারেননি।"

দিগন্তসুন্দর বললেন, "হ্যাঁরে দুষ্টু, তুই কি পর্যুষিত কথাটা শুনেছিস? টুবুলবাবু বলেন কিনা টিফিন খাওয়া যাবে না, ওটা পর্যুষিত। ছেলেটার আই কিউ লেভেল কি বেড়ে গেল! তুই বরং ওর বাবার সঙ্গে আলোচনা করে একটা কিছু কর। আমি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসছি। আমার আজ কোর্টে না গেলেই নয়।"

টুবুলের বাবা অনিন্দ্যসুন্দর সকালবেলায় বেরিয়েছিলেন রুগি দেখতে। এখন চেম্বারে বসবেন। দিগন্তসুন্দর বেরোবার মুখে ভাইকে দেখে বললেন—"মিস্টু, তোমার ছেলের মাথা বিগড়িয়েছে। ডাক্তারি করো। ব্রেন স্ক্যান করতে হবে মনে হচ্ছে।"

সর্বাঙ্গসুন্দর হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। টুবুলের মার দিকে তাকিয়ে বললেন—

"টুবুল কিচ্ছু উল্টোপাল্টা বলেনি। পর্যুষিত কথাটার অর্থ হচ্ছে বাসি বা গন্ধযুক্ত। এটা তৎসম শব্দ। তবে চিন্তার বিষয় হল, ও এসব জানলে কী করে।"

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে টুবুল বলল, "মেজোজ্যেঠুমণি, তুমি রাইট। একদম ঠিক বলেছ। আর সুমিত্রাপিসিটা একটা নাদান, মানে মুখ্যু, নির্বোধ। কী, ঠিক বলিনি, জ্যেঠুমণি? আমি পয়জার মানে জানি, জুতো। আর তকদির মানে তো ভাগ্য, তাই না বাবা? দেখোনা মা আর বড়োমা কিচ্ছু বুঝতে পারছে না।"

অনিন্দ্যসুন্দর বললেন, "তবে যাই বল মেজদা, একটা ক্লাস ওয়ানের ছাত্রের পক্ষে এগুলো জানাতো দূরের কথা, উচ্চারণ করাই অকল্পনীয় ব্যাপার। এগুলো নিশ্চয় ও পড়েনি কোথাও। পড়া সম্ভবও নয়।"

"এগ্‌জ্যাক্টলি। আমিও তো সেই কথাই ভাবছি। আর এই বয়সের কোনো ছেলের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় এগুলো জানা সম্ভব নয়। ডেফিনিটলি ওর ব্রেনের কোনো ডিসঅর্ডার হয়েছে। তুই তোর বন্ধু কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বল। মনে হচ্ছে এম আর আই করাতে হবে।"

সর্বাঙ্গসুন্দর টুবুলের মা ও বড়োমা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোনো, ওকে কুল রাখো। বেশি কথা বোলো না। থানকুনি পাতা আর ব্রাহ্মি শাক এনেছি। থানকুনি পাতার ঝোল খাওয়াও আর ব্রাহ্মি শাক বেটে ব্রহ্মতালুকে ঠান্ডা রাখো। হয়তো পিত্ত বা বায়ুর আধিক্য থেকে ওরকম হয়েছে।"

বড়োমা বললেন, "আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি ওর ওপরে রবিঠাকুর ভর করেছেন। ও ওর আগের জন্মের কথা বলছে। তোরা প্রোফেসর ডাক্তার হয়ে এটা বুঝতে পারছিস না?"

"প্রোফেসর ডাক্তার বলেই তো বুঝতে পারছি না। তোমার কাছে যেটা সহজ আমার কাছে, মেজদার কাছে সেটাই দুর্বোধ্য। এই ই-মেল আর ডট কমের জমানাতেও তোমরা যে ভর করা, জন্মান্তরবাদ এ সবে বিশ্বাস কর এটাই আমাদের কাছে সহজবোধ্য নয়। তবে টুবুলের এই অদ্ভুত আচরণও যে স্বাভাবিক নয় সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"

টুবুল এতক্ষণ ওর ছোটোমামার দেওয়া 'পে লোডার' নিয়ে খেলছিল। বাবার গলা পেয়ে বলল, "আমি বিপ্রলব্ধ মানে জানি। পথিকবণিতা, শ্রোত্রপেয়, দূরবন্ধু এগুলোর মানেও জানি। মহাকবি কালিদাসের বইতে আছে।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কী করে জানলি?"

"আমি জানি। আমি জানি। বইতে পড়েছি।"

মা, বড়োমা আর সুমিত্রাপিসির সমবেত চেষ্টায় দুপুরে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল টুবুলকে। দিগন্ত-সুন্দর কোর্ট থেকে ফিরে এসেছেন। মেজোজ্যেঠু, মানে সর্বাঙ্গসুন্দর কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছেন কদিন হল। একটা বইবাঁধাইওলাকে ডেকে রাজ্যের জরাজীর্ণ পোকায় খাওয়া বইগুলো বাঁধিয়ে নিচ্ছেন। আজ নিয়ে চারদিন চলছে বইবাঁধানোর উৎসব। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, বিভূতি রচনাবলি থেকে শুরু করে সারা বছরের দেশ পত্রিকা এবং অন্যান্য পত্রিকাগুলোও ভালো করে চামড়ার জ্যাকেট দিয়ে বাঁধিয়ে সোনালি রঙে নাম লিখিয়ে নিচ্ছেন। গত তিরিশ বছর ধরে, 'দেশ' পত্রিকা রাখছেন। দু'বছর বাদে বাদে সব সংখ্যা একসঙ্গে বাঁধিয়ে নেন।

টুবুল দুপুরবেলা ভালোই ঘুমিয়েছে। বড়োমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমোনো ওর একটা বড়ো নেশা। বিকেল চারটে নাগাদ ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজের থেকে বলল, "আমাকে দুধ বিস্কুট দাও। আমি খেলতে যাব। আজ মিতুলদের হারিয়ে দিতে হবে। আমি শচিন আর মিতুল ম্যাকগ্রাথ। মেরে ছাতু করে দিতে হবে।"

টুবুলের মা জোড়হাত করে কপালে ঠেকালেন—"যাক্ বাবা, ঠাকুর মুখ তুলে দেখেছেন। আর উলটোপালটা বলছে না। রবিঠাকুরের ভূত বিদেয় হয়েছে।"

বড়োমা বললেন, "সুমিত্রা, ও খেলতে যাচ্ছে। তুইও সঙ্গে যা। একটু খেয়াল রাখিস। সে রকম কিছু বুঝলে খবর দিস।"

টুবুলের বাবা বললেন, "আজ না হয় খেলতে নাই গেল। আমিও চেম্বারে যাচ্ছি না। ওকে একটু অবজার্ভেশনে রাখিস। বড়দা মেজদাও রয়েছে। আমার বন্ধু অলোক চৌধুরী, সাইকিয়াট্রিস্ট, বলেছে, একবার এসে দেখে যাবে। ও বলেছে নার্ভাস সিস্টেমে কোন গণ্ডগোল হতে পারে। ওর সাবকনশাস মাইন্ডে কিছু চিন্তা আনাগোনা করছে।"

দিগন্তসুন্দর এক কাপ চা হাতে নিয়ে বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছেন। সকালে শুধু হেডলাইনটা দেখে ছেড়ে দেন। বিকেলে আদ্যোপান্ত পড়েন।

সর্বাঙ্গসুন্দর তাঁর লাইব্রেরি ঘরে বই বাঁধাইওয়ালার সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন। বই বাঁধাইয়ের ইতিহাস, মুদ্রণ শিল্পের ক্রমবিকাশ থেকে শুরু করে রসরচনার স্রষ্টাদের তালিকা পর্যন্ত, কিছুই বাদ নেই।

অনিন্দ্যসুন্দর বারান্দার আর একটা দিকে চেয়ারে বসে একটা ডায়েরি নিয়ে ছড়া

লিখছেন। ছড়া লেখায় ইতিমধ্যেই বেশ নামডাক হয়েছে। কয়েকখানা বইও বেরিয়েছে। একটা দুটো বাদ দিলে সবগুলোই নিজের পয়সায়। মেজদা সর্বাঙ্গসুন্দর মাঝেমধ্যেই রসিকতা করে বলেন, "ডাক্তার হয়েও ছড়া লেখে এরকম মানুষ দেখা যায় না বললেই হয়। ডাক্তাররা গদ্যসাহিত্যে খ্যাতিমান হয়েছেন এরকম অনেক আছে। তা বলে ছড়া? সারপ্রাইজিং, অ্যামেজিং, আ বিগ জোক।"

ছোটো ভাইয়ের তাতে কিছু এসে যায় না। বড়ো দাদারা সব কিছু বলতে পারে। তবে দাদা সব খবর রাখে না। অনেক ডাক্তারও ভালো ছড়া লেখেন।

একটা ভালো লাইন মাথায় এসেছিল। টুবুল সব ঘেঁটে দিল। বাবার কাছে গিয়ে বলল, "বলো দেখি, কাকোদর মানে কী।"

"আবার উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করেছিস। কে শেখাল তোকে? কে বলেছে এই শব্দ? আমি মানে জানি না। আমি শুনিনি কখনও। বড়দা, মেজদা, বড়ো বৌদি, দেখো টুবুল আবার কী বলতে শুরু করেছে?"

"আমি কাকোদর মানে জানি। সাপ। পশে যদি কাকোদর গড়ুরের নীড়ে, ফিরে কি সে যায় কভু আপন বিবরে।"

সর্বাঙ্গসুন্দর ততক্ষণে চলে এসেছেন বারান্দায়। মনের উচ্ছ্বাস উপচে পড়ছে। নিজের মনেই বলতে শুরু করলেন, "প্রতিভা, ট্যালেন্ট। কোথায় লাগে শচিন তেন্ডুলকর, আর কোথায় লাগে অবাক মেয়ে মৌসুমী। বলেছিলাম না, দেখে নিস, সবাইকে ছাপিয়ে যাবে। প্রডিজি। সুপার্ব। আনইমাজিনেবল। তুই জানিস না মিস্টু, ও কী বলল। কীসের লাইন জানিস? ভাবতে পারবি না, তোর আমার দাঁত ভেঙে যাবে উচ্চারণ করতে, মানে বোঝা তো দূর কী বাত। জিনিয়াস। একদিন নোবেল ফোবেল পেয়ে যাবে। ক্লাস ওয়ানের ছেলের মুখে মেঘনাদবধ কাব্য! ভাবা যায় না।"

কিন্তু মেজদা, ব্যাপারটা হচ্ছে কী করে একবারও কি ভেবেছ? ওর জন্মানোর পরে তো বাড়িতে কেউ মেঘনাদবধ কাব্য পড়েছে বলে আমার জানা নেই। নাঃ, এক্ষুনি অলককে ফোন করে দিই, সন্ধের সময় এসে দেখে যাবে।"

বড়োমা বললেন, "ডাক্তার ডাকছ ডাকো, দেখাও। তবে তোমরা তো বিশ্বাস কর না, হেসেই উড়িয়ে দাও। কিন্তু এ সব আছে। ওর ওপরে কোনো একজন মহাপুরুষ ভর করেছে। আগের জন্মে টুবুল নিশ্চয় এক মহাপণ্ডিত ছিল। হিংসার বশে অন্য কোনো পণ্ডিতের আত্মা ওর ওপর ভর করেছে। হ্যাঁ গো, তুমি হাত গুটিয়ে চুপচাপ

বসে আছ কেন? কীসের উকিল তুমি। উকিল না ছাই, ওঠো, একজন ভালো ওঝা বা গুনিন নিয়ে এসো। অপদেবতাকে ঝেড়ে ওর ভূত ভাগাতে হবে।"

দিগন্তসুন্দর আমতা আমতা করে বললেন, "একটু অপেক্ষা করো। অধৈর্য হোয়ো না। মিস্টুর বন্ধুকে এগজামিন করতে দাও না আগে। ডাক্তারিশাস্ত্র কী বলে দেখো না।"

বিকেলটা ভালোয় ভালোয় কাটল। হেসে খেলে জ্যেঠুদের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিল টুবুল। সন্ধের পর মা বলল, "টুবুল পড়তে বোসো। বই নিয়ে এসো। আজ স্কুল কামাই হয়েছে। কাল কিন্তু স্কুলে যেতে হবে।"

সর্বাঙ্গসুন্দরের লাইব্রেরি ঘরে হঠাৎ তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সারা বাড়ি কেঁপে উঠল। বই বাঁধাইয়ের ছেলেটা, জনার্দন না কী যেন নাম, টেবিলের একপাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা থমথমে। চোখদুটো ছলছল করছে। হাতদুটো একজায়গায় করে কচলে যাচ্ছে। সীমান্তে রকেট লঞ্চার থেকে আসা গোলার মতো সর্বাঙ্গসুন্দরের কথাগুলো কানের ওপরে ঝাপটা মারছে। "ইডিয়ট। ফুলিশ। পড়াশোনার মর্ম তুমি কি বুঝবে? আরে বাবা, বই বাঁধাই করা আর বই পড়া হেভেন অ্যান্ড হেল। আমার কতদিনের সঞ্চয় পরিশ্রম গোল্লায় পাঠিয়ে দিল। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। গুণ ছুঁচ দিয়ে একটা খাতা সেলাই করার ক্ষমতা নেই, উনি করবেন আমার বই বাঁধাই। রাবিশ। যেখান থেকে পারো মিসিং পাতাগুলো খুঁজে দাও।"

দিগন্তসুন্দর আর অনিন্দ্যসুন্দর ততক্ষণে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন।

"কী হয়েছে কী? ছেলেটাকে তুলোধোনা করছিস কেন?"

"বড়দা, তুমি জান না ও কত বড়ো অন্যায় করেছে। তুমি হলে তো এতক্ষণে তিনশো দুই, চারশো বিশ লাগিয়ে দিতে।"

"কী করেছে বলবি তো, না শুধুই চেঁচাবি?"

"সব ভুল। মাই টোয়েন্টি ইয়ার্স অব লেবার লস্ট। দু বছরের 'দেশ' পত্রিকা, কত যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। কত বার বড়ো বৌদি বিক্রি করার জন্য পুরোনো খবরের কাগজের গাদায় রেখে দিয়েছে, আর আমি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। একটা সংখ্যার তিনটে পাতা নেই। মাথা কুটে মরলেও ও জিনিস আমি পাব? আরও কী ভণ্ডুল করেছে, কে জানে।"

লাইব্রেরি ঘরের চ্যাঁচামিচি থামতে না থামতেই টুবুলের মার গলা, "অঙ্ক বইখানাও ঝুরিভাজা করেছ? এই তো তিনখানা বই সেদিন বাঁধিয়ে দিল জনার্দনকাকু। অঙ্ক বইটা এরমধ্যেই খুলে গেল কী করে? যাও, মেজোজ্যেঠুমণিকে দেখিয়ে এসো।"

টুবুলের কাছ থেকে অঙ্ক বইটা হাতে নিয়ে কিছু দেখার আগে জনার্দনকে আর এক প্রস্থ বকুনি, "এই তোমার এলেম? এই তোমার অ্যাকুমেন? এই তোমার এক্সপার্টাইজ? তুলে দাও কারবার। একটা ক্লাস ওয়ানের বই বাঁধাতে টেইল ইন কাউডাং হয়ে গেলে। হবে না। কিস্যু হবে না। বামুনের ছেলে শালগ্রাম হাতে নিয়ে চাল কলার ধান্দা করো। বইয়ের কাজ তোমার নয়।"

অঙ্কবইটাকে ডান হাতে ধরে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে পাতাগুলোকে বাস কন্ডাক্টরের টিকিট ওড়ানোর কায়দায় দুবার ফড় ফড় করে উড়িয়ে দিলেন। তারপর 'হোয়াট' 'স্ট্রেঞ্জ' বলে মাঝখানে একটা পাতা খুলে চিৎকারে বাড়ি ফাটিয়ে দিলেন, "পেয়েছি, পেয়েছি। ইউরেকা। মিস্টু, দুষ্টু, প্রবলেম সল্‌ভড। তবে টুবুল নয়, আসল জিনিয়াস হল জনার্দন। কী করেছে দেখ। 'দেশ' পত্রিকায় ভট্টোজির লেখা 'বাগর্থকৌতুকী'র একটা পাতা টুবুলের অঙ্ক বইতে।"

টুবুলের মা, বড়োমা, সুমিত্রা, সবাই ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছে। টুবুল জনার্দনের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "আরও আছে মেজোজ্যেঠুমণি। কালিদাসের মেঘদূতের একটা...।"

"বাস বাস। তোমার কেরামতি আনভেইলড। খেল খতম। পয়সা হজম। ভেবেছ কী? সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, একাদশীর ফাদার ডাজ নট নো। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া, বাব্বা, শিব্‌স অসাধ্য। এই তো সেই মেঘদূতের পাতা। এই তো 'পথিকবণিতা', 'দূরবন্ধু', 'শ্রোত্রপেয়'।"

বড়োমা বললেন—"আর ওই যে পর্যুদস্ত না কী যেন...।"

"ওয়েট ওয়েট। পেয়ে যাবে। এই তো, এই তো 'আনায় মাঝারে ব্যাঘ্রে পাইলে...' হ্যাঁ, তার তলায়, তার তলায়, অ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যাই তো 'পশে যদি কাকোদর গড়ুড়ের নীড়ে.....' বাবা মাইকেল, তুমি শেষ অবধি জনার্দনের পাল্লায় পড়লে। একেবারে 'লাইম অ্যান্ড ইংক ইন বাম্বু' করে দিলে। ক্লাস ওয়ানের বইতে মেঘনাদবধ কাব্য। ওলটাও, ওলটাও উলটিয়ে যাও, আরও সামনে। পেয়েছি, ক্যাচ-কট-কট। ছোটো সাইজের পাতা বলে লুকিয়ে ছিল ; খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এই তো পর্যুষিত, নাদান,

তকদির, পয়জার সব আছে। টুবুলবাবু তুমি ধরা পড়ে গেলে। দেবসেনাপতির লেখা 'অর্থ জানো' বইটার দুখানা পাতা। জনার্দন, সামনের বারের 'নোবেল' তোমার বাঁধা।"

দিগন্তসুন্দর এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন। তারপর বললেন, "সত্যিই টুবুলবাবু আমাদের একেবারে পর্যুদস্ত করে ছেড়ে দিল।" পরক্ষণেই টুবুলের বড়োমার দিকে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিলেন।

বড়োমা বললেন, "ঢের হয়েছে। অনেক ওকালতি করেছ, এবার জনার্দনকে জামিন দিয়ে দাও। আর হ্যাঁ, টুবুলকে নিয়ে কাচের দোকান থেকে একটা আয়না কিনে আনো। কাল সকালে দাড়ি কামাবে কি জলের দিকে তাকিয়ে?"

বড়ো কাচের প্লেটে সুমিত্রা বেগুনি আর ফুলকপির বড়া এনে বলল, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। চা আসছে।"

সর্বাঙ্গসুন্দর এতক্ষণে গলে জল হয়ে গিয়েছেন। জনার্দনের গায়ে হাত দিয়ে কাছে ডেকে বললেন, "দ্যাখ তো খেয়ে, জনার্দন। বেগুনিগুলো পর্যুষিত হয়ে যায়নি তো?"

টুবুল একটা কামড় দিয়ে বলল, "লা জবাব। আর একটু হলেই সুমিত্রা পিসি 'লাইম অ্যান্ড ইংক ইন ব্যাম্বু' করে দিয়েছিল, মানে 'বংশে চুনকালি' লেপে দিচ্ছিল, তাই না, মেজো জ্যেঠুমণি?"

হেরে গেলেন হরিপদবাবু

ব্যাটটা খুব জোরেই হাঁকিয়েছিল শিবু, তা বলে বলটা যে ওইভাবে পল্টুদের দোতলা বাড়ির ছাদ এবং ছাদের মাথায় আট ফুট উঁচু অ্যান্টেনা টপকে টেকো আলু দাদুর বাগানে গিয়ে পড়বে তা কেউ ভাবেনি। শুধু কি পড়া, পাঁচটা ডালিয়া এবং দুটো ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ গাছকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। যে শিবু ম্যাচ খেলতে গেলে কোনোদিন দুয়ের বেশি রান করতে পারে না, জীবনে ছক্কা মারা তো দূরের কথা কোনোদিন একটা চারও মারতে পারেনি, সে যে ও রকম একটা গগনবিহারী শট নেবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। বলটা যখন মাঠ পেরিয়ে ঝন্টুদের গাব গাছের মাথা টপকে পল্টুদের বাড়ির ছাদের দিকে উড়ে গেল সবাই তখন অবাক হয়ে বলটার উড়ে যাওয়া দেখছিল, আর শিবু এক বিঘৎ জিভ বার করে মুখখানা কাঁদো কাঁদো করে বলছিল কীক্-কী হবে এবার। মাম্-মা-ইরি, বিশ্বাস কর আ-আমি না ই-ইচ্ছে করে মা-মারিনি।"

চাঁদু বলল, "ওসব জানি না বাবা। তুই মেরেছিস, তুই গিয়ে বল আনবি। কালকেই বাবা বল কিনে দিয়েছে। হারিয়ে গেলে ভীষণ মারবে।"

শিবু এবারে সত্যিই কেঁদে ফেলল। বলল "টে-টে-টেকো আলু দা-আ-দুর বাগানে বব্-বল পড়লে আর দেদ্-দেবে না। বুড়ো আ-আমাদের তিরিশখানা বল গায়েব করেছে।"

টেকো আলু দাদুর আসল নাম হরিপদ বাগল। মাথায় মস্ত টাক এবং টাকের মাঝখানে একটা মস্ত আলুর মতো আব আছে বলে সবাই টেকো আলু দাদু বলে। আগে আর্মির মেজর ছিলেন, এখন শুধু ফুলের বাগান নিয়ে মেতে আছেন।

পল্টু বলল—"এই শিবু, চলনা দাদুকে গিয়ে বলি। দিয়ে দিলেও দিতে পারেন। তা ছাড়া ওঁর নাতি বঙ্কাকে তো আমরা খেলতে নিই মাঝেমাঝে।"

"তুই জানিস না পল্টু। সাক্ষাৎ রয়াল বেঙ্গল। জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে।" শিবুর বলার আগেই চাঁদু জবাব দিল।

ঝন্টু বয়সে ওদের সমান হলেও খুব বেঁটে বলে ছোটো ছোটো লাগে। বিশেষ

পাত্তাটাত্তা কেউ দেয় না তাই। কিন্তু মাঝেমধ্যে এমন একেকটা অদ্ভুত কথা বলে যে সবাই চমকে যায়। বলটা হারিয়ে যাবার পর সবাই যখন বল উদ্ধারের উপায় বার করার চেষ্টা করছে ঝন্টু তখন একমনে উইকেটের ইটগুলো বালির গাদার চারপাশে রেখে আসছিল। খেলা যে আজকের মতো কেন আগামী রোববার পর্যন্ত ঘুচে গেল সেটা ও সকলের আগেই বুঝতে পেরেছিল।

ঝন্টু হঠাৎ পল্টুর বগলের নীচ দিয়ে গলে শিবুর সামনে এসে বলল "অ্যাই শিবে, কালকে শ্মশানকালীতলার সঙ্গে ম্যাচ আছে, পারবি এরকম একটা হাঁকাতে?" তারপর পল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল—"এই পল্টু একটা কাজ করবি? তোর শান্তনুদা তো ডিটেকটিভ। চল না আমরা ওনাকে ধরি। একটা না একটা উপায় বের করে দেবেন নিশ্চয়।"

পল্টু ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল—"অ্যাই বেঁটে, চুপ কর তো। আবার ফড়িংগিরি করছিস? বল উদ্ধার করার সঙ্গে গোয়েন্দা হওয়ার কী সম্পর্ক আছে রে?"

সেকেন্ড পাঁচেক চুপ করে থেকে ঝন্টু বলল "টেকো আলু দাদু যখন চাইলে দেবে না, আর বলটাও যখন আমাদের দরকার তখন সেটা ছলে বলে কৌশলে উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। আর এই ছলে বলে কৌশলে কাজ হাসিল করার নামই হচ্ছে রহস্যের আবরণ উন্মোচন করা।"

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে ওকে থামিয়ে দিল। চাঁদু বলল "খুব সাধু ভাষা ঝাড়ছিস যে রে বেঁটে। রচনায় কত পেয়েছিলি ফার্স্ট টার্মে?"

শিবু কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছন থেকে দৈববাণীর মতো কে যেন বলে উঠল—"ওকে সবাই মিলে বকছিস কেন? ও তো ঠিক কথাই বলেছে। এখন তো সবে দশটা। তোরা যদি বুদ্ধি করে আধ ঘণ্টার মধ্যে বলটা উদ্ধার করতে পারিস তবে আরও ঘণ্টা দেড়েক খেলতে পারবি।"

একসঙ্গে সবাই পেছনে তাকিয়ে দেখল শান্তনুদা, মোটর সাইকেলের ওপর বসে। একটা পা মাটিতে। কতক্ষণ এসেছে কেউ টের পায়নি। শান্তনুদা মাঝে মাঝেই এরকম স্টার্ট বন্ধ করে চুপিসারে চলে এসে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। স্টার্ট বন্ধ থাকলেও গাড়ি কেমন করে চলে ওরা জানত না। এখন জানে। শান্তনুদা বলেছে স্টার্ট বন্ধ করে নিউট্রাল করে দিলে ইনার্সিয়া বা জাড্যের ফলে গাড়ি কিছুক্ষণ চলতে পারে।

রামু পল্টুর খুব কাছের বন্ধু বলে ও অনেকবার ওদের বাড়িতে গেছে এবং সেই

সূত্রে শান্তনুদার সঙ্গে পরিচয় আছে। রামু তাই সাহস করে বলেই ফেলল—"শান্তনুদা আপনি একটা উপায় বলে দিন না। আপনি তো গোয়েন্দা। ঠিক পারবেন। আমরা তো....."

হঠাৎ রামুকে থেমে যেতে দেখে সবাই হকচকিয়ে গেল। তারপর রামুর চোখের মণি ফলো করতেই সবাই দেখল শান্তনুদার টুপির ওপর দিয়ে টেকো আলু দাদুর বারান্দা দেখা যাচ্ছে এবং সেই বারান্দায় জ্যান্ত রয়াল বেঙ্গল। একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

শান্তনুদা বলল—"না, আমি বলব না। তোরা বুদ্ধি খাটিয়ে উপায় বার কর, শার্লক হোম্‌স নামে এক ভদ্রলোকের নাম শুনেছিস? কে বল তো।"

শিবু বলল—"জাজ-জা নি। ডিড্ ডিটেকটিভ।" বোঝা গেল শিবুর নার্ভাসনেস এখনও কাটেনি। যতক্ষণ নার্ভাস থাকে ওর তোতলামি বন্ধ হয় না।

"কারেক্ট। শার্লক হোম্‌স ছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের সেরা গোয়েন্দাদের একজন। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল এই চরিত্রটা সৃষ্টি করেছিলেন। অসাধারণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি। তোরা একদিন বাড়িতে আসিস। অনেক গল্প শোনাব শার্লক হোম্‌সের। তবে একটা শর্ত। হরিপদবাবুর বাগান থেকে বলটা তোদের উদ্ধার করতেই হবে—ওনাকে না চটিয়ে এবং কোনো জিনিসপত্রের ক্ষতি না করে। আমি এখন চলি, তাড়া আছে। বিকেলের মধ্যে যেন শুনি বল উদ্ধার হয়ে গেছে।"

মোটর সাইকেলের আওয়াজটা মিলিয়ে যেতেই ঝন্টু বলল—"পল্টু, তোর শান্তনুদা খুব বড়ো ডিটেকটিভ নাকি রে?"

"ডেফিনিটলি।" পল্টুর চোখ চকচক করে উঠল। "বলাই বাহুল্য। সি. পি. থেকে সি. এম. পর্যন্ত শান্তনু মজুমদারকে সবাই এক ডাকে চেনে।"

"সি.পি.এম টা কিক্-কি-রে পল্টু? ডি-ডি-ডিগ্রী?"

"দূর বোকা, এই জন্যেই তো ফেল মারিস। সি.পি.এম. কে বলেছে? সি.পি. মানে কমিশনার অফ পুলিশ আর সি.এম. মানে চিফ মিনিস্টার।"

পল্টু ঝাঁঝিয়ে উঠতেই ক্ষীণকণ্ঠে শোনা গেল—"সস্ সস্-স—"

চাঁদু বলল—"রি"।

সবাই হাঁটতে শুরু করল। প্রত্যেকেরই কপালে ভাঁজ। কেউ নখ খাচ্ছে, কেউ চুলের মধ্যে হাত বোলাচ্ছে। ঝন্টু বিপদভঞ্জনের মতো বলল—"এই পল্টু, চল হালদারবাড়ির

পুকুরঘাটের সিঁড়িতে বসে আমরা উপায় বার করি। গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে মনোসংযোগ করতে হয়।

শান্তনুদা নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করে কনসেন্ট্রেশন বাড়ানোর জন্য এই ব্যাপারটা পল্টুর জানা ছিল বলে ঝন্টু এ যাত্রায় প্রতি আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে গেল।

ঝন্টুর কথা শুনে রামু আর চাঁদু এক সঙ্গেই বলে উঠল—"না, না, ঘাটের সিঁড়িতে বসে হবে না। ওখানে একটু পরেই সবাই চান করতে, কাপড় কাচতে আসবে। তার থেকে চল ওই ফলসা গাছের তলাটায় বসি। আমরা সবাইকে দেখতে পাব, অথচ আমাদের কেউ দেখতে পাবে না।"

পছন্দসই হওয়াতে পল্টু ঝন্টু শিবুও প্রস্তাবটা মেনে নিল বিনা প্রতিবাদেই। ঘোষালদের গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অনেক লোকের চ্যাঁচামিচি শুনতে পেল ওরা। কাছে যেতেই দেখল পুকুরঘাটের সিঁড়িতে কুড়ি পঁচিশজন লোক দাঁড়িয়ে। শেতলা পুজো থেকে শুরু করে মড়া পোড়ানো পর্যন্ত পাড়ার সব কাজে যে সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মতো বিরাজ করে সেই বেঁটে বিশুকে দেখা গেল একটা উলটানো পিচের ড্রামের ওপর উঠে বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে কীসব বলে যাচ্ছে। চায়ের দোকানের বংশী মণ্ডল, হালদারবাড়ির বড়ো ছেলে, মেজ ছেলে, অমৃত ভাণ্ডারের মালিক তিনকড়ি হালুই, এমনকি রাধাবল্লভ মন্দিরের পূজারী গদাধর বাঁড়ুজ্জেকেও দেখা গেল। মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝার আগেই ওদের কানে এলো বেঁটে বিশু চীৎকার করে ঘোষণা করছে—"বাচ্চারা কেউ আসবে না এদিকে। দেশের আকাশে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।"

জ্যোতিষ হিসেবে গদাধর বাঁড়ুজ্জের একটু আধটু সুনাম আছে। বেঁটে বিশুর চেয়ে তিন পর্দা গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—"কতবার বলেছিলাম মঙ্গলটা বক্রী আছে, শনিটা বুধের ঘরে বসে ঝামেলা পাকাচ্ছে। এক্ষুনি মাইকে একটা অ্যানাউন্স করা দরকার। ছেলে ডুবে যাওয়া কী চাড্ডিখানি ব্যাপার। যাদের ছেলে তারা না জানি কত খুঁজছে।"

শিবুকে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে ঝন্টু বলল—"কী হয়েছে বলত। কে ডুবেছে রে। কাদের ছেলে?"

হালদারবাড়ির গোমস্তা-কাম-বাজার সরকার অনন্ত মুৎসুদ্দি একটা বড়ো খ্যাপলা জাল কাঁধ থেকে ঝপাং করে ফেলল গদাধর বাঁড়ুজ্জের পায়ের কাছে। তিন পা পিছিয়ে গিয়ে বাঁড়ুজ্জে মশাই খেঁকিয়ে উঠলেন—"চোখে দেখতে পাস না নাকি হতচ্ছাড়া?"

শিবু এই ফাঁকে বল হারানোর অপরাধ ভুলে গিয়ে একটু স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বলল—"গগ্-গদাধর জ্যেঠু—জাজ-জাল কী হবে?"

"আমার ডেডবডি তোলা হবে।" পরক্ষণে খ্যাঁকানি থামিয়ে শুরু করল—"আ-হা-হা। দুধের বাছা। কি কুক্ষণে ছ্যান করতে নেমেছিল। আর বলিহারি বাবা মা। ওইটুকু ছেলেকে কেউ একা একা ছ্যান করতে পাঠায় পুকুরে? ওতো ডুববেই।"

রামু এবার এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—"কাদের ছেলে ডুবেছে কাকু? কখন ডুবেছে? বয়স কত?"

বংশী মণ্ডল বিড়িটায় শেষটান মেরে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁধের গামছাটা দিয়ে দুবার মুখ মুছে বলল—"তা কি কেউ দেকেচে নাকি? তবে ডুবেছে নিশ্চয়ই। দেকচ না পুকুরের মাঝখানটায় কেমন বিজকুড়ি কাটছে?"

চাঁদু জিগ্যেস করল—"আচ্ছা বংশীদা তোমরা কী করে বুঝলে যে কেউ ডুবে গেছে?"

"এই সহজ কতাটা বুইতে পারলে না দাদাভাই? সিঁড়ির ধাপে প্যান্ট খুলে রেকে জলে ঝাঁপাই জুড়তে গেচে, আর ওঠেনি। আহা রে, কতই বা বয়স! বড়ো জোর দশ বারো। এতক্ষণ কি আর আচে। জল খেয়ে পেট জয়ঢাক হয়ে গেচে।"

"আপনি দেখেছেন জজ্-জলে নামতে।"

"আমি দেকিনি বটে। তবে হালদারবাড়ির মেজ কর্তা দেকেচেন। উনিই তো প্রথম খপরটা দেন।"

চাঁদু শিবুর কানে কানে বলল—"চল না একবার দেবেনকাকুকে জিজ্ঞেস করি সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কী ঘটেছে।"

বেঁটে বিশু ততক্ষণে ক্লাবের দু-চারটে ছেলেকে জলে নামিয়ে দিয়েছে ডুব সাঁতার দিয়ে খোঁজার জন্য। অনন্ত মুৎসুদ্দি পুকুরের চারধার ঘুরে ঘুরে খ্যাপলা জাল মারছে, আর প্রত্যেকবারই হয় একপাটি জুতো নয় একটা ভাঙা ছাতা, এমনকি সাঁড়াশি পর্যন্ত উঠে আসছে। চাঁদু গিয়ে সটান জিজ্ঞেস করল—"দেবেনকাকু কটার সময় ডুবেছে ছেলেটা? সকালবেলা?"

দেবেন হালদার নিস্পৃহভাবে জবাব দিল—"তা তো কেউ দেখেনি। আমাদের নেতাইয়ের মা ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে দেখে ঘাটের সিঁড়িতে একটা প্যান্ট রাখা।

ও-ই তো গিয়ে খবরটা দেয়। প্যান্ট ছেড়ে গামছা পরে স্নান করতে নেমেছিল। আহারে, মা বসুমতী টেনে নিল।"

"প্যান্টটা কোথায় কাকু?"

"সিঁড়িতে রাখা আছে। তবে হাত দিও না। অপঘাতে মৃত্যু তো, থানা-পুলিশ পোস্টমর্টেম সবই হবে। শেষকালে তোমাদের নিয়ে আবার টানাটানি না হয়।"

ওরা পাঁচজনে প্যান্টটা ভালো করে দেখল। শিবুর নার্ভাসনেস অনেক কমে গেছে। এখন প্রায় পুরো একটা সেন্টেন্স একটানা বলতে পারছে। অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে একটা বাক্য সাজিয়ে নিয়ে বলে ফেলল—"চল, এ-এবারে বল উদ্ধারের উপায় নিয়ে আলোচনা করা যাক।"

ঝন্টু বলল—"একটা কাজ করবি, এই সময়টায় টেকো আলু দাদু স্নান সেরে রাধাবল্লভ মন্দিরে পুজো দিতে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে। এর মধ্যে আমাদের বাগান থেকে বলটা নিয়ে আসতে হবে।"

"ও বাবা, ও আমার দ্বারা হবে না, ওই বিটলে বঙ্কাটা আছে। ও আবার বুড়োর থেকে তিন কাঠি উপরে। ওরই তো মজা। রোজ একত্রিশখানা বল নিয়ে জাগলিং করবে।" চাঁদু পল্টুর দিকে তাকিয়েই কথাটা বলল।

ঝন্টুর প্রস্তাবটায় কেউ পাত্তা দিল না বলে একটু মুষড়ে গিয়ে বলল—"চল বাড়ি ফিরে যাই। বিকেলে ভাবা যাবে।"

"তা কী করে হবে? শান্তনুদা রাগ করবে। শান্তনুদা এত কঠিন খুনের রহস্য সমাধান করে, আর আমরা একটা বল উদ্ধারের রহস্য সমাধান করতে পারব না! এই পল্টু, চল তোদের বাড়িতে। এক গ্লাস জল খেয়ে তারপর টেকো আলু দাদুর বাড়ির দিকে যাওয়া যাবে।"

রামুর কথা শেষ না হতেই ঢংঢং-ঢংঢং আওয়াজ কানে আসতেই ওরা দুখানা গাড়িকে স্পিডে আসতে দেখল। একটা দমকল, আর একটা পুলিশের গাড়ি। গাড়ির আওয়াজ পেতেই ওরা একপাশে সরে গেল। হালদারবাড়ির বড়ো কর্তা ভবেন হালদার বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে ছুটে আসতে গিয়ে একবার হোঁচট খেলেন। পুলিশের জিপ থেকে বিমান দারোগা নেমে টুপিটাকে বাঁ বগলে নিয়ে মাথার অবশিষ্ট দশ বারোটা চুলে হাত বুলিয়ে দেখে নিলেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর লাঠি দোলাতে দোলাতে পুকুরঘাট ঘুরে এসে বললেন—"না। নট এ কেস অফ সিম্পল ড্রাউনিং। মনে হচ্ছে কেউ খুন

করে জলে ফেলে দিয়েছে। দেখছেন না প্যান্টটা নিংড়ানোর মতো অবস্থায় রয়েছে। কেউ ছেড়ে গেলে তো ওভাবে প্যান্টটা থাকবে না।"

দারোগাবাবুর কথায় সবাই একটু চমকে উঠল। সত্যিই তো এদিকটা কেউ ভেবেই দেখেনি। বিমান দারোগা লাঠিটা ঘুরিয়ে পল্টু শিবুদের দিকে চোখ কটমট করে বললেন—"তোমরা এখানে কী করছ? যাও, বাড়ি যাও।"

ঘোষালদের গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে দৌড়ে খান চল্লিশ ঘুঁটে মাড়িয়ে সোজা মাঠে এসে হাজির। ঝন্টু বলল—"চল আমার সঙ্গে টেকো আলু দাদুর বাড়ি। ভয় কিসের? মারবে তো না। বড়ো জোর গাল দেবে।"

"যদি তাত্-তাড়া করে?"

"দৌড় মারব।" চাঁদুর ঝাঁঝানিতে শিবু চুপ করে গেল।

ঝন্টু বলল—"শোন, প্রথমে আমরা বঙ্কার ভালো নাম ধরে ডাকব। নিশ্চয় টেকো আলু দাদু বেরিয়ে আসবে। তখন বলব যে আজ ম্যাচ আছে। বঙ্কাকে আমাদের টিমে চাই। ও না খেললে পাড়ার প্রেস্টিজ ফুটো হয়ে যাবে।"

"এই না হলে বেঁটের বুদ্ধি।" পল্টু ঝন্টুর চুল ধরে একবার ঝাঁকিয়ে দিল।

টেকো আলু দাদুর বাড়ির সামনে গিয়ে দুবার গলা খাঁকারি দিয়ে পল্টু "বিবেক বিবেক' বলে ডাকল।

"কে?"

"বিবেক আছে?"

"ওই বস্তুটা আমার কোনোদিনই ছিল না। আজও নেই।"

"না, মানে বঙ্কা আছে? ও আমাদের বন্ধু তো, তাই।"

"তাতে আমার কী উপকার হবে শুনি।"

"না, মানে হ্যাঁ, আমাদের বলটা....."

"হবে না। হবে না। নো। ক্রিকেট খেলে কেউ কোনোদিন যুদ্ধে জেতেনি।"

চাঁদুদের বাড়িতে বাসন মাজে যে পারুলদি সে বঙ্কাদের বাড়িতেও কাজ করে। পারুলদি বঙ্কাদের উঠোনে সবে পা দিয়েছে অমনি টেকো আলু দাদুর মিলিটারি চিৎকার—বেরিয়ে যাও। আর কাজ করতে হবে না। এভাবে গুণগার দেওয়ানো। এভাবে কেউ মানুষের ক্ষতি করে? কর্তব্যে অবহেলা? ডিরেলিকশন? মরাল টার্পিচিউড? আর্মিতে হলে কোর্ট মার্শাল হয়ে যেত।"

কিছু বুঝতে না পেরে থতমত খেয়ে পারুলদি বলল—"কী করেছি মামাবাবু? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না..."

"আর বুঝে কাজ নেই। আসল মাখম জিন। আশি টাকা খরচা হয়েছিল। তোর মাইনে থেকে কাটা যাবে।

পারুলদি ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলাতে টেকো আলু দাদু একটু নরম হয়ে আবার শুরু করল—"তোকে সৎ বলেই জানতাম। অভাবে স্বভাব নষ্ট। তোর ছেলের যদি প্যান্টের দরকার ছিল তো আমায় বললেই পারতিস। বঙ্কুর ইস্কুলের প্যান্টখানাই রেখে দিলি।"

এতক্ষণে পারুলদি বুঝতে পেরে বলল—"কী বলছেন মামাবাবু। এত বছর কাজ করছি একটা জিনিস কখনও এদিক ওদিক হয়নি।"

"বঙ্কুর প্যান্টটা কি তা হলে উবে গেল, না চিলে নিয়ে গেল?"

ঝন্টু তাড়াতাড়ি বলল—"কী রঙের প্যান্ট দাদু? ফুল না হাফ?"

"নীল রঙের। হাফপ্যান্ট। কোমরের একটা বোতাম আধভাঙা। তাতে তোমাদের কী হে ডেঁপো ছোকরা?"

"আমরা যদি প্যান্টটা উদ্ধার করে দিই তবে বলটা দেবেন?"

প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ—"হতচ্ছাড়া, আমার সাতখানা গাছ নষ্ট করেছিস। আবার বল চাওয়া হচ্ছে। আর প্যান্ট খুঁজে দিবি কোত্থেকে শুনি। লালবাজার থেকে ডি.সি.ডি.ডি. এলেন যেন।"

"আমরা তো—শার-শার-শার...."

"লক হোম্‌স। মানে গোয়েন্দা।" শিবুর কথা আটকে গেছে দেখে চাঁদু ওকে বাঁচিয়ে দিল।

"চোপ। আবার কথা।"

ঝন্টু সাহস করে বলল—"বঙ্কুর প্যান্টটা পুকুর ঘাটের সিঁড়িতে পড়ে আছে। যে ভাবে প্যান্টটা রাখা ছিল আমরা দেখেই বুঝেছি কেউ সাবান কাচতে গিয়ে ফেলে এসেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে পারুলদি একহাত জিভ কেটে "ভুল হয়ে গেছে মামা। কাল দুপুরে সাবান কাচতে গিয়ে আমিই ফেলে এসছিলাম" বলে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যে টেকো আলু দাদুর উঠোনটা পঞ্চাশ ষাটজন লোকে ভরে

গেল। বিমান দারোগাবাবু প্যান্টটা বাঁ হাতের দু আঙুলে নস্যির মতো দোলাতে দোলাতে বললেন—"দেখুন তো হরিপদবাবু এটা কি আপনার নাতির?"

টেকো আলু দাদুর সে কী হাসি তখন। ধন্যবাদ টন্যবাদ দেবার পর সবাই চলে যেতে টেকো আলু দাদু বরফের মতো গলে গিয়ে মাখনের চেয়েও নরম গলায় বলল—"তোদের বুদ্ধি আছে তো। যা সিঁড়ির তলায় একটা বালতির ভেতর বলগুলো রাখা আছে। নিয়ে যা। সবগুলোই নিয়ে যা। তোদের অনেক অনেক বুদ্ধি। দশখানা শার্লক হোম্‌স তোদের কাছে হার মেনে যাবে।"

বাইরে এসে শিবু বলল—"এবার তো জোজ্‌-জোরে মারা অ্যালাউড।"

আপনারা ওকে নিয়ে যান

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে মিনিট পাঁচেক থম মেরে বসে রইলেন পিনাকী বসু। মুখটা বিরক্তিতে ভরা। কপালে অনেকগুলো ভাঁজ। সামনের সেন্টারটেবিলে আধখাওয়া চায়ের কাপ। পাশে আজকের আনন্দবাজার। দুটোর কোনোটাতেই মন নেই। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে যাচ্ছেন। থেকে থেকেই মনের ভেতর একটা কথাই আসা যাওয়া করছে। একটু আগেই যে টেলিফোনটা এসেছিল সেটা করেছিলেন ওনার দপ্তরের সর্বময় কর্তা খোদ পুলিস কমিশনার। তিরিশ বছরের চাকরি জীবনে কেউ কখনো অপদার্থ বলে তিরস্কার করেনি, তা সে যত বড়ো ওপরওয়ালাই হোক না কেন। আসলে কর্তব্য আর দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে কোনো কথা বলার সুযোগই আজ পর্যন্ত কাউকে দেননি। কিন্তু এবারের কেসটা.....।

"কী হল, চা খেতে ভুলে গেলে, কী ব্যাপার? খুব চিন্তিত লাগছে। কোনো গুরুতর সমস্যা?"—স্ত্রী মধুছন্দা কখন যে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন খেয়াল করেননি ডাকসাইটে পুলিস অফিসার পিনাকীরঞ্জন বসু। কনস্টেবল থেকে প্রোমোশন পেতে পেতে শুধুমাত্র নিষ্ঠা, অধ্যবসায় আর সততার জোরে এতদূর উঠেছেন। গত দু-বছর ধরে লোকাল থানার ও.সি.। কোনোদিন কোনো কাজে বিফল হননি, শুধু এই কেসটা ছাড়া। কোনোভাবেই কোনো ক্লু পাচ্ছেন না।

স্বামীকে চুপ করে থাকতে দেখে মধুছন্দা বললেন—"কথা বলছ না কেন? কী হয়েছে আমাকে বলো।"

"তোমার আর শুনে কাজ নেই। কী করবে শুনে? এ তো তোমার রান্নাঘরের ব্যাপার নয় যে মাথা ঘামিয়ে বার করবে। আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে দাও।"

"আহা, বলেই দেখো না। স্ত্রী হিসেবে আমারও তো একটা কর্তব্য আছে তোমার বিপদে আপদে সাহায্য করা। হতেও তো পারে কোনো পরামর্শ কাছে লেগে যেতে পারে।"

"শুনতে চাইছ শোনো, তবে লাভ কিছু হবে না। শুধু মনের যন্ত্রণাই বাড়বে। তার আগে এক কাপ চা খাওয়াও।"

মধুছন্দা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতেই পিনাকী বসু উঠে দাঁড়ালেন। খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা ফটোটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। মধুছন্দা আর একমাত্র সন্তান অর্ককে নিয়ে ছবিটা তুলেছিলেন বছর দশেক আগে। অর্কর বয়স তখন দশ। ক্লাস ফোরে পড়ত। এ বছর গ্রাজুয়েট হয়েছে। চাকরির যা বাজার তাতে এই সাধারণ গ্রাজুয়েটদের পক্ষে চাকরি জোটানোও দুষ্কর। অনেকে অনেকবার নানাভাবে আভাসে ইঙ্গিতে চাকরি দেওয়ার কথা বললেও মধুছন্দা কোনোদিন সায় দেননি। প্রস্তাবটাও শুনেই নাকচ করে দিয়ে বলেছেন—

"এই বাজারে নিঃস্বার্থভাবে কেউ কারোর জন্য কিছু করে? নিশ্চয়ই কোনো অন্যায় সুবিধা নেওয়ার মতলব আছে।"

পিনাকী আর জোর করেননি। এই কথাটা যে তাঁর মনেও উঁকি দেয়নি তা নয়। যারা এই চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, তারা হয় প্রোমোটার, নয় ব্যবসাদার।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিলেন পিনাকী। চারদিক ঝকঝক করছে। রোদের তেজ এখনও তেমন জোরালো নয়। এমন দিনে নিরিবিলি কোনো জায়গায় হারিয়ে যেতে হয়। মনের ভেতর সাগরের উথাল-পাথাল ঢেউ। গত চার-পাঁচ দিনে অনেক ভেবেও কেসটার কিনারা করা দূরে থাক, শুরুই করতে পারেননি। সন্দেহভাজন একজনকেও ধরতে পারেননি। এরকম ব্যর্থতা এর আগে কখনও হয়নি। অথচ....।

টেবিলে চায়ের কাপ রাখার শব্দে চমক ভাঙতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন মধুছন্দা সোফায় বসে খবরের কাগজটা নিয়ে ওলটাচ্ছে। পিনাকী এসে বসতেই মধুছন্দা জিজ্ঞেস করল—"কই, বললে না কী হয়েছে? কার ফোন এসেছিল?"

"বলছি, দাঁড়াও। অর্ক কোথায়? সকাল থেকে কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না।"

"বাথরুমে। স্নান করছে। এক্ষুনি বেরোবে। বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে কোথায় যেন বেড়াতে যাবে। যাক গে, তুমি বলো কী ভাবছিলে। কে ফোন করেছিল?

"কমিশনারসাহেব। চার-পাঁচ দিন আগে, হ্যাঁ গত শুক্রবার, আমরা এম.এল.এ. সাহেবের মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম মনে আছে?"

"এটা আর মনে না থাকার কী আছে!"

"ওই দিন এম.এল.এ. সাহেবের শোবার ঘরের আলমারি থেকে কিছু টাকা আর গয়না চুরি হয়ে যায়। আমার ওপর তদন্তের ভার পড়েছে। মিনিস্ট্রি থেকে

সি. পি.-র ওপর ঘন ঘন চাপ আসছে। আজ সকালে সি.পি. ফোনে যথেষ্ট তিরস্কার করলেন। কেসটা উনি আই.বি.তে রেফার করেছেন।"

কথার মাঝখানে অর্ক এসে বলল—"মা, খেতে দাও। আমাকে বেরোতে হবে।"

মধুছন্দা ছেলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—"খাবার তৈরি হতে একটু দেরি হবে। কাজের মাসি আজ আসেনি। তা ছাড়া তোর বাবার শরীরটাও আজ ভালো নয়। একটু বাজার থেকে ঘুরে আয়।"

"ওরে ব্বাস। আমার দেরি হয়ে যাবে। যা আছে তাই দাও। বাজার বাবা পরে করে আনবে।"

"তোর বাবার শরীরটা ভালো নয় বলছি না। এত বড়ো ছেলে হয়েছিস, বাবা-মার জন্যে মায়া দয়া নেই? যা, বাজার করে নিয়ে আয়। দাঁড়া, টাকা দিচ্ছি।"

"থাক। টাকা দিতে হবে না। আমার কাছে আছে। আমি এক্ষুনি আসছি। তুমি ভাত বসিয়ে দাও।"

অর্ক চলে যেতে মধুছন্দা জিজ্ঞেস করল—"কত টাকা চুরি গেছে? গয়না কী কী ছিল?"

"বেশি না। হাজার পঞ্চাশ টাকা আর দু এক জোড়া দুল আংটি এই সব। টাকাটা সকালেই ব্যাংক থেকে তোলা হয়েছিল। একশো টাকার নোটের পাঁচটা প্যাকেট। কত টাকা চুরি গেছে, সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথাটা হল কার বাড়ি থেকে গেছে।"

মধুছন্দাকে যথেষ্ট চিন্তিত দেখাল। ওদের বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে এ রকম বিপদ কোনোদিন আসেনি। স্বামীর কাছে সরে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন—"কাউকেই সন্দেহ করতে পারছ না? দু-একজনকে গ্রেফ্‌তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কাজ হত না?"

"কাকে সন্দেহ করি বলো তো? এম.এল.এ.-র বাড়ির বিয়েতে কি হেঁজিপেঁজি লোকের নেমন্তন্ন হয়? সব গণ্যমান্য লোক। আমরাই বরং সাধারণ।"

মধুছন্দা স্বামীকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, "অনর্থক ভেবো না। জীবনে কখনো কোনো অন্যায় কাজ যখন করনি, তখন দেখো ঠিক উদ্ধার পেয়ে যাবে। আই.বি.কে রেফার করেছে, তাতে মন খারাপের কী আছে? অপরাধী ধরা পড়লেই হল। তুমি তো আর কর্তব্যে গাফিলতি দেখাওনি। অনর্থক ভেবে শরীর খারাপ কোরো না। খানিক বিশ্রাম নাও, মনটা ঠিক হয়ে যাবে। আমি যাই রান্নাঘরের দিকে।"

ওঠবার সময় মধুছন্দার চোখ চলে গেল টেবিলের ওপরে রাখা ছবিটার দিকে। স্বামীর কথা ভেবে চোখে জল এসে গেল। আড়াল করে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ছবিটার কাচের ওপর আলতো করে হাত বোলালেন। মধুছন্দার মনের ক্যানভাসে কত রঙিন ছবি ভেসে উঠল। পিনাকীর কথা, অর্কর কথা। অর্ককে নিয়ে কত স্বপ্ন লালন করে এসেছেন মনে মনে। ডাক্তার হবে, না হয় ইঞ্জিনিয়ার হবে। বিদেশ যাবে। কত বড়ো চাকরি করবে। রাস্তায় দেখলে লোকে বলবে—ওই দ্যাখ, অর্কর মা যাচ্ছে।

হঠাৎ চমক ভাঙতে পিছনে তাকালেন। পিনাকী বাথরুমে। স্নান করার আওয়াজ আসছে। টেলিফোনটা তুলে একটা ফোন করলেন। তারপর সোজা রান্নাঘরে ভাত বসিয়ে দিলেন। অর্ক বাজার থেকে ফিরে এলে মাছ রান্না করবেন। অর্ক তিনদিন থাকবে না। কুড়ি বছর বয়স হয়ে গেছে, তবুও একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

বাইরে মোটরবাইকের আওয়াজ পেয়েই বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মধুছন্দা। অর্ককে মোটরবাইকে বেশ সুন্দর মানায়। ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। ফর্সা, টানটান চেহারা। লাল রঙের ঝকঝকে হোন্ডা মোটরবাইকে অর্ককে সিনেমার নায়কের মতো লাগে। কথাটা মনে হতেই মধুছন্দার মনে হল সন্তানের সৌন্দর্যের কথা ভাবতে নেই, নজর লেগে যেতে পারে। অর্ক বাজারের থলি হাতে করে পাশ দিয়ে যাবার সময় মধুছন্দা ছেলের গায়ে খুতকুড়ি দিয়ে দিলেন। অনেকদিন ধরেই একটা মোটর সাইকেল কিনে দেওয়ার জন্য বায়না করছিল।

দু'জনেরই খুব আপত্তি ছিল মোটরসাইকেল কেনাতে। প্রথম প্রথম ওর বাবার কাছে আবদার করে পাত্তা না পেয়ে মা-র কাছে অষ্টপ্রহর ঘ্যানঘ্যান করত—"তুমি কত ভালো মা। তোমার মতো মা পৃথিবীতে হয় না। তুমি লক্ষ্মী মা। তুমি দেখতে কী সুন্দর...."

মধুছন্দা কোনোভাবেই রাজি হয়নি। ওঁর নিজের একমাত্র ভাই এক রকম জোর করেই সকলের অমতে বাইক কিনেছিল চাকরি পাবার পরপরই। ছ'মাসও চড়তে পারল না। তারপর থেকে মোটরবাইকের নাম শুনলে মধুছন্দা মাথার ঠিক রাখতে পারেন না।

অর্ক বায়না করলেও বাবা-মা দু'জনেই নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়। হঠাৎই পরশুদিন সকালে এই ঝকঝকে বাইকটা চড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—"প্লিজ বোকো

না। এটা কিনিনি। কলেজের বন্ধুরা লটারি করেছিল। দশ টাকার টিকিটে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি। ভয় পেয়ো না। সাবধানে চালাব। তোমাকেও চড়াব।"

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন মধুছন্দা। বুকের ভেতরটা একটু চিনচিন করে উঠল। শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিয়ে সোফায় বসে বললেন—"পাখাটা ফুল করে দাও। আর অর্ককে বলো একটু পরে যাচ্ছি।"

কথার মাঝখানে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। পিনাকী বোস বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। গাড়ি থেকে দু'জন মাঝবয়সি ভদ্রলোক নেমে গেট খুলে দাঁড়ালেন। একজন বললেন—"গুড মর্নিং, মিস্টার বোস। ভিতরে আসতে পারি? চিনতে পারছেন?"

পিনাকী বোসের ভদ্রলোক দুজনকে খুব চেনা চেনা মনে হল। একটু পরেই মনে পড়ল আই.বি.-র অফিসার সত্যেন মুখার্জী এবং অনিরুদ্ধ দত্ত। মাথাটা ঘুরে উঠল। একটা অজানা আশঙ্কা মনের ভেতর ঘুরপাক খেয়ে গেল। নিশ্চয় কমিশনার সাহেবের নির্দেশমতো জবাবদিহি চাইতে এসেছেন। নয়তো সাসপেনশনের নোটিশ। পিনাকী বোস যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে ভদ্রলোক দু'জনকে অভ্যর্থনা করে ঘরে ডেকে বসালেন।

মধুছন্দা ঘরে ঢুকে জোড়হাত করে নমস্কার করলেন। মিস্টার মুখার্জী আর মিস্টার দত্তকে ওঁরও চেনা চেনা লাগল। কিন্তু পিনাকীর মতো মধুছন্দার মুখমণ্ডলে কোনো ভাবলেশ দেখা গেল না। শুধু বললেন—"চা চলবে তো? একটু বসুন, আসছি, ছেলেকে খেতে দিয়েছি। আপনারা কাগজ পড়তে থাকুন।"

কাগজটা এগিয়ে দিয়ে মধুছন্দা ভেতরে চলে গেলেন। মিনিট দশেক বাদে চা নিয়ে ঢুকলেন। পিনাকী বললেন, "বলুন, কী খবর। কমিশনার সাহেব কিছু....।"

অর্ক কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে ঘরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পিনাকী বললেন, "এই আমার ছেলে, অর্ক।" অর্কর দিকে তাকিয়ে বললেন—"বোসো। ইনি মিস্টার মুখার্জী, আর ইনি মিস্টার দত্ত। আই-বি থেকে এসেছেন।"

ইনস্পেক্টর দত্ত অর্কর দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমাকে একবার আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

পিনাকী বোস সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"তার মানে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, মিস্টার দত্ত। ও কি, মানে কোনো অপরাধ....।"

"উই আর সরি, মিস্টার বোস। কমিশনার সাহেবের নির্দেশ। এম. এল.-এর বাড়িতে চুরির কেসে প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে আমরা আপনার ছেলেকে গ্রেফ্‌তার করতে বাধ্য হচ্ছি।"

মধুছন্দা ভাবলেশহীন মুখে বসে আছেন। অর্কর মুখটা রক্তশূন্য সাদা ফ্যাকাশে লাগছে। মনে হচ্ছে ওর সারা শরীরের রক্ত কে যেন নিমেষে ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে।

পিনাকী বোস রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললেন—"কী সব অ্যাবসার্ড কথাবার্তা বলছেন আপনারা? কী প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে যে আপনারা একজন ভদ্র পরিবারের ছেলেকে বিনা অপরাধে গ্রেফ্‌তার করছেন?"

মধুছন্দা স্বামীর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন—"উত্তেজিত হোয়ো না। আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি জবাব দিচ্ছি। কী প্রমাণ চাও? প্রমাণ তো তোমার হাতের কাছে। পরশুদিন অর্ক যখন নতুন মোটর সাইকেল এনে বলল বন্ধুদের লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে তখন একবারের জন্যও কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেছিলে? বাবা হয়ে, এমন কি একজন সৎ পুলিশ অফিসার হিসেবে সত্যতা যাচাইয়ের কোনোরকম চেষ্টা করেছিলে কি? আমি মা। মায়ের ধর্ম অনুযায়ী আমি চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। আমি অনেক জায়গায় খবর নিয়েও এরকম লটারির কোনো হদিস পাইনি।"

মধুছন্দা টেবিলে রাখা খবরের কাগজের ভাঁজ থেকে একটা খাম বের করে তার ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"এই দ্যাখো, এটা একটা ব্যাংকের নোটস্লিপ। একশো টাকার প্যাকেটের স্লিপ। আমি এম.এল.এ. সাহেবের বাড়িতে, 'থানা থেকে বলছি' বলে কনফার্ম করেছি যে এই নোটই সেদিন এম.এল.এ. সাহেবের ব্যাংক থেকে ড্র করেছিলেন। এই নোটস্লিপটা এবং এই কানের দুলের পুশটা আমি পরশুদিন অর্কর প্যান্ট কাচতে গিয়ে পকেট থেকে পেয়েছি। চুরির খবরটা আমিও কাগজে পড়েছি। অর্ক-র নতুন মোটর বাইক দেখার পর থেকে দুদিন ধরে আমি অঙ্কটা মেলাবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। গত দু'দিন দু'রাত আমি সমানে নিজের বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে গেছি। আর মনকে শক্ত করেছি। তাইতো আজ সকালে বারবার তোমার কাছে জানতে চাইছিলাম তোমার কী হয়েছে।"

পিনাকী কিছু একটা বলতে চাইছিলেন। তাঁর ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল শুধু, কোনো কথা বার হল না।

মিস্টার মুখার্জী বললেন—"আমরা, মানে সারা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আপনার মতো মায়ের জন্য গর্বিত। সত্যি বলতে কি আপনার ফোন পেয়ে আমরা বিস্মিত। বিশ্বাস করতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে। কমিশনার সাহেব নিজে আপনার জন্য অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন।"

মধুছন্দার মুখ আঁচলের নীচে ঢাকা পড়ে আছে। আস্তে আস্তে মুখটা তুলে বললেন—"একজন সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, নিরপরাধ পুলিশ অফিসারের গায়ে কালিমা লাগার চেয়ে একজন অসৎ চোরকে আইনের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে অনেক আত্মতৃপ্তি আছে, মিস্টার মুখার্জী। আপনারা ওকে নিয়ে যান।"

পবনবাবুর ভাগ্য

আজ সত্যিসত্যিই নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেল পবনের। আজ কেন, গত কয়েকদিন ধরেই ধরব ধরব করছিল। বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই কেমন যেন আস্তে আস্তে উবে যেতে শুরু করেছে। কোনো রকমে মনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শক্ত করে রেখেছিল। আজ আর পারছে না। এভাবে আর চলে না। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। অন্যদিন ভচ্চায্যি গিন্নি ডেকে দুটো পাতেরটা দিত। আজ সেটাও জোটেনি। তার ওপর মন্দ কপাল কি সাধে বলে। ম্যানা কুণ্ডুর দোকানের সামনেটা, যেখানটায় শুয়ে শুয়ে আকাশের তারা গুনত, সেখানটাতেও, রেল বাজারের ধম্মের ষাঁড়টা অপকম্মো করে গেছে। ষাঁড় কি আর সাধে বলে—একপ্রস্থ ষণ্ডবাহাদুরকে গালাগালি করে পবন হাঁটা দিল।

আইসক্রিম কলের কাছে এসে পবনের খুব আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করল। অনেকদিন খায়নি। কাঠি দেওয়া আইসক্রিম। চুষতে চুষতে কনুই বেয়ে বরফ গলা জল নেমে আসত। অনর্থক ভেবে কী লাভ। এক আনা কি সোজা কথা। দু'পয়সা থাকলেই বর্তে যেত। দুটো মুড়ি মুড়কি কিনে খেতে পারত।

ভাবতে ভাবতে পবনের হঠাৎ মনে হল চুরির কারবারে নামলে মন্দ হয় না। ছোটোবেলায় মা বলত—

চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা যদি না পড়ি ধরা
যদি পড়লাম ধরা তো প্রাণে হল সারা।

তা, ধরা কি আর সবাই সব সময়ে পড়ে! এ হল অনেকটা লটারির মতো। চেষ্টা করে দেখতে হয়। চেষ্টা না করলে লক্ষ্মী আসে না। তা ছাড়া ধরা পড়লেই বা মন্দটা কোথায়। পুলিশের পিটুনি খেলেও দুমুঠো খাওয়া তো জুটবে।

আইসক্রিম কলের পাশেই বিশ্বনাথ সাঁতরার বাড়ি। একা মানুষ। সংসারে কেউ নেই। কোনো কালে ছিল বলে কেউ জানে না। একটা ওনার বয়সি কাজের লোক আছে, সব দেখা শোনা করে। পবন এটা অন্তত জানে সাঁতরামশাই সন্ধের পর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের চাতালে টোয়েন্টি নাইন খেলতে যান। সন্ধে সাতটা থেকে রাত দশটা।

পবনের হঠাৎ মনে হল, বড়ো বড়ো চোররা তো নাইট ডিউটি করে। সারাদিন

পান্তাভাত খেয়ে লম্বা ঘুম দিয়ে বিকেলে বাড়ির কাজকর্ম বাজার-হাট সেরে সন্ধে থেকে গায়ে তেল মেখে বসে থাকে। বারোটা নাগাদ বেরোতে শুরু করে, ভোর চারটেয় ফিরে আসে। এই হল রুটিন। তা যাকগে, পবন তো আর বড়ো চোর নয়। এমনকি অ্যাপেন্টিস, না কী যেন বলে, তাও নয়। সবে আজ হাতে খড়ি।

পবনের ভাগ্যটা যেন ভালো হয়ে গেল। সাঁতরা মশাইয়ের সদরের শেকল কড়া সব খোলা। চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে এক ঝটকায় সদর ঠেলে ঠুকে পড়ল পবন। একতলা বাড়ি। বড়ো বড়ো ঘর। বাইরের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে পবন পাশ কাটিয়ে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই ওর কানে এলো—"আরে আরে পবনবাবু, আসুন, আসুন। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।"

খুব মোলায়েম গলা। পবন চমকে উঠল। ভয় পেয়ে রোয়াকের ডান দিকে ঘুপচি অন্ধকার জায়গাটায় দেয়ালে সেঁধিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই আবার কানে এলো মাখনমাখানো গলা—"আরে আরে পবনবাবু, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন। একটু পাখার তলায় বসুন। জিরিয়ে নিন।"

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সারাজীবন শুধু অন্যের দুচ্ছাই দুচ্ছাই শুনেই কাটাতে হল, 'পবনবাবু' বলে যে কেউ কখনো ডাকতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি।

বাইরের ঘরের জানলাগুলো সব বন্ধ। একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বলছে। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই পবন দেখল খাটের ওপর প্রায় ওরই বয়সি একজন বসে আছে। জামাকাপড় ধোপদুরস্ত হলেও মুখের মধ্যে একটা রুক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট।

পবনকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে বসতে বলে লোকটা বলল—"আমায় চিনতে পারছেন না তো? পারবেনই বা কী করে। আমি বিশ্বনাথ সাঁতরার ভাইপো। মছলন্দপুরে থাকি। জ্যাঠামশাই আজ পুরী যাচ্ছেন কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে। আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন স্টেশনে গিয়ে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য। বয়স হয়েছে তো, বুঝতেই পারছেন। তাছাড়া ভাইপো হিসেবে একটা কর্তব্য তো আছে। দাঁড়ান একটু চা জলখাবার খান। ওই যে দেখুন, ডাইনিং টেবিলে ঢাকা দেওয়া লুচি-তরকারি, মিষ্টি আছে। একটু খেয়ে নিন। তা, আপনি বুঝি জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?"

পবনের চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। কী সব শুনছে। স্বপ্ন দেখছে না তো। লুচি-তরকারি মিষ্টি এসব তো বিয়ে বাড়িতে খায়। এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।

পবন এক নিমেষের মধ্যে লুচি তরকারির থালাটা নিঃশেষ করে দিয়ে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল। লোকটা বলল—"জ্যাঠামশাইয়ের কথা আর বলবেন না। সাতদিনের জন্য যাচ্ছেন বটে, কিন্তু সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। থালা-বাটি, ঘটি-গামলা, জামা-কাপড়, সোনা-দানা সব নিয়ে যাচ্ছেন। তা একদিক থেকে ভালো। দিনকাল যা পড়েছে। চতুর্দিকে চোরের উপদ্রব যা বেড়েছে। ছিঁচকে চোরই বেশি। সারাদিন ভাত জোটে না, সন্ধে হলেই গেরস্থ বাড়িতে ঢুকে পড়ে।"

পবনের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। শেষকালে না ধরা পড়ে মারধর খেতে হয়। নিজের ভেতরেই নিজে সেঁধিয়ে যেতে শুরু করল।

লোকটা বলল—"তা, পবনবাবু, আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন একটা উপকার করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। জ্যাঠামশাই, তাঁর কাজের লোককে নিয়ে একঘণ্টা আগেই স্টেশনে গেছেন। এই দেখুন না, রাজ্যের জিনিস আমাকে নিয়ে যেতে হবে। আপনি যদি একটা ট্যাক্সি ডেকে দেন খুব উপকার হয়। বুঝতেই পারছেন এতগুলো জিনিস। আর একটা কথা, আমি স্টেশন থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত যদি বাড়িটা একটু পাহারা দেন খুব ভালো হয়।"

পবনের খুব অবাক লাগল। ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। লোকটা বলল—"বুঝতে পারছি আপনার সংকোচ হচ্ছে। আরে মশাই, আপনি আমাকে না চিনলেও আমি তো আপনাকে অনেকদিন থেকেই জানি। আপনার ওপর বাড়ি ফেলে যেতে আবার ভয় কীসের। যান, যান, একটা ট্যাক্সি ডেকে দেন তাড়াতাড়ি। সময় হয়ে এল।"

পবনকে কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। লোকটা জিনিসগুলো দরজার কাছে একজায়গায় করে রাখল। একখানা ট্রাঙ্ক, দুটো বস্তার মধ্যে রাজ্যের বাসন, একখানা চামড়ার স্যুটকেস।

বিছানায় বসেই লোকটা একটা বিড়ি ধরাতেই বাইরে একটা গাড়ির শব্দ হল। না, ট্যাক্সির আওয়াজ তো নয়, বড়ো গাড়ির শব্দ। লোকটা এক ঝটকায় উঠে রোয়াকের অন্ধকার ঘুপচিটার কাছে দাঁড়াল।

একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ শুনে লোকটা উঠোনে লাফাতেই বাজখাঁই গলা শোনা গেল।—"একদম নড়বি না হতভাগা, মাথা ভেঙে দেব। অনেকদিন ধরে খুঁজছি। চল, আবার জেলের ঘানি টানবি চল।"

অশ্বিনী দারোগা লোকটার হাতে হাতকড়া পরাতেই সাঁতরামশাই বললেন—"ভাগ্যিস পবন দৌড়ে গিয়ে খরবটা দিল। বুদ্ধি আছে ছেলেটার। সদর দরজার একটা পাল্লাতেই দুখানা কড়াশুদ্ধু বন্ধ তালাটা দেখে ওর সন্দেহ হয়েছিল ব্যাটা নিশ্চয় কড়া ভেঙে বাড়িতে ঢুকেছে। পবন, আজ থেকে তুই আমার এখানেই থাকবি।"

ছোটোদের জন্য সাহিত্যরচনা সবসময়েই কঠিন—তা সে ছড়া-কবিতাই হোক, আর গল্প-নাটক-উপন্যাসই হোকনা কেন। ছোটোদের মনের তল-বিতল চষে ফেলে তাদের মনের খোরাক সন্ধান করা সহজ কাজ নয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ছোটোদের লেখক অপূর্ব দত্ত এই বইতে হাজির করেছেন নানান স্বাদের, নানান বিষয়ের মনকাড়া পঁচিশটি গল্প, যেগুলো শুধুমাত্র ছোটোদের নয়, বড়োদেরও আনন্দ দেবে।

হাসি মজা রহস্য ভূত কল্পবিজ্ঞান ছাড়াও সামাজিক মূল্যবোধের কিছু অনন্যসাধারণ চালচিত্রও আঁকা আছে এই গল্পগুলোতে। 'ছেঁড়া পাতার রহস্য'-এর টান-টান উত্তেজনা, 'বিধু সামন্তের ভূত'-এর গায়ে কাঁটা দেওয়া ভৌতিক পরিবেশ, 'পবনবাবুর ভাগ্য' বা 'আপনারা ওকে নিয়ে যান' গল্পের মধ্যেকার মানবিক মুখ, কিংবা 'আক্কেল সেলামি' বা 'ধার থাকা ভালো নয়'-এর অনাবিল হাসি-মজা ইত্যাদি যে অনায়াসেই ছোটো-বড়ো সকলের মনে দোলা লাগাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'কম্পিউটারের পাখি' গল্পে ছোটোদের কাছে কল্পনার দরজা হাট করে খুলে দিয়েছেন অপূর্ব দত্ত।

সব মিলিয়ে আজকের শিশু-কিশোরদের কাছে এ বই নিঃসন্দেহে আনন্দের এক অসাধারণ স্বর্গরাজ্য।

ISBN 81-88171-49-2
9788188171491

গ্রন্থমিত্র
১বি, রাজা লেন, কলকাতা-৯
E-mail : pmitram@gmail.com
Website : www.progressivepublishers.co.in

₹ 120